













# ଜୀବନ ଚିତ୍ର

ମାଧବ, ଭକ୍ତ, ଓପାମକ, ସମାଜ-  
ସଂସ୍କାରକ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଜୀବନୀ ।



## “জীবন-চিত্র” সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

সচিত্র উপন্যাসাবলী		সচিত্র নাটকাবলী
স্রীপাঠা	রাজসং, স্থলভসং,	পৌৰাণিক
কাকী-মা	১১, ৫০	উর্বশী-উদ্ধার ১৬০
গৌরী-দান	১০, ১১	বজ্রবাহন ১৬০
আর্য্য-কাহিনী	১৬০, ১০	মৈথিলী ১৮০
বিষ-বিবাহ	১৮০	( রাবণ-কন্যা সীতা )
সতী কি কলঙ্কিনী	১৮০	আকবরের স্বপ্ন ৫০
অঞ্জলি	১৬০	( প্রকাশিত )
ক'নে-মা (যজ্ঞস্থ)		

সকল পুস্তকের ছাপা, কাগজ, চিত্রাবলী অত্যুৎকৃষ্ট, কি রচনানৈপুণ্যে, কি চরিত্রচিত্রে, কি ভাবমাধুর্য্যে বহু বাবু পুস্তকাবলী সম্পূর্ণ নূতন ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তাঁহার উপন্যাসাবলী হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার—২২ নং ফড়িরচাঁদ চক্রবর্তীর লেন, অথবা

আমার নিকটে প্রাপ্তব্য

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

# জীবন-চিত্র



( সাধক, ভক্ত, উপাসক, সমাজ-সংস্কারক  
প্রভৃতির জীবনী )

শ্রীবল্লভবিহারী ধর-দম্পাদিত

CALCUTTA

**The Bengal Medical Library**

201, CORNWALLIS STREET.

1913

All rights reserved. ]

# Calcutta

PUBLISHED BY BUNKU BEHARY DHUR  
FROM THE "BOSUDHA AGENCY"

22, Fakir Chand Chackraburttty's Lane.

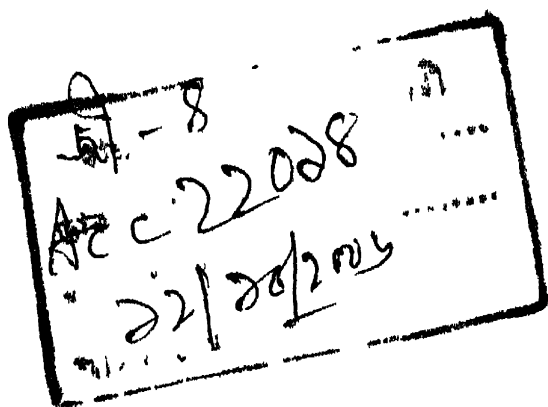
*Printed by Abdul Goffur*

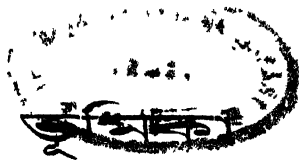
"AT THE NEW BRITANNIA PRESS."

*78, Amherst Street.*

ILLUSTRATED BY SRIJUT PRBO GOPAL DASS.

1913.





ভারত চিরদিন ধর্মশাসনে সংযত। “ধর্মময়”, “ধর্মধূক”, “ধর্ম শক্তি”—ভারতের এই তিনটি বিশেষণ, আমাদের গৌরবেব জিনিব।

ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন—ভারতে অনেকবাব ধর্ম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। যখনি এই অভিশপ্ত জাতি পরম্পর আত্মঘাতী হইবার উপক্রম করিয়াছে, আত্মের কবণ ক্রন্দনে ভুলোক হইতে দ্রালোক পর্য্যন্ত প্রলয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, বিধাতার বরে তখনি এক এক জন মহাপুরুষ ভারতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ! তাঁহাদের জন্ম মুহূর্ত্ত—ভাবতে নিখিল জড় ও চেতনের ভাগ্যে অমানিশি শেষে অরণকিরণালোকে শুভ জগতের সূচনা করিয়াছে। ভারত অবতাব বাদীর দেশ, ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের অবতাব—অসংখ্য, কেহ যুক্তিব অবতার বুদ্ধ, কেহ ভক্তির অবতার চৈতন্য। ভারতবাসীকে দুঃখ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্ত—কেহ জ্ঞানের মার্গ, কেহ শৈরাণ্যের মার্গ, কেহ বা কর্মের মার্গ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মহাত্মার মহতী শিক্ষার ফলে, ভারতে—বৈরাগ্য কর্মের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মঙ্গলের উপর ধর্মের প্রতিষ্ঠা—আর্য্যাবর্ত্তের নর নারী যুগে যুগে ইহার পরিচয় পাইয়াছে।

কিন্তু, ভারতে এখন সে ধর্ম নাই, সে মানুষও নাই। যে ধর্ম ভারতবাসীর সাধনার ধন, অন্তরের সামগ্রী, জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের আশ্রয় ছিল, সে ধর্ম আমাদের কাছে এখন “স্বথের জিনিব” ! ধর্ম এখন—সভামণ্ডপে—বাগ্মীর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় ; ধর্ম এখন—অসনে বসনে পণ্যবীথিকায় ; ধর্ম নাই কেবল ধর্মের স্থানে—জীবনে, মর্মে, প্রাণের অভ্যন্তরে !

এই আপদ্বর্মের বিবম যুগে—আমাদের ক্ষুদ্র অহমিকাকে মনুষ্যত্বে পরিপুষ্ট করিতে হইলে আবার সেই আদর্শের প্রয়োজন। আমাদের দুঢ় বিশ্বাস—ধার্মিকের মহাশিক্ষাময় চরিত্র কাহিনী আলোচনায় মনের সঙ্গীর্ভতা ও মলিনতা-বিদূরিত হয়। সেই ভরসায়—“জীবন-চিত্র” প্রকাশিত হইল।

আপন মহিমার আপনি সমুন্নত, আপন স্বাবলম্বনে আপনি স্বতন্ত্র হইয়া—বাহাদুর পুণ্য জীবন সাধনার কনক কিরণে কমলের মত্ত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাঁহারা এই ধর্মপ্রাণ ভারতের আদর্শ ও নেতা, চরিত্র পরিমায় বাঁহারা আবহমানকাল ভগবৎ জ্ঞানে পূজিত হইয়া আসিতেছেন ; বাঁহাদের বলীমান বিসর্জন—জগৎবাসীকে অনুপ্রাণিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের অনন্ত সাধারণ জীবন গাথা—এই ক্ষুদ্র জীবন চিত্রে একত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের বৈচিত্র্য রক্ষার জন্ত আমি এক অভিনব পন্থা অবলম্বন

কবিয়াছি। “জীবন চিত্ৰেব” সমস্ত জীবনীই—উপজ্ঞাস ছলে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ভিন্ন জীবনী রচিত হইয়াছে। যে ধর্মের প্রাণি যাহার অনুরাগ, তিনি সেই ধর্মের প্রবর্তকের চরিত্র কথা সাত্ৰহে আমার সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

আশা করি এই সকল মচাপ্রাণের মহাদর্শ—ভারতবাসী নর নারীর জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যেব সঙ্গে সঙ্গে—এই কলুষময়ী কলিযুগে, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অমূল্য ব্রতশিক্ষা, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের অসীম কার্য্যপটুতা, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের লোকাতীত ঈশ্বর জয়, স্বামী বিবেকানন্দের বিচক্স তাগ স্বীকার—আমাদেব মত সঙ্গারী জীবকে জীবনের কর্তব্য পথ দেখাইয়া দিবে।

মাতৃভাষায় সেবা যজ্ঞে—আমাব অমৃতম উত্তর সাধক, সাহিত্যবথ। অম্বর চন্দ্রের প্রিয় শিষ্য, ভূতপূর্ব্ব ‘বহুদর্শী’ পত্রের সম্পাদক, সুহৃদর শ্রীযুক্ত

ব্রজবল্লভকাব্যকণ্ঠবিশারদ—“জীবন-চিত্ৰেব” অনেকগুলি আলোখ্য অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, গ্রীক ও নিবাসী বৈষ্ণবচুড়ামনি শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং কাঁচবা পাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত সিন্ধেশ্বর রায় এম্ এ মহাশয়—“জীবন চিত্ৰেব” সকলনে আমাব যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। উপসংহারে—মাতৃভাষায় এই দিন সাধকের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার কবিতেছি। আলোচিত চরিতাবলীর প্রায় সমস্ত মহাপুরুষেবই হাকটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে “জীবন-চিত্ৰ” পাঠকগণের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হইলে, আমি আমার সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য মহাজ্ঞাদিগের জীবনী সঙ্কলন করিতে প্রয়াস পাইব।

অলামতি বিস্তুরেণ।

কলিকাতা

বন্দুধা কার্যালয়

শ্রী বঙ্কুবিহারী ধর

২২, ফকিরচাঁদ চক্ৰবর্তীর লেন,

সম্পাদক

২০শে আশ্বিন, ১৩২০ সাল

# আলোচিত চরিতাবলীর সূচী

চরিত্র	পৃষ্ঠা
বুদ্ধদেব ...	১
শঙ্কবাচার্য্য ...	১১
জয়দেব ...	৩১
চণ্ডীদাস ...	৪৭
বিজ্ঞাপতি ...	৫২
শ্রীচৈতন্য ...	৬৭
নরহবি ঠাকুর ...	৯০
লোচন দাস ...	৯৭
গুরু নানক ...	১১০
কবির ...	১১৮
রামানুজাচার্য্য ...	১২৮
নিশ্চল দাস ...	১৩৩
তুলসী দাস ...	১৩৬
পণ্ডহারী বাবা ...	১৪৬
রামপ্রসাদ ...	১৫১
তুকারাম ...	১৬১
দয়ানন্দ সবস্বতী ...	১৮০
ব্রৈলিঙ্গ স্বামী ...	১৮৬
ভাস্করানন্দ স্বামী ...	১৯৬
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ...	২০৭
রামমোহন রায় ...	২১২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২২১
কেশবচন্দ্র সেন ...	২২৯
পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব ...	২৩৬
বিবেকানন্দ স্বামী ...	২৪৯
উদ্ধারণ দত্ত ...	২৬৩



## চিত্র সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
বুদ্ধদেব ।	১
বুদ্ধগয়া ... ..	১১
শঙ্কবাচার্য্য ... ..	১৫
মণিকর্ণিকা ঘাট ... ..	২৫
জয়দেবের ঈষ্টগুরু ... ..	৩১
বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমলীলা ... ..	৩৪
জয়দেব ও পদ্মাবতীর মিলন মন্দির ... ..	৩৬
শ্রীচৈতন্য ... ..	৬৬
নানক ... ..	১১০
রামানুজাচার্য্যের ঈষ্টদেব শ্রীরঙ্গনাথ ... ..	১২৯
শ্রীরঙ্গ নাথের মন্দির ... ..	১৩০
শিষ্যবেষ্টিত তুকারাম ... ..	১৬১
তুকারামের প্রিয় শিষ্য শিবজী ... ..	১৭৭
দয়ানন্দ সরস্বতী ... ..	১৮০
ব্রৈলিঙ্গ স্বামী ... ..	১৮৬
ভাস্করানন্দ স্বামী ... ..	১৯৬
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ... ..	২০৭
রামমোহন রায় ... ..	২১২
রামমোহন রায়ের সমাধি ... ..	২১৯
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ..	২২১
কেশবচন্দ্র সেন ... ..	২২৯
রামকৃষ্ণ দেব ... ..	২৩৬
বিবেকানন্দ স্বামী ... ..	২৪৯
উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ... ..	২৬৩





बुद्धदेव



## জীবন-চিত্র

### ধৰ্ম্মাবতার বুদ্ধদেব

( ১ )

মহাভাবতেব মহানন্দেব অবসানে, ভাবতবর্ষ মহাশ্মশানে পবিণত হইল আৰ্য্যবংশেব গোবব ববি তখন অন্তাচলগামী, ক্ষত্ৰিয় বীৰগণ কুকক্ষেত্রে চিবনিদ্রায় আভভূত, কৰ্ত্তব্যনিষ্ঠ আৰ্য্যবীৰ বিপন্নেব আৰ্ত্তস্বব শুনিয়া বীৰদম্ভে আব অগ্রসব হইল না ! বিশ্ব বিজয়ী সৈন্তবৃন্দেব জয়োল্লাস বিপক্ষেব প্রাণে আব আতক্ষেব উদ্রেক কবে না ! চিতা নির্ঝাণেব সঞ্জে সঞ্জেই ভাবতেব দীপ্ত গোবব সমস্তই নিভিয়া গেল, নিবিড় অন্ধকাৰেব মাঝে নিদাক্ষণ অবসন্নতা আসিয়া দেখা দিল। বলদৃপ্ত আৰ্য্য সমাজ আপনাব প্রভাব হাবাইয়া বহুশতাব্দি ধৰিয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া বহিল।

কিন্তু এখনও আৰ্য্যাবৰ্ত্তেব এখানে সেখানে ছ'একটা ক্ষুদ্র বাজ্য গঠিত হইতেছিল। এইকপ এক ক্ষুদ্র বাজ্যেব মধ্যে ঐতিহাস প্রসিদ্ধ বিদেহ বংশীয় মহাবাজ শিশু নাগেব চতুৰ্থতম বংশধব “ভাতীয়” পবাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাবই বাজত্বকালে, কশিলবস্ত নগবে, ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ কবেন। প্রত্নতত্ত্ব বিদগণেব মতে, খৃষ্টাব্দিৰ্ভাবেব পূৰ্ব্বতন ৫৫৮ অব্দে, বুদ্ধদেব ধবাতলে অবতীৰ্ণ হন।

বুদ্ধদেবেব আবিৰ্ভাবেব পূৰ্বে, ক্ষত্ৰিয় শক্তিশূন্য আৰ্য্যসমাজ একবকম বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজ্য থাকিলেও দেশ তখন এক নকম

অবাজক। বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ তখন যজ্ঞের পুণ্যময় উদ্দেশ্যে তুলিয়া বৈদিক যজ্ঞ ফেলকে “কসাইপানা” ববিয়া তুলিয়াছিলেন! ২৯ প্রাণীৰ স্বৰ্গ যোষণা কবিয়া, হিংসাময় ধবণীৰ বলিকণা পশুবন্তে সিন্ত কবিয়া, ব্রাহ্মণ তখন নূতন গঠনে নব ব্রহ্মাণ্ড গঠন ববিতেছিলেন। ছিন্নকণ্ঠ অসহায় পশুব কঠোৰ আৰ্জনাৰে গুলোক ঢালোক সপ্তলোক ভেদ কবিয়া, গোলোক পম্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। নিবীৰ প্রাণীৰ কাতৰ ক্রন্দনে দেবতাৰ আসন টগিল, ধম্ম সংস্থাপনেৰ জন্ত যুগোপযোগী অবতাৰ বুদ্ধদেব সূৰ্য্য বংশীয় কক্ৰিষ কুলে অবতীৰ্ণ হইলেন।

( ২ )

কপি-বন্ত নগবেৰ শাসন কৰ্ত্তাৰ নাম “শুদ্ধোদন”, বাজা বড় পুণ্যাত্মা ও প্রজাবজ্জক ছিলেন। অসীম ক্রৈশৰ্য্যেৰ ক্রোড়ে বসিয়াও এই কমলাৰ ববপুত্রেৰ আগে একটুও শাস্তি ছিল না। এ অশান্তিৰ কাৰণ, বাজাৰ সন্তান হয় নাট।

বাণীৰ নাম “মায়াদেবী”, বাজা মহিষীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। মহিষী একদিন স্বপ্ন দেখিলেন—এক দিবা শ্বেতহস্তী যেন দন্তদ্বাৰা তাহাৰ উদৰ বিদীৰ্ণ কবিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ কৰিতেছে! স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া বাজাৰ ভয় হইল, স্বপ্নেৰ ফল জানিবাৰ জন্ত তখনি জ্যোতিৰ্বিদগণকে আহ্বান কৰা হইল। তাহাৰা গণনা কবিয়া বাজাকে বলিলেম, “মহাবাজ! এ স্বপ্ন আপনাৰ ভাবী শুভ সূচক, আপনি অচিবেই এক সাক্ষীভৌম পুত্ৰবত্ন লাভ কৰিবেন।”

জ্যোতিষীৰ কথায় বাজাৰ চিন্তাদূৰ হইল।

স্বপ্ন সফল হইল। অল্পদিনেৰ মধ্যেই বাণী গৰ্ভবতী হইলেন। বাজাৰ আৰ আনন্দ ধৰে না। নিবানন্দ নিজীৰ বাজপুত্ৰী, হৰ্ষ পুলকে প্রাণময়ী হইয়া উঠিল। পৃথিবীৰ এক পুণ্য মুহূৰ্ত্তে, পৌষমাসে, পুষ্যায়ুক্ত পৌৰ্ণমাসী তিথিতে, মহিষী এক পুত্ৰ প্রসব কৰিলেন। কিন্তু হায়! রাজাৰ দুৰ্ভাগ্য

কমে—প্ৰসবান্তেই প্ৰসূতিৰ প্ৰাণ বিয়োগ হইল। জন্মোৎসবেৰ মঙ্গল শব্দবৰ্ণনৰ সঙ্গ, শোকেৰ ভাষণ গোলাতল মিশিত হইল। বাজ্ঞেব অকাল মৃত্যুতে বাজ্ঞ কাতৰ হইয়া পড়িলেন। কৰ্ত্তব্য দাঁকিতা তেওঁময়ী ধাত্ৰী, সন্তোষাত গিঙাক বাক তুনিয়া গেল।

পিতাৰ কাছে “না মণা” ছেলেৰ আদৰ্শটো কৈ, বেণা মাৰি জোঁয়া থাকে। রাজা নব কুমাৰকে পাসিয়া মাৰিয়াব শৌক যথাক্ৰমে বিস্তা হইলেন। বিমাতা গৌতমীৰ যত্নে, জ্যোতিৰ্গৰ শিশু দিন দিন শাশি-কলাব মত বাঙিতে লাগিল।

যথা সময়ে, হিমালয় বাসী দৈবজ্ঞ বাজ্ঞ অসিত, “নবাবৰ্গ সিদ্ধি” নামে শিশুৰ নাম কৰণ কবিলেন। যাটবাব সময় এই দৈবজ্ঞ বাজ্ঞকে বাগৰা গেলেন,—“বাজন! কুমাৰকে সাবধানে বাখিবেন, এই শিশুৰ অঙ্গ চতুষ্টী লক্ষণ বৰ্ত্তমান, ইহাব জন্ম—কোনও মহত্বেদেদে সাধনেব জন্ম। এ শিশু যৌবনে সন্ন্যাসী হইবে, জ্যোতিৰ্গৰ বাজ্ঞ মুকুটেব প্ৰলোভনে ভুলবে না। কিন্তু যদি ইহাকে সংসাৰী কবিতো পাৰেন এ শিশু ভাবাতব সাক্ষৰ্ভোম সমাট হইবে।” দৈবজ্ঞেব কথায় বাজ্ঞৰ চিন্তা বাঙিল।

পঞ্চম বৰ্ষ বয়ঃক্ৰম কালে সিদ্ধাৰ্থ গুৰুগৃহে প্ৰেৰিত হইলেন। “বিশ্বামিত্ৰ” নামক এক বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্ম। বাগকেব শিক্ষাভাব গ্ৰহণ কবিলেন। সিদ্ধাৰ্থেব বিত্তাবস্ত হইল। গুৰু বলিলেন, বল “অ”, সিদ্ধাৰ্থেব মুখ হস্তে উচ্চাৰিত হইল—“অনিত্যঃ সৰ্ব সংসাৰ স্বৰূপঃ।”

গুৰু বলিলেন—বল “আ”, সিদ্ধাৰ্থ উত্তৰ দিলেন, “আত্মপৰ হিতঃ কাৰ্য্যঃ।” পঞ্চম বৰ্ষীয় বাগকেব মুখে এইকণ জ্ঞানগৰ্ভ বচন শুনিয়া গুৰু তো অবাক! তিনি এই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বাগকে নুতন কবিয়া আৰু কি ‘বৰ্ণ নালা’ শিখাইবেন? চৌবটি লিপিই শিশুৰ কৰ্ত্তব্য। সিদ্ধাৰ্থ গুৰুকে লক্ষ্য কবিয়া বলিতে লাগিলেন,—“কত মাং ভো! উপাধ্যায়। লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি?” স্তব্ধ হোৱাৰ কাছো গুৰুকে হাব মানিতে

হইল। গুরুকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া রাজকুমার রাজ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন

( ৩ )

ক্রমে সিদ্ধার্থের যৌবনকাল উপস্থিত হইল। রাজকুমারের সেই দীপ্তি গৌরবর্ণ স্নগঠিত দেহে অপূর্ব লাবণ্য বিকশিত হইয়া উঠিল। রাজা দেখিলেন—সিদ্ধার্থের সাংসারিক কোনও কার্যেই অনুরাগ নাই, রাজ-কার্য্য অপেক্ষা সিদ্ধার্থ ধর্ম্মকার্য্যই অধিক ভালবাসেন, প্রজাপালনের চেয়ে সাধু-সেবাতেই তাঁহার আনন্দ। রাজা পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্কল্প করিলেন—শীঘ্রই সিদ্ধার্থের বিবাহ দিতে হইবে। এ ঔদাসীন্মহা মহাব্যাধির মহৌষধ একমাত্র রমণীর প্রেম। রাজা পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন।

সিদ্ধার্থের যোগ্য পাত্ৰী মিলিতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। রাজাজ্ঞায় কত রূপসী, অতুলনীয় রূপের ডালি সাজাইয়া, রাজকুমারকে উপহার দিতে আসিল। এই সকল বালিকার সঙ্গে, সিদ্ধার্থকে স্বামীরূপে পাইবার জন্ত দণ্ডপাণির কণ্ঠা গোপাও আসিয়াছিল। গোপা অনিন্দ্য সুন্দরী, তাহার রমণীয় কলেববে অলোকসামান্য কমনীয়তা ছিল। সেই স্বভাব সরলা কুসুমকোমলা গোপাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থের মন মুগ্ধ হইল। সিদ্ধার্থের শক্তিসামর্থ্যে সমুজ্জ্বল স্ককুমার মোহন মূর্ত্তি দেখিয়া, গোপার নির্মল নারী-হৃদয়ও—পূর্ণচন্দ্র দর্শনে সিদ্ধুর মত উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। প্রণয়ের পূর্ব্বরাগেই “হুঁ হুঁ হুঁ এক ভৈঁ গেল।” বিকশিত যৌবনে, গোপার সেই দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়নের সঙ্কোচহীন দৃষ্টি—সিদ্ধার্থকে প্রেম-পাশে বাঁধিয়া ফেলিল। সিদ্ধার্থ গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন।

রাজা রত্নাগার শূন্য করিয়া লতাবিতান শোভী প্রমোদ বনে, নব-দম্পতীর বাসের জন্য বিহার ভবন নির্মাণ করাইয়া দিলেন। অনাসক্ত সিদ্ধার্থকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য শত শত সুন্দরী বিলাসিনী

যুবতী কনক চম্পক দাম গোবী গোপাব সঙ্গে বাজকুমাবেব সেবায় নিযুক্ত হইল। সেই মধুবানিল-বীজিত কুসুমিত উপবনে, নৃত্য বিশাবদা তরুণী-কুলেব চবণ মঞ্জিবেব মঞ্জু নিঃস্বনে মুখরিত, মম্মব-রচিত সুধা ধবল বিহাব ভবনে, দাম্পত্য জীবনেব দৈনন্দিন মান অভিমানে, বমণীব সোহাগ আদবে—সিদ্ধার্থেব জীবন বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। কখনো কুসুম সুঘুমা-কুল বকুল কুঞ্জে বসিয়া, কখনো বসন্তের ছায়ালোক বিচিত্র গোধুলির বেলায় কমল-হাসিনী সবসীব সঙ্গে স্বপ্নাগস সমীপণের ক্রীড়া দেখিয়া, কখনওবা অঙ্গবী সদৃশী গায়িকাকুলের স্ততন্ত্রী মধুব সঙ্গীত শুনিয়া, সিদ্ধার্থ নিত্য নূতন প্রেমলীলা অভিনয় কবিতে লাগিলেন। রাজা শুদ্ধোধন আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু রসনাপ্রিয় মধুব রসেও পবিতৃপ্তি দোষ আছে। অধিক মিষ্ট থাইলে “মুখ মরিয়া” যায়। “একঘেয়ে” জীবন অনেক সময়ই বিরক্তিকর। বিলাস-তৃপ্ত সিদ্ধার্থের মনে নগরভ্রমণের বাসনা জাগিল। গৃহ-কোণবাসী পুত্রের নগর-ভ্রমণের আকুলতা দেখিয়া, রাজা সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। স্থির হইল পরদিন কুমার নগরভ্রমণে বহির্গত হইবেন। যুবরাজ দর্শনের ভবিষ্যৎ আশায় নগরবাসী নরনারী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহাবা উৎসবেব আয়োজন করিতে লাগিল। প্রত্যেক গৃহদ্বার পল্লব-কুসুমহারে শোভিত হইল। জলধারাসিক্ত রাজপথে “দীপবৃক্ষ” প্রোথিত হইল। হর্ম্যাবলীর শীর্ষদেশে পীতবর্ণের পতাকা উড়িল। ভাস্কর নৈপুণ্যের আদর্শ তোবণ স্তম্ভে—রস্তাতরু ও জলপূর্ণ ঘট স্থাপিত হইল। নগরবাসীগণ নগরসজ্জার ক্রটি করিল না।

উষালোক প্রাদীপ্ত শোভনসুন্দর প্রভাতে, সারথি ছন্দকের সঙ্গে, সিদ্ধার্থ নগরভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কপিলবস্ত্র সেদিন দ্বিতীয় অলকা-পুরী। সিদ্ধার্থ যে যে পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, দেখিলেন—সর্বত্রই নয়নরঞ্জন সুন্দর দৃশ্য, সর্বত্রই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নির্মল চিত্র বিচিত্রিত। বধু



## জীবন চিত্র

নাট্যশালা হইতে উথিত নাবীকণ্ঠেব বন্দনাগীতি সিদ্ধার্থকে সম্বন্ধনা কবিল।  
প্রজাগণেব প্রফুল্ল মুখ—বাজকুমাবেব কাছে নন্দনেব ছবি আঁকিয়া দিল।  
বড আশায়, বড আনন্দে, সিদ্ধার্থ তাঁহাব ভ্রমণ শেষ কবিলেন।

অপবাহু উত্তীর্ণ প্রাণ দেগিয়া কুমাবেব আদেশে ছন্দক গৃহাভিমুখে  
বণেব গতি কিবাইল। ঠিক সেই সময়ে, স্তব্ধ সান্ধা প্রকৃতিব ক্রোড়ে,  
সংসার ভাডনায় মগ্নাৱত এক জবাজীর্ণ কুৎসিৎ মূৰ্ত্তি সিদ্ধার্থেব সম্মুখে  
উপস্থিত হইল। সেই দস্ততীন, লোলচৰ্ম্ম পলিত কেশ পবলোকেব যাত্রী,  
কবধৃত দণ্ডেব উপব দেহভাব অতিকষ্টে বক্ষা কবিয়া, একমুষ্টি উচ্ছিষ্টেব  
আশায় দ্ৰাবে দ্ৰাবে ফবিয়া হতাশপ্রাণে অবসন্ন দেহে বাজকুমাবেব কাছে  
ভিক্ষাব আশায় আসিয়াছিল। বৃদ্ধেব সেই বীভৎস মূৰ্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধার্থ  
ছন্দককে জিজ্ঞাসা কবিলেন,—“সাবধি ! এ ব্যক্তি কে ?”

ছন্দক বলিল,—“প্রভো ! এ একজন বৃদ্ধ।”

সিদ্ধার্থ আবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন—“ছন্দক ! ইহাব এ দশা কেন ?”

ছন্দক বলিল—“জবা বাক্ষসী ইহাব এ দশা কবিয়াছে, এ হতভাগ্য  
বার্দ্ধক্যে চলৎশক্তি বহিত হইয়াছে, তাহাট ভিক্ষা ইহাব উপজীবিকা।”

সিদ্ধার্থ বলিলেন, “জবা ইহাকে কেন আক্রমণ কবিল ?”

ছন্দক কহিল,—“শুধু ইহাকে কেন, প্রাণীমাত্ৰকেই জবা আক্রমণ  
কবিয়া থাকে।”

সিদ্ধার্থ কাতব হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন,—“আমাকেও কি তবে জবা  
আক্রমণ কবিবে ? জবাব কবলে পাড়িয়া আমাব আনন্দময়ী গোপাও  
কি এটুকুপ বিকপা হইবে ?”

ছন্দক উত্তৰ কবিল—“হাঁ প্রভো ! জবাব আক্রমণ হইতে কাহাবও  
পৰিত্ৰাণ নাই।”

মানব দেহেব পৰিণাম ভাবিয়া সিদ্ধার্থ শিহবিয়া উঠিলেন ! বৃদ্ধ  
ভিক্ষা পাইয়া আশীৰ্ব্বাদ কবিতে কবিতে চলিয়া গেল ; সেকথা সিদ্ধার্থ

## ধর্মাবতার বুদ্ধদেব

জ্বলিতেও পাইলেন না ; তিনি তখন একমনে মানবের ভবিষ্যৎ ভাবিতে-  
ছিলেন ।

অল্পদূর গিয়াই সিদ্ধার্থ আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন । সে  
একজন যুবা, কিন্তু ব্যাধি যন্ত্রণায় তাহার রক্তহীন শ্রাবণ মুখ বিকৃত হইয়া  
পাড়াহারা । সে কি ভাষণ মুখি, অফি কোটবগত, অস্থি চর্মসার দেহ  
নীলবর্ণেব শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, হস্তপদ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল,  
ক্ষণ দীর্ঘ্বাসে পঞ্জরতটে মুহুমুহঃ আঘাত করিতেছিল, হতভাগ্যের শার্ণ  
গণ্ডস্থল বহিয়া মর্ষ শোণিতের মত অশ্রু বারিয়া পড়িতেছিল । দেখিয়া,  
সিদ্ধার্থের প্রাণ সহানুভূতিতে গলিয়া গেল । তিনি ছন্দকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, “ছন্দক ! এ কে ? দেখিতেছি যুবা, কিন্তু ইহার এমন  
দুর্দশা কেন ?”

ছন্দক বলিল, “কুমার ! এ ব্যক্তি বোগী, দারুণ ব্যাধি ইহাকে  
যৌবনেই বুদ্ধ সাজাইয়াছে । ব্যাধি—জীবদেহের সকল সৌন্দর্য্যই অপহরণ  
করে !”

সিদ্ধার্থ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—যে ব্যাধি যন্ত্রণায় মানবদেহ  
এমন বিকৃত হইয়া যায়, ছন্দক ! সে ব্যাধি কি আশ্রয়ও আক্রমণ করিতে  
পারে ?”

ছন্দক বলিল, “দেহ মাত্রই রোগের আশ্রয়স্থান, রোগ সকলকেই  
আক্রমণ করিয়া থাকে ।”

আজন্ম স্মৃখী সিদ্ধার্থ ব্যাধিব বিকট আদর্শ দেখিলেন । তাঁহার মনে  
হইল—জরার আক্রমণে, ব্যাধির তাড়নায়, মানব যখন এমন শ্রীহীন হয়,  
তখন সংসারে স্থখ কোথায় ? চিন্তাকুল চিন্তে সিদ্ধার্থ পথ অতিক্রম  
করিতে লাগিলেন । সহসা একদিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল । সিদ্ধার্থ  
দেখিলেন—বজ্রাবৃত কোন পদার্থ স্তম্ভে করিয়া চারি ব্যক্তি কঁাদিতে  
কঁাদিতে সেই দিকেই আসিতেছে । নিকটে আসিলে, সিদ্ধার্থ ছন্দকে

জিজ্ঞাসা কবিলেন,—“ছন্দক ! ইহাবা কাঁদিতে কাঁদিতে ও কি পদার্থ লইয়া যাইতেছে ?”

ছন্দক উত্তর কবিল—“প্রভো ইহাবা শবদেহ স্বপ্নে লইয়া যাইতেছে। মৃতব্যক্তি ইহাদেব আত্মীয়, তাই তাহাব শোকে ইহাবা কাঁদিতেছে।

সিদ্ধার্থ বলিলেন,—“শব দেহ কি ? ছন্দক কহিল,—“প্রাণ শূন্য জীব দেহকে শব বলে। শবেব চৈতন্য থাকে না, কামনাও থাকে না। ঐ ব্যক্তিব মৃত্যু হইয়াছে—তাই উহাব আত্মীয়গণ উহাকে শ্মশানে বিসর্জন দিতে লইয়া যাইতেছে।”

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা কবিলেন—“এই মৃত্যু কি সকলেবই হয় ?”

ছন্দক বলিল,—“হাঁ প্রভু ! দেহী মাত্রেবই মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুকে কেহই অতিক্রম কবিতে পাবে না।”

সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিলেন,—“মানব জীবন যদি এমন ক্ষণভঙ্গু, তবে এ ঐশ্বৰ্য্যেব প্রলোভন কেন ? কেন জীব দুই দিনেব জন্ম আসিয়া এমন নিগড় বন্ধনে আবদ্ধ হয় ?”

সিদ্ধার্থেব প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই স্বভাব সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখ, প্রলয় সহচর অন্ধকাব আসিয়া গ্রাস কবিল ! এমন সময় সিদ্ধার্থ দেখিতে পাইলেন—পথি পার্শ্বে—এক জ্যোতিষ্ময় মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। সিদ্ধার্থ সেই দেবতুল্য রূপ একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তাহাব পব ছন্দককে জিজ্ঞাসা কবিলেন—“ছন্দক ! ইনি কে ?”

ছন্দক বলিল—“প্রভো ! ইনি সৰ্ব্বজীবে সমদৰ্শী ব্রহ্মানিষ্ঠ সন্ন্যাসী। সংসার অসার জ্ঞানে—ইনি গৃহ ছাড়িয়া এই পবিত্র ধৰ্ম্ম অবলম্বন কবিয়াছেন। ইহাব রূপগৰ্ব্ব নাই,—মস্তকে সুদীর্ঘ জটা, অঙ্গে ভগ্ন বিভূষিত, পরিধানে গৈরিক বসন। ইহার বিলাস নাই, বাসনা নাই, ইনি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল কণাতেই পরিতৃপ্ত। প্রলোভন জয় করিয়া ইনি

মুক্তিৰ পথে অগ্ৰসৰ হইতেছেন।” সিদ্ধার্থেৰ ভক্তি হইল, তিনি সন্ন্যাসীকে প্ৰণাম কৰিয়া চন্দককে বলিলেন,—“চন্দক। এতদিনে আমাৰ জীবনেৰ পথ দেখিতে পাইলাম। মানব জীবনেৰ উদ্দেশ্য—আত্মহিত ও পৰহিত সাধন কৰা, হাব।—মানুষ কেন সন্ন্যাসী হয় না—”

সিদ্ধার্থ বাটীতে ফিৰিয়া আসিলেন। কিন্তু বাস্তবৰ উজ্জল আলোকে তাহাৰ কামনাময় ইন্দ্রিয় জন্মৰ মত্ত মুছিয়া গেল। সিদ্ধার্থ অতিকষ্টে বিহাৰ ভৱনে উপস্থিত হইলেন। পৰিপূৰ্ণ যৌৱন ভাব লইয়া প্ৰেমময়ী গোপা—তাহাৰ ও নীক্ষা কৰিতোছিল। সিদ্ধার্থ সেই উৎকণ্ঠিতা তৰুণীৰ প্ৰতি ফিৰিয়াও চাহিলেন না, নীৰৱ গৃহে প্ৰবেশ কৰিলেন। স্বামীৰ ভাব দেখিয়া, যুৱতীৰ সেই বৃত্তান্তিত স্তম্ভ বুকখানিতে, প্ৰেম সহচৰ অভিমানেৰ উদয় হইল। বিহাৰ ভৱনে সে নিশিতে আৰ সঙ্গীতেৰ মুৰ্ছনা ফুটিল না, গোপা জানিত না, নগৰ ভ্ৰমণে গিয়া, জবাবাধি মৃত্যু সঙ্কল সংসাৰেৰ জীবন্ত ত্ৰি দেখিয়া, তাহাৰ স্বামীৰ কি অদ্ভুত পৰিবৰ্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দম্পতাৰ উচ্ছ্বাস তবজিত হৃদয়েৰ মধ্যস্থলে, স্বৰ্গমন্দিৰ মध्ये বহুশয় ছায়াপথেৰ মত—কি একটা নূতন জিনিষ সহসা আত্ম প্ৰকাশ কৰিবাছে।

( ৪ )

সিদ্ধার্থ সন্দৰ্ভ অশ্রু মনস, তাহাৰ মন শূন্যতায় ভৰিয়া গিয়াছিল, তিনি জীবন পথে অগ্ৰসৰ হইবাব অবসৰ খুঁজিতেছিল। এই সময়ে—গোপা এক পুত্ৰবত্ৰ প্ৰসব কৰিল। সিদ্ধার্থ বুঝিলেন বন্ধনেৰ উপৰ সূদৃঢ় বন্ধন পড়িতেছে। আৰ সংসাৰে থকা উচিত নয়।

গভীৰ নিশীথে—পূৰ্ববাসীগণ যখন সকলেই নিদ্ৰাগত—সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ কৰিবাব জন্ত প্ৰস্তুত হইলেন। যাইবাব সময় এববাৰ গোপাকে দেখিবাব ইচ্ছা হইল। সেই শতশ্ৰুতি জড়িত শব্দ মন্দিৰে প্ৰবেশ কৰিয়া

সিদ্ধার্থ দেখিলেন—কাক কার্য্য খচিত গজদন্তেব পালঙ্কে—তঁাহাবি স্পর্শ-পূত কোমল শয্যায় গোপা নিদ্রিতা, পার্শ্বে প্রফুল্ল কল্লাব কুসুম্বেব মত তঁাহাবি ঔবসজ্জাত ক্ষুদ্র শিশুটী শুইয়া বহিয়াছে ! প্রজ্জলিত দীপালোকে—সিদ্ধার্থ প্রাণ ভবিয়া সেহ “সুসমাব কোণে সুসমা” দেখিতে লাগিলেন, সেই গভীৰ হৃদয়ব্যাপী প্রেম—মুহূৰ্ত্তেব তবে একবাব সজাগ হইবা উঠিল ! তথনি বিবেক আসিয়া বলিয়া দিল—“প্রেমেব পিপাসা—মবোচিকাব নিষ্ঠুৰ ছলনায় বিড়ম্বিত !” অপবাদীৰ মত নতমুখে সিদ্ধার্থ একবাব ভাবিলেন, তাবপব হৃদয়েব সমস্ত বল একত্ৰ কবিয়া, সেই নিদ্রালস নব যুবতী পত্নী, অভিনব আনন্দময় ঔবসজ্জাত পুত্ৰ, অতুলনীয় বাজ্য সুখ, ধূলিমুষ্টিৰ মত পবিত্ৰ্যাগ কৰিয়া, ধীবে ধীবে গৃহত্যাগ কবিলেন ।

( ৫ )

বাত্ৰি শেষে—এক ভীষণ কুস্পন্ন দেখিয়া, গোপা জাগিয়া উঠিল, গোপাব আৰ্ত্তনাদে সহচৰীগণও শয্যাত্যাগ কবিল । গোপা বলিল—“একবাব আৰ্য্যপুত্ৰকে ডাকিয়া আন” । প্রতি কক্ষ তন্ন তন্ন কবিয়া অনুসন্ধান কবা হইল—সিদ্ধার্থকে পাওয়া গেল না । তথনি রাজাকে সংবাদ দেওয়া হইল । তখনও প্রভাত হয় নাই । নিদ্রাতুব নয়নে ব্যাকুল পুৰবাসীগণ চাবিদিকে বাজ পুত্ৰেব অনুসন্ধান কবিত্তে লাগিল, গ্রাম বাসীবাও ছুটয়া আসিল । বাজ বাড়ীতে হাহাকাব উঠিল । রাজা বুঝিলেন—সিদ্ধার্থকে আব পাওয়া যাইবে না । তঁাহাব জীবনেব সার্থক সাধন—প্রলোভনকে জন্মেব মত জয় কবিয়াছে,—হৃদয়েব শোণিত ধাবা চালিলেও আব সে ফিবিয়া আসিবে না ।

( ৬ )

এদিকে সিদ্ধার্থ অনেক দেশ অতিক্ৰম কবিয়া বৈশালী নগবে উপস্থিত হইলেন । তিনি জগতে চিবশান্তিব উৎস অনুসন্ধান কৰিতেছিলেন ।

যৌবনে—বাৰ্দ্ধক্যৰ ভয়, কাপ—ব্যাধিৰ ভয়, দেহে যম ভয়, মৃত্যুতে পুনৰ্জন্মৰ ভয়, মানব জীৱন ইন্দ্ৰিয় বহিৰ ইন্দ্ৰিয় জগতে শান্তি কোথায় ? কিন্তু এই অনিত্য সংসাবে নিত্য পদাৰ্থ কি কিছুই নাই, দেহপণ কবিয়াও কি প্ৰকৃত শান্তি পাইব না ?—সিদ্ধাৰ্থ চিন্তানলে দগ্ধ হহতে লাগিলেন। প্ৰথমে শাস্ত্ৰৰ প্ৰতি তাঁহাৰ দৃষ্টি পতিত হ'ল। সিদ্ধাৰ্থ—বেদজ্ঞ উদৰ্ক ও অলৰ্কেৰ কাছে পৈদ শিক্ষা কবিলেন, অঙাব পণ্ডিতৰ শিষ্যত্ব স্বীকাৰ কবিয়া সমগ্ৰ হিন্দু শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কবিলেন। কিন্তু কৈ ? তাহাৰ পিপাসা তো মিটিল না, আকাঙ্ক্ষাৰ ও নিৰুত্তি হইল না। অতৃপ্ত হৃদয়ে, সিদ্ধাৰ্থ বাজ গুচাভিমুখে যাত্ৰা কবিলেন।

বাজগৃহেৰ সন্নিহিত কোনও তপোবনে কদ্রক ঋষিৰ আশ্ৰম ছিল। সিদ্ধাৰ্থ কদ্রকেৰ শিষ্য হ'লেন। সেখানে যোগ শাস্ত্ৰৰ উপদেশ লাভ কৰিবা উৰ্ব্বাশয় গ্ৰামে গিয়া তপশ্চৰণে প্ৰৱৃত্ত হইলেন। এই সময়—কৌণ্ডিন্য প্ৰভৃতি পঞ্চ সন্ন্যাসী তাঁহাৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কবিল। পঞ্চ শিষ্য সহ সিদ্ধাৰ্থ গয়াধামে উপস্থিত হইলেন।

পবিত্ৰ গয়াধামে এক বিশাল বটবৃক্ষ তলে সিদ্ধাৰ্থ মহাধানে নিমগ্ন। শিষ্যগণ বীৰাসনস্থ গুৰুদেবেৰ সেই ঋজু আয়ত স্পন্দ বহিত দেহ ৰক্ষা কৰিতেছিল। এই ভাবে ষষ্ঠবৰ্ষ অতীত হইল, তবুও তাঁহাৰ চৈতন্য হইল না। দূৰ দুৰ্ভাগ্য হইতে অসংখ্য নৱনাবী সেই সম্ভাৰিমগ্ন মহাপুৰুষকে দেখিতে আসিল। সকলে সৰিষ্ময়ে দেখিল কি অপূৰ্ণ তাপস মূৰ্ত্তি! ফুল বাজীৰ বক্ত পাণি যুগল অকোপৰি উত্তান ভাবে স্থাপিত, ক্ৰন্তক ৰহিত নিশ্চল, চক্ষু নাসাগ্ৰে নিবিষ্ট, সে দেহে জীৱনেৰ চিহ্ন ও ছিল না। সে মূৰ্ত্তি যেন দৃষ্টি ক্ষোভ বহিত জলধৰ কিম্বা তবল ভঙ্গহান মহাসাগৰ।

সিদ্ধাৰ্থেৰ এই সমাধি অবস্থাৰ সাদৃশ্য কুমাৰসম্ভবে দেখিতে পাওৱা যায়। যোগমগ্ন মহাপুৰুষ দেখিলে, মদন তাঁহাকে বেগ দিতে ছাড়ে না। মদন (মদন) সিদ্ধাৰ্থেৰ তপোনিম্ন কৰিবাব জন্তু মায়াকল্পাগণেৰ সজ্জ

পৰামৰ্শ কবিল। হাব, ভাব, প্ৰলোভন, সাম্ৰাহন, বশীকৰণ একে একে সমস্ত অস্থাই পাৰিত্যাগ কবিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। সে অপূৰ্ণ সংগ্ৰামে মাৰেব সকল শক্তি সিদ্ধাৰ্থেব মহাশক্তিব বাছে অপদস্থ হ'ল। সিদ্ধাৰ্থেব উপৰ লোকেৰ শত্ৰু-ভক্তি শত গুণে বাডল।

ছয় বৎসৰ পৰে সিদ্ধাৰ্থেব ধ্যান ভঙ্গ হইল। অনাশ্ৰবে তাঁহাব শবীৰ এত দুৰ্বল হইয়াছি। যে একদিন নদাতীৰে বেড়াইতে গিয়া তিনি মুছিত হইয়া পড়িয়া যান। সেই সময় স্ৰজাতা নামী কোনও দয়াবতী মহিলা সিদ্ধাৰ্থেব অশ্ৰুমা কৰেন, স্ৰজাতাপ্ৰদত্ত পায়স ভক্ষণ কৰিয়া সিদ্ধাৰ্থ সুস্থ হ'ল।

এ দিন মনেৰে বগে বাজুকুমাৰেব সেই সুখলালিত কোমল অঙ্গ সৰল ৩৭. সে অনাশ্বাসে সঠিয়াছিল। অযাচিত জল ও চন্দ্ৰবশ্মি পাৰিত্য। তাৰ আশাৰ সমাপ্তি হইলেন। এইবাব তাঁহাব কাননা 'সে' হৈল। তাঁহাব সমস্ত বাসনা নিৰ্বাণ লাভ কবিল, সিদ্ধাৰ্থ মুক্তিব পথ দেখিতে পাইলেন। আশ্বাব স্বৰূপ নিৰ্ণয়ে সমর্থ হইয়া, বৈশাখী পূৰ্ণিমায় সিদ্ধাৰ্থ 'বুদ্ধ' লাভ কবিলেন। ক্ৰমে তাঁহাব ষষ্ঠী সংখ্যক শিষ্য জুটিল, জীৱনুক্ত মহাপুৰুষ—শিষ্যসকল ধৰ্মপ্ৰচাৰ কাৰ্য্যে—দেশে দেশে ভ্ৰমণ কৰিতে লাগিলেন।

ভাৰতবাসী কঠোৰ শাস্ত্ৰবন্ধন হইতে মুক্ত হইবাব চেষ্টা কৰিতেছিল,—ঠিক সেই সময় তাহাদেব শ্ৰবণবিবৰে সিদ্ধাৰ্থেব অমূল্য উপদেশ প্ৰবেশ কবিল। সিদ্ধাৰ্থেব নব ধৰ্ম—বেদপন্থাব অসম্পূৰ্ণতা দেখাইয়া দিয়া জগৎবাসী নবনাবীকে মুক্তিব প্ৰলোভনে আপনাব কোলে তুলিয়া লইল। বুদ্ধদেব সকলকেই বুঝাইলেন—“ধৰ্ম্মেব বাহ্যক অহুষ্ঠান, প্ৰাণ-শূন্য। প্ৰাতঃস্নান কৰিয়া, মন্ত্ৰ পঢ়িয়া, 'বেদী' সাজাইয়া, পশু বলি দিয়া, মানুহেব ধৰ্ম্মযাজনা হয় ন'। ধৰ্ম্ম—আৰ্থোৎকৰ্ষসাধনে, ধৰ্ম্ম—দয়াবৃত্তিৰ পৰিচালনে, সদ্ভক্তি, সংস্কৰণ, স'বাক্য, সত্যবহাব, সহপায়ে জীৱনধাৰণ, সং

চেষ্ঠা, সংস্কৃতি, সম্যক সমাধি, এই অষ্টবিদ উপায়েই মানব ধৰ্ম্মপথে অগণন হইতে পাবে।”

তখন ভাৰতবৰ্ষ নগৰে নগৰে, গাচ গাচে ধ্বনিত হইল—“অহিংসা পৰমো ধৰ্ম্মঃ”। বুদ্ধদেব শিষ্যাগণ নবীন উৎসাহে আযাধ্যৈব সজ্জিত সংগ্রাম আৰম্ভ কৰিল। সমাজে হুলস্থূল পাইয়া গেল। বৌদ্ধধৰ্ম্মীগণ দেশে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—“বেদ অভ্রান্ত নয়, অনাদিও নয়। দেবদেবীৰ উপাসনায় মুক্তিলাভ হয় না। ঈশ্বৰ স্বয়ং কৰ্ম্মফলেৰ ব্যতিক্রম কৰিতে সমৰ্থ নহেন। ধৰ্ম্ম—পৰোপকাৰে, ধৰ্ম্ম—অহিংসায়।”

এই মন্ত্ৰ মুগ্ধ হইয়া পঁতাহ শত সহস্র নবনাবী বৌদ্ধধৰ্ম্ম গ্ৰহণ কৰিতে লাগিল, প্রাচীন সনাতন ধৰ্ম্ম পৰিত্যাগ কৰিয়া অনেকেই বুদ্ধদেব শৰণাগত হইল। প্রবল পৰাক্রম ভূপতিগণকেও বুদ্ধদেব স্বৰ্ণম্বে দীক্ষিত কৰিলেন। বাজা বিঘিসাৰ বৌদ্ধ হইলেন, প্রজাবা বাজপ্ৰাষ্টান্তেৰ অনুসৰণ কৰিল—সমস্ত আৰ্য্যাবৰ্ত্তে বৌদ্ধধৰ্ম্ম বহুমূল হইয়া পড়িল। বুদ্ধশিষ্যাগণ সমস্ত জগৎকে শৃংখ পদাৰ্থে পৰিণত কৰিলেন। ভাৰতে জাতিবিচাৰ তিবোহিত হইল।

এইদৰে বুদ্ধদেব পিতৃদৰ্শন কৰিবাব ইচ্ছা হইল। বহুকাল পৰে, বুদ্ধদেব শৈশব স্বপ্ন জড়িত জন্মভূমি অভিমুখে যাত্রা কৰিলেন। সিদ্ধার্থেৰ আগমন সংবাদ পাইয়া নগৰে তুমুল কোলাহল উঠিত হইল।

সন্ন্যাসীবেশে বুদ্ধদেব পুৰিপ্রবেশ কৰিলেন। পুৰমুখ দৰ্শনে শুদ্ধোদনেৰ পূৰ্ব্বেশোক উথলিয়া উঠিল। গোপা ছিন্নমুখ লতিকাৰ ছায় পতিব পদ-প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। সিদ্ধার্থ—সহধৰ্ম্মিণীকে সাস্তুনা কৰিয়া বলিলেন,—“গোপা! আৰ কাঁদিও না, তুমি আমাৰ সহধৰ্ম্মিণী, আমাৰ জীৱনেৰ মহাত্ৰতে তুমি কি সহায় হইবে না?”

স্বামীৰ আজ্ঞায় গোপা সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। কোমল শিৰীষ কুন্তলে পতঙ্গীৰ পদ সংস্পৃষ্ট হইল। গোপা—নিজহস্তে ভ্রমবন্ধ কুঞ্চিত কেশ



কলাপে জটা রচনা করিয়া, বিশীর্ণ বাহুপ্রকোষ্ঠে অক্ষয়্য বোধিলেন। তৃণময় কাঞ্চী, রত্ন মেথলার স্থান অধিকার করিল। গোপা বসন ছাড়িয়া বকুল ধারণ করিলেন।

সিদ্ধান্তের সপ্তমদর্শীয় পুত্রও পিতৃধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এই সময় ভগ্নবাস্ত্য শুদ্ধোদন প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুরবাসিনী রমণীগণ সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিল। এই সকল রমণী লইয়া বুদ্ধদেব স্ত্রী ভিক্ষুণীর দল গঠিত করিলেন। গোপা এই নারীদলের নেত্রী হইলেন।

পঞ্চ-চত্বারিংশ বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধদেব অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এইবার তিনি বুঝিলেন—তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। সিদ্ধার্থ কুশীনগরে গমন করিয়া সমস্ত শিষ্যকে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বৎসগণ! আমার আসন্ন কাল উপস্থিত। আমার মৃত্যুর পর ধর্ম্ম ও নিয়ম যেন তোমাদের নেতা হয়।”

এ জগতে ইহাই তাঁহার শেষ উপদেশ। কুশী নগরেই, সেই আদর্শ ব্রহ্মচারী, মানবের ক্ষুদ্র অহমিকা মনুষ্যত্বে পরিপুষ্ট করিয়া, ভক্তগণের অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া মহানির্বাণ লাভ করিলেন।

বুদ্ধদেব ভারতের গৌরব, ভারতের শিক্ষক। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী এখনও ভারতের নগরে, কাব্যে, পুরাণে, ইতিহাসে, তাম্রফলকে, শিলা লিপিতে, বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

# ভগবান্ শঙ্করাচার্য

[ শঙ্করের জীবনী, সময় নিরূপণ, তদীয়  
ধৰ্ম্মমত ও উপদেশ ]

সে অনেক দিনেব কথা। বেদ পছাব বিবোধী উদাব সাম্য “গৌদ্ধ  
ধৰ্ম্ম”—তখন বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

সিদ্ধার্থ গৌতম তাঁহাব মহাসাধনাব শীলধৰ্ম্ম হইতে ঈশ্বৰকে নিবা-  
কৃত কবিয়াছিলেন, তাই জ্ঞানজ্যোতিঃ সমজ্জল বৌদ্ধধৰ্ম্মেব ভিত্তিৰ মূল  
শিথিল হইয়াছিল, এতদিনে সেই সুদাকণ কঠোৰতাৰ ভীষণ প্রতিক্রিয়া  
আবস্ত হইল! সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইল। ব্রাহ্মণ কৰ্ত্তৃক  
পবিত্ৰহীতা বেষ্ট্রা, “বধূ”—সন্মান পাইয়া অবশুষ্ঠগবতী অন্তঃপুৰ্ণাবিণী  
সাজিয়া ব্রাহ্মণীৰ মত সকলেব শ্রদ্ধাব পাত্রী হইলেন! সামান্ত প্রজা  
হইতে মহাবাজা পর্য্যন্ত, সকলেই বিলাসে মগ্ন! বাজা মন্ত্ৰীৰ উপব  
বাজ কাৰ্য্যেব ভাব দিধা, নিশ্চিন্ত মনে অন্তঃপুৰেব কৰ্ত্তব্য পালন  
কৰিতে লাগিলেন। অপমানেব ভয়ে, মনঃপীড়ায়, আত্মগোপনেব ছলে,  
অনেকেই “মাথা মুড়াইয়া” শ্রমণ সাজিতে লাগিল। মধুমাসে, মধুসথাব  
প্রতাপে, দক্ষিণ পবনে, বকুল সৌৰভে, কুলবধূব বহুবস্ত্রে পোষিত  
মান শিথিল হইয়া পড়িল; কৰ্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ আলস্তপবতন্ত হইয়া তরুণী  
ও বাকুণীৰ সেবায় আত্ম সমৰ্পণ কৰিল! ঘবে ঘবে নৃত্যগীত আর  
“মদনোৎসব”। স্বয়ং রাজ্যেশ্বৰী, প্রাসাদেব প্রমোদবনে—রক্তাশোক

তৎকালে পুষ্প চন্দন দানে কুম্ভমাযুধেব পূজা কৰিতে শিখিলেন।\* বৈবাগ্যেৰ পভাবে নবনাবৌব মনোবৃত্তি অনেকটা চাপা ছিল, চৰিত্ৰেৰ নে দঢ়তা বিলাসেৰ স্ৰোত ভাসিয়া গেল। সংস্কৃত নাটক আদিবস প্ৰেৰণ হইয়া উঠিল। বৌদ্ধপন্থাৰ “সংঘম শিক্ষা” যথেষ্টাচাবে পৰিণত হইল। পেকাশ্ৰু উচ্ছ্ৰান্তায়—ঋণচৰিতাৰ্থ প্ৰবৃত্তকে সকলোই উপাসনা কৰিতে লাগিল। মানুষ, অস্ত্ৰেৰ বাহিৰে এতদূৰ চুনৌক্তি পৰায়ণ হইয়া উঠিল, যে বাহ্যাবো কুল বহল না, শীল বহিল না, বৌদ্ধ কাপালিকেব নিতীক কপটাচাবে দেশ কাঁপিতে লাগিল। প্ৰতিগ্ৰহেৰ প্ৰাঙ্গণ হইতে সবল কুলনাবৌব মন্যভেদী অভিপাপ আৰু নিবীহ গৃহস্থেৰ বুক ফাটা হাঙা-কাৰ উথিত হইয়া না স্তকতাক্ৰপ মধ্যশাপেৰ মহা প্ৰায়শ্চিত্ত আবন্ত হইল।

বৌদ্ধেৰা জাতিভেদ মানিত না। প্ৰথমে এট ঘটনা লটয়াই ব্ৰাহ্মণ-সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাৰ পৰ, যখন ব্ৰাহ্মণেৰা শুনিলেন—যে শূদ্ৰকে তাঁহাৰা শাস্ত্ৰ অনধিকাৰী জ্ঞান কৰিতেন—সেই শূদ-সমাজে বৌদ্ধগণ অবলৌল্যক্ৰমে পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ প্ৰচাৰ কৰিতে বসিল, তখন তাঁহাৰা অস্থিৰ হইয়া পড়িলেন। সযত্ন-বচিত দুৰ্গম-শাস্ত্ৰ দুৰ্গ মध्ये শূদ সমাগত দেখিয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজ মৰ্ম্মাহত হইল। ভাবতব্যাপী সমাজ বিপ্লবেৰ ইহাই প্ৰথম সূত্ৰপাত।

ঘোৰতৰ পৰিশ্ৰমেৰ পৰ, প্ৰাণী মাংসেই যেমন কিছুকাল বিশ্ৰাম কৰিয়া শক্তি সঞ্চয় কৰিয়া লগ, বৌদ্ধধৰ্ম্মেৰ প্ৰাৰম্ভে, কিছুদিন মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, আৰ্য্য সমাজও যেমনি নবশক্তি সঞ্চয় কৰিল। কুমাবিল ভট্ট প্ৰমথ নৈয়ায়িক, দাৰ্শনিক, মীমাংসক পণ্ডিতগণেৰ প্ৰবল উত্তমে, হিন্দুধৰ্ম্ম আৰাৰ নূতন বেশে সাজিয়া, বহু বৌদ্ধচৰ্ছ অঙ্গে বাবণ কৰিয়া মাথা তুলিবাৰ উপক্ৰম কৰিল।

\* ‘ব্ৰহ্মাবনী’ ও ‘হৃচ্ছকটিক’—সে সংঘেৰ সমাজ চিত্ৰ।

ভাবতবাসী তখন বিষম বিব্রত। একদিকে বিদেশীৰ ভাবত প্ৰবেশেৰ উদ্যোগ, অন্যদিকে বিধৰ্ম্মীৰ প্ৰবল উৎপীড়ন! কিন্তু বিদেশীৰ আক্ৰমণ অপেক্ষা, বিধৰ্ম্মীৰ আক্ৰমণই তখন অধিকতৰ আশঙ্কাৰ কাৰণ হৈয়া উঠিল। সৰ্বভাষী ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়কে বাজাপালনেৰ ভাব দিয়া, নিজেৰ হস্তে ধন্যপালনেৰ ভাব লইয়াছিলেন। এইবাব সেই ভাব-প্ৰণেৰ যোগ্যতা দেখাইবাব শুভ অবসৰ উপস্থিত। পঞ্চদশবাসী ক্ষত্ৰিয়-গণ—অস্বদাবণ কবিয়া বিদেশীৰ লুপ্ত দৃষ্টি হইতে ভাৰতকে বক্ষা কৰিবাব উদ্যোগ কাৰ্য্যেছিলেন, এইবাব মগধ, কান্যকূজ প্ৰভৃতি নগৰে বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণগণ শাস্ত্ৰ হস্তে লইয়া বিধৰ্ম্মী বৈজ্ঞ মত গুণে প্ৰস্তুত হইতে লাগিলে।

ভাৰত প্ৰাণেৰ এই কেন্দ্ৰস্থলে—জাতীয় জীবনেৰ এই সঙ্কটময় সন্ধিক্ষেত্ৰে—এক দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুৰুষেৰ আবিৰ্ভাব হইল। বৌদ্ধ-দৰ্শনৰ উচ্ছেদ সাধন কৰিয়া বিপন্ন হিন্দুধৰ্ম্মকে বক্ষা কৰিবাব জন্তু—ঠিক এই সময়ে ভগবান্ শঙ্কবাচার্য্য জন্মগ্ৰহণ কৰিলেন।

অবতাব অৰ্থে যদি যুগোপযোগী চৰম উন্নতিৰ অবতাবণ হয়, তবে শঙ্কবাচার্য্য শঙ্কবেৰ অবতাব! এমন অদ্ভুত জীবনী, এমন আত্মোৎসৰ্গেৰ চৰম আদৰ্শ, এমন অমানুষিক প্ৰতিভা বুঝি আব কোনও দেশে কেহ কখনও দেখে নাই।

ইউৰোপীয় প্ৰত্নতত্ত্ববিদগণেৰ মতে শঙ্কবাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্ৰাচুৰ্ভূত হইয়াছিলেন। আমাদেৰ দেশেৰ কেহ কেহও এই মতাবলম্বী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবাব \*ক্ষবেৰ সময় নিকপণ কৰিতে গিয়া যে সকল প্ৰমাণ প্ৰয়োগ কৰিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটাই প্ৰধান—

“নিধিনাগে ভবহ্যক্বে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।

কল্যক্বে চন্দ্রনেত্ৰাক্ষ বহ্যক্বে শিবতামগাৎ ॥”

এই “নিধিনাগে ভবহ্যক্বে” অৰ্থে ৩৮৮৯ কল্যক্বে বুঝায়। সুতবাং ইহা ৭৮৮ খৃঃ অব্দই বটে। কিন্তু শঙ্কবাচার্য্য প্ৰতিষ্ঠিত “সাবদামৰ্ঠে”

আচার্য্যাপবম্পবায় যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবনের ঘটনাবলী সমস্তই লেখা আছে। ঐ তালিকার মতে—“যুধিষ্ঠির-শকে ২৬৩১ বৈশাখ শুক্ল পঞ্চমাং শ্রীমচ্ছঙ্করাবতারঃ।” এই যুধিষ্ঠির শক-কল্যাণেরই নামান্তর মাত্র, কেবল ৬৫৩ বৎসরের পার্থক্য। অতএব শঙ্কর ২৬৩১ কল্যাণে অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। এমন জীবন্ত প্রমাণকে অগ্রাহ্য কবিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেন যে তাহাদেব আনুমানিক প্রমাণের বলে শঙ্করের আবির্ভাব কাল নিকূপণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

( ২ )

সে দিন ভূত চতুর্দশী। বারিকল্লোল মুখরা নন্দ্যদার পুণ্য পুলিনে, এক প্রগাঢ় জনতাময় শিবমন্দিরে, অনেক রমণী একত্রিত হইয়াছিল।

সকলেই শিবপূজা কবিয়া জন্মসার্থক করিতে আসিয়াছিল, নারীগণ শঙ্করের চরণে আপনাপন অভীষ্ট কামনা কবিতেছিল। পুরোহিত ভক্তের প্রদ্বার উপহার দেবপদে নিবেদন করিতেছিলেন। সোপানোপরি দাঁড়াইয়া এক অসামান্য স্নন্দরী—অটল আগ্রহে পূজা দেখিতেছিলেন।

ক্রমে পূজা শেষ হইল, সমাগত রমণীগণ শঙ্করের কাছে মনোমত বর প্রার্থনা কবিয়া একে একে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই অসামান্য স্নন্দরী তখনও দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কিগো! সকলেই চলিয়া গেল, তুমি যে গেলে না? তোমার কি পূজা হয় নাই?” পুরোহিতের কথায় রমণীর চমক ভাঙ্গিল, রমণী বস্ত্রপাশ্ত হইতে কতকগুলি বিষ্ণুপত্র বাহির করিয়া শিবের চরণে উপহার দিলেন। পুরোহিত বলিলেন,—“তোমার যদি কিছু কামনা থাকে, এই বেলা ঠাকুরকে বল। আমি এখনই মন্দিরের দ্বারবন্ধ করিয়া চলিয়া যাইব।” রমণী বলিলেন,—“আমি আর কি চাহিব প্রভো! আমি শিবের মত সন্তান চাই,—ঠাকুর কি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?”

ঠিক সেই সময় মন্দিৰাধিষ্ঠিত পাৰাণময় লিঙ্গমূৰ্ত্তি কাঁপিয়া উঠিল। পুৰোহিত সৰ্বস্বয়ে দেখিলেন,—বিগ্ৰহ চইতে এক অপূৰ্ণ জ্যোতিঃ বহিৰ্গত হইয়া সেই সাক্ষাৎ কোমলতা ও পবিত্ৰতাব জীবন্ত প্ৰতিমা বমণীৰ চাক অগ্নে যেন তাড়ৎপ্ৰবাহে বহিয়া গেল ! বমণী ভূতাবিষ্টেৰ মত ভয়চকিত ক্ৰতপদে মন্দিবেৰ সোপান অতিক্ৰম কৰিয়া এাক্ষণে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব সঙ্গিনীবা অনেক পূৰ্বেই বাটী চলিয়া গিয়াছিল। বমণী একাকিনীই বাটী চলিলেন। তখন ধূসৰাঞ্চলা সন্ধ্যা সুনন্দা, উজ্জল তাবকাৰ টীপ্ পৰিয়া ধীবে ধীবে ধবাতলে নামিতোঁছিলেন। বমণী আব বিলম্ব কৰিলেন না, সাহসে ভব কৰিয়া চলিলেন। সেই তকচ্ছায়া ঘন জনমানবশূন্য নিশ্চল অম্পষ্ট গ্ৰান্যপথে—তাঁহাকে ভবসা দিবাৰ আব কেচই ছিল না।

( ৩ )

বমণীৰ নাম—বিশিষ্টাদেবী। তাঁহাব বাটী কেবল প্ৰদেশেৰ চিদম্বৰ গ্ৰামে। বাটীতে বমণী একাকিনীই থাকিতেন, দ্বিতীয় অভিভাবক কেহই ছিল না। স্বামী আছেন, কিন্তু জ্ঞাতি বিসম্বাদে বিব্ৰত হইয়া মনেৰ চুখে তিনি বিদেশবাসী।

শঙ্কৰ বিশিষ্টাব প্ৰাৰ্থনা শুনিযাছিলেন। অল্পদিনেৰ মথোই বিশিষ্টাব গৰ্ভলক্ষণ প্ৰকাশ পাইল। স্বামী বাটীতে নাই, বিশিষ্টাকে সন্তান সম্ভাবিতা বুঝিয়া প্ৰতিবেশিনীগণ কাণাবুৰা আবন্ত কৰিল। কেহ কেহ স্পষ্টতঃই সেই উন্মুক্ত নীলম্বৰেৰ ত্ৰায় নিৰ্ম্মণ চৰিত্ৰে কলঙ্ক আৰোপণ কৰিয়া বিশিষ্টাকে যুগা কৰিতে লাগিল।

পত্নীৰ গৰ্ভসংবাদ শ্ৰবণে, ব্ৰাহ্মণ স্তম্ভমনে বাটী আসিলেন। ‘পঞ্চামৃত’ ‘দোহদ’—নিয়মকৰ্ম্ম সমস্তই হইল। প্ৰতিবেশিনীগণেৰ অলঙ্ঘ্য বিজ্ঞপ্ত ব্যঞ্জন মধ্য, মিথ্যা কলঙ্কে মৰ্ম্মব্যথািতা বিশিষ্টা, পুণ্যাহ বৈশাখের শুক্ল

শুভ্র পঞ্চমী তিথিতে এক সৰ্ব্বমূলক্ষণাক্রান্ত সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রসব কবিলেন। সন্তান পাঁচইয়া স্বামী স্ত্রীৰ আৰ আনন্দেৰ সীমা বহিল না। যথাবিধি জাতকৰ্ম্ম সম্পন্ন হইল। স্মৃতিকাগৃহেই সেই ক্ষুদ্র শিশুৰ ক্ষুদ্র মুখথানিতে কি এক শাস্তত ধ্যান ধাবণাৰ অন্তৰ্মুখী ভাব—অপাণ্ডিৰ সৌন্দৰ্য্যে সগোবৰে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন - এই শিশু হইতেই একদিন তাঁহাৰ বংশেৰ গোবৰভাতি ভবিষ্যতেৰ প্রসন্ন আকাশে—বিপুল উল্লাসে প্রদাপ্ত হইয়া উঠিবে। শঙ্কৰেৰ প্রসাদে পুত্ৰেৰ জন্ম, ব্রাহ্মণ “শঙ্কর” নামেই নবকুমাবেৰ নামকৰণ কবিলেন।

যথাসময়ে শঙ্কৰেৰ জন্মপত্ৰিকা প্রস্তুত হইল, ব্রাহ্মণ দেখিলেন—পুত্ৰেৰ পরমায়ু অষ্টমবৰ্ষ পর্য্যন্ত! বাত্যাৰিতাড়িত বেতসেৰ ত্ৰায় দম্পতীৰ হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। জ্যোতিষীগণ—গ্রহশাস্তিৰ ব্যবস্থা কৰিলেন।

মহাপুঙ্কমগণেৰ বাল্যলীলা প্রায়ই অলৌকিক ঘটনাময়ী হইয়া থাকে। শঙ্করাচাৰ্য্য অতি শৈশবেই অলোকসামান্য প্রতিভাৰ পৰিচয় দিয়াছিলেন। একবৎসৰ বয়সে তাঁহাৰ বর্ণ পরিচয় হয়, দুই বৎসৰ বয়সে মাতৃমুখে পুরাণ-প্রসঙ্গ শুনিয়া, পুৰাণ পাঠে তাঁহাৰ আগ্রহ জন্মে। তৃতীয় বৰ্ষে পদার্পণ কৰিয়া শঙ্কৰ পিতাৰ কাছে শাস্ত্রপাঠ আৰম্ভ কবেন। এই তৃতীয় বৎসৰ বয়সেৰ সময়েই শঙ্কৰেৰ পিতৃবিয়োগ হয়।

( ৪ )

পতিবিয়োগে বিশিষ্টাদেবী বড়ই বিপদে পড়িলেন। আশ্রয় তরুহীন লতিকার মত তাঁহাৰ জীবন শঙ্কটসঙ্কুল হইয়া পড়িল। প্রতিবেশীদেব সকল ছেলেৰ চেয়ে শঙ্কর মেধাবী, অনেকেৰই তাহাতে হিংসা হইল। পরশ্রীকাতর জ্ঞাতি শত্ৰুগণ স্বেযোগ বুঝিয়া বিধবার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। শঙ্করেৰ মুখ চাহিয়া অনাথা সকল উৎপীড়ন সহ কৰিতে লাগিলেন।

বিশিষ্টা জানিতেন—তিনি বমণী, সহিসুতাই রমণীর ধর্ম। রমণী জননার জাতি, জগতে তাই রমণীব কর্তব্যই সর্বাপেক্ষা গুরুতর।

এদিকে পুবাণাদি শাস্ত্র পাঠ কবির শঙ্করের জ্ঞান-পরিপাক আবশ্যিক প্রবলভাব ধারণ করিল। বালক বেদপাঠেব জন্ত বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু যজ্ঞসূত্র ধারণ না কবিলে তো বেদপাঠে অধিকার জন্মিবে না। শঙ্কব বিশিষ্টাকে মনেব কথা জানাইলেন। বিশিষ্টা শঙ্কবের উপনয়নের উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন। যেখানে যত আত্মীয় ছিল, অভাগিনী একে একে সকলেরই শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু হায়! কেহই অনাথাব কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। সকলেই বলিল,—“তুমি সমাজপতিতা, তোমার সাহায্য করিয়া কে পতিত হইবে?” সমগ্র কেরলপ্রদেশে—অসংখ্য ব্রাহ্মণেব মধ্যে কাহারও প্রাণ অনাথার দুঃখে করুণার্জ হইল না।

এই সময় শঙ্কব একদিন শৈশব সহচরগণের সঙ্গে খেলা করিতে ছিলেন। এক বিশাল প্রাস্তবে, মৃত্তিকাস্তূপের উপর শুষ্ক পত্র সঞ্চয় করিয়া বালকগণ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল। অগ্নির উত্তাপে সহসা সেই মৃত্তিকাব স্তূপ হইতে এক মহাসর্প বহির্গত হইল। দংশনের ভয়ে বালকগণ পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় শঙ্কব কিপ্রহস্তে সেই উর্দ্ধফণ বিষধরকে ধরিয়া দুবে নিক্ষেপ করিলেন। বালকগণ আবাব খেলার মাতিল।

একজন পথিক দূরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন। শঙ্কবের সাহস দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, শঙ্কবকে একটু তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন,—“বালক! এমন কাজ কখনও করিও না, সাপটা যদি কামড়াইত তখন কি করিতে?”

শঙ্কব উত্তর দিলেন,—“সাপ কামড়াইলে আমি অবশ্যই মরিতাম, কিন্তু আমার এই সঙ্গীগণ সকলেই ত পরিত্রাণ পাইত। আপনার প্রাণ দিলে যদি অপরের প্রাণরক্ষা হয় সে কাজ করা কি ভাল নয়?”



বালকের মুখে এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া পথিক অবাক হইলেন, শঙ্করের পরিচয়ও লইলেন। খেলা সাজ হইলে বালকগণ বাটী ফিরিল। পথিক শঙ্করের সঙ্গে বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্টাকে বলিলেন,—“মা ! আমি একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি তোমাব শঙ্করের কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র পরাইয়া দিব। আমি একাই হোতা, আচার্য্য ও তন্ত্রধারক হইব।” বিধবাব প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। তিনি ভক্তিতবে আগন্তুকেব পদধূলি লইলেন।

কল্যাণের ২৬৩৬ শকে, চৈত্র মাসেব শুক্ল নবমী তিথিতে শঙ্করের উপনয়ন হইল। পথিক নিজে সমাজপতিত হইয়াও শঙ্করের বেদাধ্যয়নের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

সেই সময় গোবিন্দ স্বামী নামক একজন বেদপাবগ ব্রাহ্মণ ছিলেন, শঙ্কর সেই মহাপ্রাণ গোবিন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। শঙ্করবেব একাগ্রগামী শরের মত স্রবণশক্তি দেখিয়া, গোবিন্দ বৃত্তিতে পারিলেন—এই ক্ষুদ্রবীজই অচিবে শাখাপত্র-বহুল বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হইবে।

আচার্য্যের অনুমান ব্যর্থ হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই বেদ রহস্তেব মর্ম্ম বুঝিয়া শঙ্কর ব্রহ্মধ্বত মস্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। শঙ্করের ধারণা জন্মিল—সংসারাপেক্ষা সন্ন্যাসধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহাকে সংসারবাসী নরনারীর মুক্তিপথ দেখাইয়া দিতে হইবে।

এই সময় আর একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। একদিন শঙ্কর জননীৰ সঙ্গে নন্দাদায় স্নান করিতে গেলেন, কিন্তু জলে নামিবামাত্র এক ভীষণমূর্ত্তি কুন্তীর আসিয়া শঙ্করকে আক্রমণ করিল। শঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিশিষ্টার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, তিনিও কঁাদিতে লাগিলেন। ঘাটে তখন অনেক লোক স্নান করিতেছিল, শঙ্করকে উদ্ধার করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। উন্মাদিনী বিশিষ্টা—আপনিই জলে ঝাঁপ দিলেন, কুন্তীর তখন শঙ্করকে গভীর জলে লইয়া গিয়াছিল। শঙ্কর মাতাকে বলিলেন,—“মা ! কেন বুখা চেষ্টা করিতেছ ? আজ

আমার নিশ্চয় মৃত্যু। আমার পরমায়ু ৮ বৎসর মাত্র, আজ সেই অষ্টম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে।”

বিশিষ্টা উন্মাদিনী মত চীৎকার করিয়া বলিল,—“কে আছ, আমাব শঙ্কবকে রক্ষা কর, আমাব প্রাণ লইয়া আমার শঙ্কবকে রক্ষা কর,—” কুস্তীরের মুখে বাইতে কেহই অগ্রসর হইল না। শঙ্কবকে জলমগ্ন প্রায় দেখিয়া বিশিষ্টা আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—“ভগবান্! আর কি কোনও উপায় নাই?” নদীপুলিন হইতে সহসা কে যেন বলিয়া উঠিল—“উপায় আছে। যদি তুমি শঙ্কবকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে অনুমতি দিতে পার, শঙ্কর কুস্তীরগ্রাস হইতে মুক্তি পাইবে।” বিশিষ্টা বলিলেন—“শঙ্কর “সন্ন্যাসী হউক, তবু তো সে আমার বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাই আমার সাধনা। শঙ্কর সন্ন্যাসী হউক—আমি অনুমতি দিতেছি।”

তখনই সেই তটপ্রাণিনী নন্দদার চঞ্চল বক্ষ আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটা তরঙ্গের স্রোত আসিয়া শঙ্কবকে কূলে তুলিয়া দিল। বিশিষ্টা হারানদিকে কোলে লইয়া গৃহে আসিলেন।

২৬৩৯ কল্যাণ কার্তিকের শুক্ল একাদশী তিথিতে মাতৃপদরেণু লইয়া, আচার্য্যের অনুমতিক্রমে শঙ্কর কাশীযাত্রা করিলেন। বিশিষ্টা বারণ করিলেন না—কেবল মর্শ্ব শোণিতের মত হই বিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু অভাগিনী মাতৃহৃদয়ের নিদারুণ বেদনা জানাইল। পুণ্যভূমি জন্মভূমির শান্তি-শীতল ক্রোড় হইতে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মধ্যে আপনার আসন পাতিয়া লইবার জ্ঞাত—শঙ্কর যে অবসরের অবেষণ করিতেছিলেন, এতদিনে তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইল। বালক শঙ্কর একাকী—সেই বৌদ্ধ-প্রাবৃত ভারত-বর্ষে, দেশব্যাপী বহুমূল্য কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, আপনার কর্ম্মক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

বিশেষের লীলাভূমি বারানসী ধামে উপস্থিত হইয়া শঙ্কর প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণিকা ঘাটে স্নান করিলেন, স্নান করিয়া বিশেষের ও অন্নপূর্ণার

মন্দিবাভিমুখে চলিলেন। এই সময় এক বীভৎসমূর্তি ঘৃণিত চণ্ডাল তাঁহার পথাবধ কবিল। চণ্ডালের সঙ্গে চাবিটি কুকুব, পাছে চণ্ডাল ও কুকুবস্পর্শে অশুচি হইতে হয়, এই ভয়ে শঙ্কব চণ্ডালকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু চণ্ডাল পথ ছাড়িল না। নীচ ব্যক্তির স্পর্শা দেখিয়া শঙ্কব ক্রুদ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসীসেই বিশাল চক্ষুর্দ্বয় মব্যাহু মার্ভগেব মত দীপ্ত পভায় জলিয়া উঠিল। তখন চণ্ডাল আচাৰ্য্যকে বলিল,—“তুমি না তত্ত্বজ্ঞানী? তুমি আমার অপবিত্র ভানিতেছ; ব্রহ্মবস্ত্রব আবাব ভেদ-জ্ঞান কি?” একি। নীচ চণ্ডালের মুখে বেদনির্গীত তত্ত্বকথা। ষডদর্শনের বিপুল আয়তনের মধ্যে শঙ্কব যে উপদেশ পান নাই, একটীমাত্র মুগ্ধের কথায় এক মূৰ্খ সেই মহা সমস্তাব পূরণ কবিয়া দিল। শঙ্কব আব থাকিতে পাবিলেন না, ভাবমুগ্ধহৃদয়ে—আপনার সমস্ত বিজ্ঞাভিমান, জ্ঞানগবিমা, ধর্ম্মাহঙ্কাব বিসর্জ্ঞন দিয়া, সেই চণ্ডালবেশী লোকপাবনী মূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন। শঙ্কবেব ভেদজ্ঞান ঘুচিয়া গেল। চণ্ডাল শিবমূর্ত্তি ধাবণ কবিয়া শঙ্কবকে আলিঙ্গন কবিলেন। চণ্ডাল-সহচর কুকুর চতুষ্টিও চতুর্বেদে পবিণত হইল। ভগবান্ শঙ্কবেব উপদেশে, আচাৰ্য্য শঙ্কব—অদ্বৈত মত প্রচাবে উদ্বোধিত হইলেন।

শঙ্কব দেখিলেন, কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্মেব প্রবল প্রতাপে হিন্দুধর্ম্ম বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুব “কর্ম্মফল-বাদ” “অদৃষ্টবাদ” ও “জন্মান্তব-বাদ” আত্মনাৎ কবিয়াছিল, কিন্তু হিন্দুব “ক্রিয়াকাণ্ড” “বেদ” ও “পবমাত্ম তত্ত্ব” উপেক্ষায় পবিত্যাগ কবিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মেব অবস্থা দেখিয়া শঙ্কব এ বহুস্ত বুঝিয়া লইলেন। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন,— তিনি অনান্যাসেই বুঝিলেন—বৌদ্ধধর্ম্মেব প্রধান গুণ, উহা সহজবোধ্য, হিন্দুধর্ম্মেব মত জটিল ও আপাততঃ বৈষম্য সমর্থক নহে। এই গুণেই ভাবত বৌদ্ধধর্ম্মেব চিত্তাকর্ষী ওদার্য্য ভুলিয়াছিল। শঙ্কব দেখিলেন,— অর্থপবতার কপট ব্যাখ্যায শাস্ত্রমর্ম্ম আচ্ছন্ন, কেহই তাহা বঝিও

পারিতেছে না। বৌদ্ধ শ্রমণগণ যে সকল দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল, ক্রিয়াকাণ্ড-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ সহজে তাহা খণ্ডন করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মণেব অনন্ত বহুপ্রস্থ প্রতিভা তখন একেবারেই অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। ভাবত হইতে তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্যা ও পরমার্থ চিন্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবুও হিন্দুধর্মের এত অধিক প্রভাব যে কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর ধবিয়া বিবাদসংঘর্ষ সহ্য করিয়া, বৌদ্ধধর্মের তুমুল তবঙ্গ সংঘাতেও তাহা ভারত হইতে একেবারেই তিরোহিত হয় নাই।

যেখানে বৌদ্ধধর্মের গগনস্পর্শী বিজয় নিশান সগর্বে উড়িতেছিল, শঙ্কর সেই পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। সে কর্তব্য—“উচ্ছেদসাধন, বৈদিক ধর্ম পুনঃ স্থাপন”—কিন্তু ইতাব পূর্বে আরও একটা গুরুতর কাজ তাঁহাকে করিতে হইবে, দার্শনিক মৌমাংসক, নৈয়ানিক, তার্কিক, নাস্তিক সকলকেই স্বমতে আনিতে হইবে। শঙ্করের এই মহাব্রতে কাবেরী তটস্থিত চোল দেশবাসী সনন্দন হস্তামলক, প্রতর্দন প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহায় ও সহচর হইলেন। তখন বারাণসী প্রতিধ্বনিত করিয়া—“তত্ত্বমসি” মহামন্ত্র উচ্চারিত হইল। শঙ্করের অদ্ভূত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া, অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

এই সময় শঙ্করের জননী মৃত্যু হয়। সংসারের যেটুকু শেষবন্ধন ছিল, সেটুকু ছিন্ন হইল। শঙ্কর সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া, ধর্মপ্রচারে আত্মসমর্পণ করিলেন। শঙ্করের শিষ্যগণ গুরুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র, কাণ্যকূজ—প্রয়াগ বারাণসী সমস্ত প্রদেশে অর্ঘ্যেত মত প্রচার করিতে লাগিলেন। লোক “সর্বজ্ঞ” বলিয়া শঙ্করের পূজা করিতে লাগিল। অনেক রাজাও শঙ্করকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন।

অনেকেই বলেন—শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হইয়াও শৈব মতের প্রচাবক ছিলেন। কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্র বুঝিয়া, বাধা হইয়াও তাঁহাকে এ পথ অবলম্বন কবিতে হইয়াছিল। সমগ্র ভাবতে তখন ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, শঙ্কর সেই “ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তিকে” যোগমগ্ন শিবমূর্তিতে পরিণত কবিলেন। বৌদ্ধবিহারে শিবমন্দির স্থাপিত হইল। শঙ্কর বুদ্ধপত্নী ভিক্ষুণী গোপাব সন্ন্যাসিনী মূর্তি—গৌরীকণ্ঠে শিবমূর্তির বামভাগে বসাইয়া দিলেন, লোকে বুদ্ধ ও গোপাকে ভুলিয়া হবপার্বত্যেব জ্যোতিষ্মদী অতিমাকে প্রাণেব ভক্তি দিয়া শ্রদ্ধা কবিতে শিখিল।

এই সময় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কুমাবিল ভট্ট নামক এক মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি অসাধারণ পণ্ডিত, অধ্যয়্যচাৰ ও অনাচাৰ হইতে দেশকে বক্ষা কবিবাব জন্য বৌদ্ধধর্মের নিকটে ইনিই প্রথমে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। শঙ্করের নিকটে, এই মীমাংসক কুমাবিল ভট্ট তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী বাজা প্রজা সকলেই অদ্বৈতবাদী হইয়া পড়িলেন। নৃপতিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় শঙ্কর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন।

মাহেয্যতি পুবে মণ্ডন মিশ্র নামক আব এক মহাপণ্ডিত ছিলেন। মণ্ডন মিশ্র কৰ্ম্মকাণ্ডের প্রবর্তক, তাঁহাব বিশ্বাস ছিল—কলিতে সন্ন্যাস গ্রহণ মহাপাপ, কৰ্ম্ম হইতেই জীবের মুক্তি হয়। শঙ্কর দেখিলেন মণ্ডন মিশ্রকে বশীভূত কবিতে না পাবিলে “অদ্বৈত মত প্রচাব” সম্পূর্ণ হয় না। মণ্ডন মিশ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ঘৃণা কবিতেন। মণ্ডন মিশ্র সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ না কবিলে জ্ঞানকাণ্ড প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতে পাবিবে না।

শঙ্কর সশিষ্য মণ্ডনমিশ্রের উদ্দেশে মাহেয্যতী পুৰ যাত্রা কবিলেন।

সেদিন মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ। ঘটনাচক্রে শঙ্করও মাহেয্যতিপুৰে উপস্থিত হইলেন। মিশ্র বড় পাকা লোক, পাছে পিতৃকর্মেব কোথাও বিঘ্ন সংঘটন হয়, সেই ভয়ে তিনি বাটীৰ দ্বাবন্ধ কবিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে

ছিলেন। শঙ্কৰও ছাডিবাৰ পাত্ৰ নহেন, মিশ্ৰেৰ মনোভাব বুঝিয়া শঙ্কৰ প্ৰাচীৰ উল্লঙ্ঘন কৰিয়া মিশ্ৰ ঠাকুৰেৰ প্ৰাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। শ্ৰীদ্ধ-ক্ষেত্ৰে সন্ন্যাসীৰ আবিৰ্ভাব অমঙ্গলসূচক, স্মৃতবাং এই মুণ্ডিতশিৰঃ সন্ন্যাসীৰ অতৰ্কিত আগমনে উগ্ৰস্বভাব মিশ্ৰ বিস্মিত ও ক্ৰুদ্ধ হইলেন। উভয়ে বীৰিমত বাগ্‌যুদ্ধ আবন্ত হইল। মিশ্ৰ বলিলেন,—“কন্মকাণ্ডই মুক্তিব পথ”, শঙ্কৰ বলিলেন,—“জ্ঞানকাণ্ডই উৎকৃষ্ট”। এই তৰ্কযুদ্ধে শঙ্কৰ মিশ্ৰেৰ বিজয়ী পত্নী উভয় ভাবতী দেবীকে মধ্যস্থ মানিলেন। স্থিৰ হইল যদি মিশ্ৰ পবাজিত হ’ন—তাঁহাকে সন্ন্যাস ছাডিয়া আবাব সংসাৰে প্ৰবেশ কৰিতে হইবে।

বিচাৰে মিশ্ৰেৰ পবাজয় হইল। অনুতপ্ত মিশ্ৰ জ্ঞানকাণ্ডেৰ প্ৰশংসা কৰিয়া শঙ্কৰকে গুৰু বলিয়া স্বীকাৰ কৰিলেন। শঙ্কৰেৰ জয়ধ্বনিতে মাৰ্হেযতী পুৰ প্ৰতিধ্বনিত হইল। মিশ্ৰ দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসী সাজিলেন। স্বামী গৃহ পবিত্যাগ কৰিতেছেন, মিশ্ৰেৰ সাধ্বী পত্নীৰ তাহা সহ্য হইল না। তিনি শঙ্কৰকে বলিলেন,—“স্ত্ৰী স্বামীৰ অৰ্দ্ধাঙ্গিনী, আমাৰ স্বামী পবাজিত হইলেও তাঁহাৰ অৰ্দ্ধাঙ্গ এখনও অপবাজিত; আমাৰ বিচাৰে পবাজিত কৰিতে না পাবিলে, তুমি আমাৰ স্বামীকে লইয়া বাইতে পাবিবে না।” শঙ্কৰও সত্যৰ কথা ঠেলিতে পাবিলেন না।

দিগ্বিজয় শঙ্কৰ আজ বড় বিপন্ন, সন্ন্যাসী হইয়া আজ তাঁহাকে রমণীৰ সঙ্গে বিচাৰ কৰিতে হইবে! অন্য কেহ হইলে, সন্ন্যাসীৰ “স্ত্ৰীলোকের সহিত কথোপকথন নিষিদ্ধ” বলিয়া মিশ্ৰপত্নীকে নিবস্ত কৰিতে পাবিতেন। শঙ্কৰ তাহা পাবিলেন না। যিনি বিশ্বপূজ্য ব্ৰাহ্মণ হইয়া চণ্ডালেৰ চৰণে আকুলতাৰ অশ্রু ঢালিয়া আপনাৰ ভেদবুদ্ধি ও আমিহেৰ অভিমান বিসৰ্জন দিয়াছিলেন, সেই মহাপুৰুষেৰ অসঙ্গীৰ্ষ হৃদয়ে কি স্ত্ৰী-পুৰুষেৰ ভেদজ্ঞান স্থান পায়? শঙ্কৰ বিচাৰে প্ৰবৃত্ত হইলেন। এই-ধৰণেই শঙ্কৰেৰ শঙ্কৰত্ব, মহতেন্ন মহত্ব।

মিশ্র-পত্নী প্রশ্ন করিলেন,—“কামকলা কয় প্রকাব ? তাহাদেব আধাবই বা কি ?” সন্ন্যাসীব প্রতি সংসারিণীব কি অপূৰ্ব প্রশ্ন ! এইরূপ পূৰ্ব-পথের সৃষ্টি না করিলে কি বিশ্বজয়ী শঙ্করকে পরাজিত করা যায় ? শঙ্কব ব্যাকুল হইয়া এক মাসের সময় চাহিলেন, বলিলেন,—“গৃহধৰ্ম্মে আমি অনধিকারী,—দেবি ! আমি রতি শাস্ত্রের রহস্ত জানিয়া আসিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।”

শঙ্কর—যোগবলে অমরক নৃপতির মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন ; শিষ্য-গণ পৰ্ব্বতশুভায় তাঁহার পরিত্যক্ত দেশ সমস্তে রক্ষা করিতে লাগিল। রাজদেহ ধারণ করিয়া, শঙ্কর রতি-রহস্ত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ-সংসারের বিলাস-সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াও—শঙ্কর কেমন উদাসীন ! সুনবীব স্নকোমল স্পর্শে—সে শরীরে তো শিহরণ উপস্থিত হয় না। তরুণীর ঈষচ্চঞ্চল কটাক্ষে শঙ্কব তো ব্যথিত হয় না ! রাজমহিষীগণ রাজার এইরূপ ব্যবহারে হঃখিত, পুৰবাসিগণও বিরক্ত।

এদিকে নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও গুরুদেব প্রত্যাৰ্ত্তন করিলেন না। শঙ্কবের শিষ্যগণ উদ্বিগ্ন হইলেন। নিভূতে রক্ষিত শঙ্করের শবদেহও বিকৃত হইয়া আসিতেছিল। শিষ্যগণ পরামর্শ করিয়া অমরক রাজার ভবনে উপস্থিত হইল, দেখিল,—সেই নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী রমণীকূলে পরিবৃত্ত হইয়া মদনোদ্দীপক সঙ্গীত শুনিতেছেন। শিষ্যগণ দূর হইতেই তখন সেই রাজরূপী আচার্য্যকে মোহ-মুদগারের শ্লোক শুনাইল। সে স্বর শঙ্কর চিনিতে পারিলেন। ইঙ্গিতে শিষ্যগণকে বুঝাইলেন, “চল—আমিও যাইতেছি।” সহসা রাজদেহ রমণীগণের অলঙ্কার-গ-রঞ্জিত নুপুর শিক্তি চরণতলে লুটাইয়া পড়িল। রাজভবনে আবার হাহাকার উঠিল।

উভয় ভারতী দেবী প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া স্বামীকে আর গৃহে রাখিতে পারিলেন না।

শঙ্কবেব অমানুষিক শক্তি দেখিয়া অল্পদিনেব মধ্যেই তাঁহাব সম্বন্ধে কত অদ্ভুত জনশ্রুতি নানা দেশেব লোকের মুখে পল্লবিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা জননীব স্নানেব সুবিধাব জন্ত তিনি নন্দ্যদা নদীকে আহ্বান কবিয়া-  
ছিলেন। তাঁহাব বেদান্ত ভাষ্যেব বাখ্যা শুনিয়া সান্নাৎ নাবায়ণেব অবতাব ব্যাসদেবও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ভাবতেব সৰ্বদেশেব সৰ্ব শ্রেণীর পণ্ডিতগণকে বিচারে পবাস্থ কবিয়া তিনি কান্দীবেব “সাবদা-  
পীঠে” উপবেশন কবিয়াছিলেন। এমন উচ্চ সম্মান লাভ কবিয়াও শঙ্কব গৰ্বিত হ'ন নাই। সাবদাপীঠে বসিয়া শঙ্কব বলিয়াছিলেন—“এত দিনে মায়েব কোলে স্থান পাইলাম।”

শঙ্কবেব ধৰ্ম্মমত বেদান্তেব উপব স্থাপিত। এখনও বদবিকাশ্রমে, পুক-  
ঘোড়মে, দ্বাবকায়—শঙ্কব-প্রতিষ্ঠিত চাবিটী মঠ বর্তমান আছে। অনেকে বলেন,—শঙ্কব নূতন কিছু বলেন নাই। এ কথা সত্য হইলেও, অবশ্য বলিতে পাবা যায় যে, পূৰ্ব্বাচার্য্যগণ তাঁহাদেব কার্য্যেব যেটুকু অসম্পূর্ণ বাখিয়া গিয়াছিলেন, ভগবান্ শঙ্কবাচার্য্য তাহা সম্পূর্ণ কবিয়া গিয়াছেন।

শঙ্কব যেখানে যাইতেন, লোকে তাঁহাকে সমাদবেব সহিত অভ্যর্থনা কবিত। শঙ্কব বাজহস্তে ভিক্ষা গ্রহণ কবিতেন না, কৃষকেব গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ কবিতেন। শঙ্কবেব আবির্ভাব কালে ভাবতে অসংখ্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাশ্রম ছিল, সেই সকল আশ্রমে কেবল ব্যভিচাব ও অনাচাবেব অনুষ্ঠান হইত। আশ্রমেব অধিকাবীগণ কাপালিক, বাজীকবণ, শুস্তন, বশীকবণ, বসায়ন, মাবণ, উচ্চাটন, সন্মোহন এই সকল তান্ত্রিক বিজ্ঞার সাহায্যে তাহাবা লোকচক্ষুেব সম্মুখে শত শত ইন্দ্রজাল বচনা কবিত। উষ্ম সুবাব সহিত সন্ত নিহত শিশুেব উত্তপ্ত শোণিত মিশ্রিত কবিয়া, তাহা পান কবিয়া কাপালিকগণ কুলকামিনীেব সৰ্ব্বনাশ সাধনেব জন্ত শরীবে পাথর বল সঞ্চয় কবিত। শঙ্কবই এই বিরাট অত্যাচার দমন কবিয়া-  
ছিলেন।



শঙ্করকে কেহ নিজগৃহে আহ্বানের নিমন্ত্রণ করিলে তিনি বলিতেন,—  
আমায় যদি খাওয়াইতে চাও, আপনারা খাও, আর অভুক্তকে ডাকিয়া  
খাওয়াও, তাহা হইলে আমার পরিতোষরূপে আহ্বার করা হইবে।”

শঙ্কর ভিক্ষাযাত্রায় বহির্গত হইলে শিষ্যাগণ বলিয়াছিল,—“আপনি  
“যাইবেন না, আমরাই আপনাব আহ্বাৰ্য্য আনিতেছি।” শঙ্কর হাসিয়া  
উত্তর দিতেন—“আমাব চলংশক্তি আছে, আমি অনায়াসেই দ্বারে দ্বারে  
ঘুরিতে পাবিব। কিন্তু যাহারা গতিশক্তি-হীন, তাহারা যেন তোমাদের  
প্রসাদে বঞ্চিত না হয়।”

শঙ্করকে কেহ আতিথ্য গ্রহণেব অনুরোধ কবিলে, তিনি বলিতেন,—  
“আমায় অত যত্ন কব কেন? আমি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল প্রান্তরে পাক  
করিয়া ভোজন করি, রাত্রে বৃক্ষমূলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই। যদি কোনও  
বিপন্ন তোমাদের দ্বারস্থ হয়, তাহাকে তোমরা আস্তা দিও।”

পাঠক! দেখুন—ধর্ম তত্ত্বের—নীতি তত্ত্বের যাহা কিছু উচ্চ প্রশস্ত,  
ও জ্ঞান গর্ভ—তাহাই আমরা শঙ্করের মুখে শুনিতে পাই।

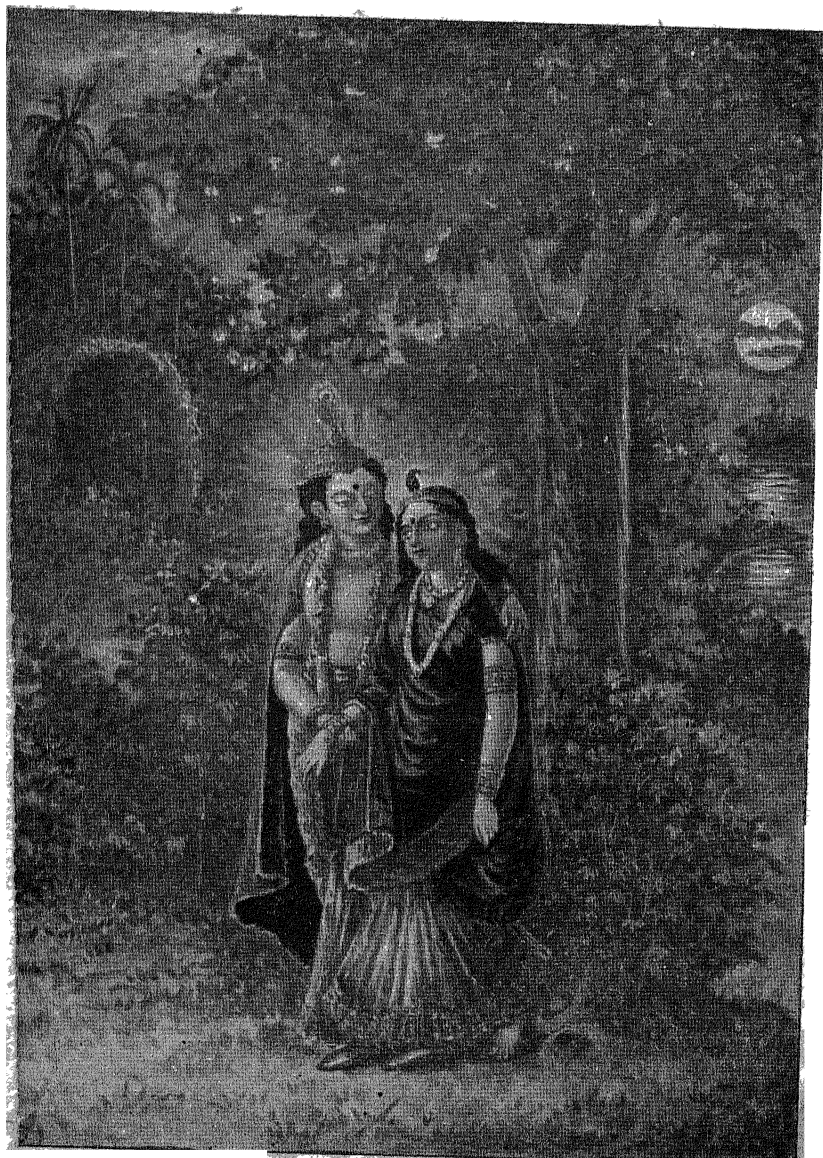
হায়! আজ আর সে শঙ্কর জীবিত নাই, বহুদিন হইল কেদারনাথ  
তীর্থে—তনুত্যাগ করিয়া তিনি লোক চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন। কিন্তু  
তাঁহার গ্রন্থাবলী এখনো আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে—কি  
দৃঢ়তায়, কি সাহসে, কি পাণ্ডিত্যে, কি সর্বত্যাগী পণে, আৰ্য্য শক্তির নব  
অভ্যুত্থানের দিনে—শঙ্করাচার্য্য, নায়ক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত মহাপুরুষ।

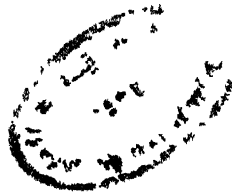
শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু। শঙ্করের জন্ম সময়ে—রবি শেষে,  
মঙ্গল মকরে, এবং শনি তুলারশিতে ছিলেন।

### শঙ্করের ধর্ম মত

- ১। শঙ্কর ব্রহ্মশক্তি স্বীকার করিতেন, শক্তিকে উড়াইয়া দেন নাই।
- ২। শঙ্কর পরিণাম বাদ ও বিবর্তবাদ উভয়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন।







## জয়দেব গোস্বামী

( ১ )

বঙ্গদেশে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম প্রবর্তক—পণ্ডিতবব জয়দেব গোস্বামী। সমাজ ও সময় লইয়া কবি, জয়দেব বাঙ্গালীর প্রথম কবি। বঙ্গের স্বাধীনতার সায়াহ্নে, অধঃপতিত বাঙ্গালীর অলস জীবনে, কৃষ্ণ প্রেমের পূত ধাবা ঢালিয়া—বিলাসিনীর অভিসার গাহিতে জয়দেবের জন্ম। জয়দেবের কাব্য—সংস্কৃত আশ্রয় নিবাস নিষ্কাশ। কিন্তু এ সকল কথা বলিবার পূর্বে, বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনাইতে চাই। নহিলে, আপনাবা জয়দেবকে ঠিক চিনিতে পারিবেন না।

বেদেব ‘পবমাত্মা’—বৌদ্ধযুগে ‘আদিবুদ্ধ’ হইয়া পড়েন। বৌদ্ধগণ বেদেব “প্রজাপতি সৃষ্টি” উপাখ্যান গুলিও ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন, তাহা হইতেই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংজ্ঞা, এই ত্রিমূর্তি বৌদ্ধগণ কর্তৃক রূপান্তরিত হয়।

তাহার পর শঙ্কবাচার্য্যের অবির্ভাব কাল। তিনি বৌদ্ধমত খণ্ডন করিলে, ভাবতে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। লোকেব আবার পুণাতন ধর্মে অনুবাগ জন্মিল। এই “পুণাতন” কথাব অপভ্রংশ “পুণাণ” হইতেই ‘পুণাণ’ নামেব উৎপত্তি। ভারতে শৌবাণিক যুগ আরম্ভ হইল। আর্ধ্যগণ ‘পুণাণ’ শাস্ত্র রচনা কবিত্তে লাগিলেন। “বুদ্ধ” “ধর্ম” ও “সংজ্ঞা” সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা এবং লয় কর্তা সাজিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনে এক, একে তিন, এই ত্রিমূর্ত্তি

আধার “আদিবুদ্ধ” বেদেব পরমাত্মার সঙ্গে, সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকের পাকা হাতে বাসায়নিক সংযোগে মিশ্রিত হইয়া এক হইলেন ! বেদের সেই পুরাতন “বিষ্ণু” নামেই তাঁহার নামকরণ হইল। কিন্তু বৈদিক বিষ্ণু আর পৌরাণিক বিষ্ণু—নামে এক হইলেও, উভয়েব বিস্তর প্রভেদ রহিয়া গেল। বৈদিক বিষ্ণু “নিরাকার” ছাডিয়া, পূরণে সাকার হইলেন। সাধুদের পবিত্রাণ, চক্ৰতি দমন ও ধর্ম সংস্থাপণের জন্ত, মানবের মঙ্গল মুহুর্তে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি মানব কে ‘পিতা’ এবং মানবীকে ‘মাতা’ বলিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। মানব ধর্মী বিষ্ণুর প্রণয়িনী বা সঙ্গিনীও জুটিয়া গেল !

বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে—“বুদ্ধদেব এক জন্মেই “বুদ্ধ হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে মংস্ত্র, কুর্মা, বরাহ প্রভৃতি অশেষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। শেষ জন্মে—সিদ্ধার্থ গৌতম রূপে তিনি “নির্কারণের পথ দেখিতে পাইয়া-ছিলেন।” বুদ্ধের এই জাতক উপাখ্যান অবলম্বনে, হিন্দুরা বিষ্ণুকেও মংস্ত্র কুর্মাদি অবতারে পরিণত করিলেন। শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ ও গোপার সন্ন্যাস মূর্তিকে “হরপাক্ষতী নামে” জাহির করিয়াছিলেন। অনেকের চক্ষে সন্ন্যাসীর কঠোর শ্রীহীন মূর্তি ভাল লাগিল না। পৌরাণিকগণ—‘বুদ্ধ গোপার’ ঐশ্বর্য্যশালী সংসার-মূর্তিকে “লক্ষ্মী নারায়ণে” পরিণত করিলেন। বুদ্ধ পাছে সন্ন্যাসী হইয়া যান—এই আশঙ্কায় অসংখ্য তরুণী রূপসী, লতার ত্রায় সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, শিরীষ সুকোমল বাহুর প্রেম পুলকিত-গায় আলিঙ্গন পাশে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া, বিষ্ণুব “রাসলীলা” রচিত হইল। বুদ্ধ, গোপার সঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন ; ‘গোপা’ অর্থে ‘গোয়ালার মেয়ে বুঝায়—পুরাণে গোপা ব্রজ গোপিনী হইলেন ;—গোপা ও বুদ্ধের বিহার শ্রীকৃষ্ণের ‘গোপিনী-বিহার’ বলিয়া প্রচলিত হইল।

এই সময় এক রসজ্ঞ পণ্ডিত “ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ” লিখিয়া নারায়ণের

প্রাধান শক্তি লক্ষ্যকে বাধারূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণেব বাধে বসাইয়া দিলেন । এইরূপে বঙ্গে প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপিত হইল ।

শঙ্করের সময়েও অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রচলিতভাবে থাকিয়া, ব্যভিচারেব কলুষ-শ্রোতে ‘গা’ ভাসাইয়া দিয়াছিল । সুযোগ বুঝিয়া, তাহাবা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন কবিল । শঙ্করের ‘অদ্বৈতবাদ’ ‘কামিনী কাঞ্চন-বিরোধী কঠোব সন্ন্যাস’—অনেকেবই ভাল লাগে নাই । বৈষ্ণবগণ যখন ‘দ্বৈতবাদ’ প্রচাৰ কবিলেন, তখন অনেকেই উদার ধর্মমত বলিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ কবিল । যে সকল অন্ত্যজ জাতি বৈদিক বিজাতির শ্রেণীতে স্থান পায় নাই । বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যাহা-দিগকে আন্তরিক ঘৃণা কবিতেন—এই মর্শাস্তিক উপেক্ষায় মর্শাহত হইয়া, বৌদ্ধ শ্রমণগণের উদার আহ্বানে যাহারা একদিন বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাবা সকলেই দলে ভিড়িয়া ‘বৈষ্ণব’ হইয়া গেল । বৌদ্ধ-ধর্ম নীতিব কঠোব শাসনে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ প্রকাশ্যে একত্র থাকিতে পাবিত না । থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত,— তাহাদেব লাঞ্ছনাব সীমা থাকিত না । বৈষ্ণব ধর্ম—বাধাবন্ধন বিহীন,— বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর একত্র বাস—ধর্মনীতির প্রতিকূল নহে । রমণীর প্রলোভনের একটা বৈজ্ঞানিক আকর্ষণ আছে, রমণীকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর কর্ম্মঠ উপাদান সংসারের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । কর্ম্মক্ষেত্রে নারী যেমন পুরুষের সহচরী, ধর্মক্ষেত্রেও তেমন সহধর্মিণী । যে ধর্মে প্রেম-প্রতিমা নারীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিলেও ধর্ম্মাচরণের ব্যাঘাত হয় না, সে ধর্ম্মের প্রতি কাহার না সহানুভূতি জন্মে ? সাম্য মতপূত উদার বৈষ্ণব ধর্মে নরনারী সম্মিলনের পরিণামের নাম “সহজ ভজন”, এমন ‘সহজ ভজন’ পদ্মা—রক্তমাংসের মেহে বিশেষ কার্য্যকরী । জাই, লোকনিন্দার হাত এড়াইবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ দলে দলে বৈষ্ণব হইতে লাগিল । বুদ্ধ ভো একটামাত্র মুক্তি—“নির্বাণ” নিজে

পারিতেন, বিষ্ণু—সাক্ষ্য, সালোক্য, সাযুজ্য, সান্নিধ্য—এই চারি প্রকাব মুক্তি দিতে পারেন ! বিষ্ণুর চেয়ে বড় কে? বুদ্ধদেবের উপদেশ—“অহিংসাই শ্রেষ্ঠধর্ম”, বৈষ্ণব ধর্মের মূলমন্ত্র—“জীবৈ দয়া”। বৌদ্ধগণের উপজীবিকা—ভিক্ষা, বৈষ্ণবগণেরও তাই। বৌদ্ধধর্মে, বৈষ্ণবধর্মে—জাতিভেদ নাই। দুইটাই শান্তিব ধর্ম ;—বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের আদর বাড়িল।

ছাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি আরো <sup>৬</sup>সুদৃঢ় হইল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। দক্ষিণাপথের তুল্যদেশে মধবা-চার্য্য একটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাঁহার ধর্মমত—বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে বীরভূম জেলায় জয়দেব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করিলেন।

“ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের” রাধাকৃষ্ণ চরিত্র লইয়া জয়দেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচাব করেন। আজিও যে বৈষ্ণব ধর্ম ভাবতের সকল প্রদেশে আদরের সহিত গৃহীত হইয়া আসিতেছে—পূজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামীই তাহার প্রচারক।

অজয় নদের তীরে কেন্দুবিষ গ্রামে (কেঁহলি) পবিত্র ব্রাহ্মণ কূলে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম—বামাদেবী। জয়দেবের পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। শৈশবেই জয়দেব সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন; “ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ” পাঠ করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্মে আসক্ত হন। রাধাকৃষ্ণের পূজা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। সংসারের কোন বিষয়েই তাঁহার অনুরাগ ছিল না। পুত্রের ওদাসীত্ব দেখিয়া বামাদেবী জয়দেবের বিবাহ দিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। জয়দেবের রূপ ছিল, বিছা ছিল, পাত্রীর অভাব হইল না। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পরমাসুন্দরী বালিকা কন্যাটিকে সঙ্গে করিয়া জয়দেবের বাটীতে আসিলেন। জয়দেব দেখিলেন—বালিকা রূপবতী বটে, দারিদ্রজনিত প্রচ্ছন্ন বিষাদের ভাব—তাহার

সমুজ্জল সৌন্দর্যে কি এক রকম মিশ্র কোমলতার সঞ্চার করিয়াছিল ; কৈশোরের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়াও বালিকা উষ্ণ-পবন-স্পৃষ্টা মাধবী লতার ছায় শ্লথ শোভাময়ী ! জয়দেবের প্রাণ সহানুভূতিতে গলিয়া গেল । কিন্তু তিনি শরণাগত ব্রাহ্মণের অমুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না । তিনি ব্রাহ্মণকে স্পষ্টই বলিলেন—বিবাহের পুণ্য বন্ধন তাঁহার মত উদাসীনের জন্ত নহে । যে সংসারী—কামিনী তাহারই সঙ্গিনী, জয়দেব সংসারী হইতে অনিচ্ছুক । ব্রাহ্মণ অগ্র কাহাকেও কথ্য সমর্পণ করুন ।

ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাখ্যাতা অশ্রুযুথী আত্মজাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন, তাঁহার বড় আশায় ছাই পড়িল ।

জয়দেবও ভাবিলেন, সংসারে থাকিলে হয় তো তাঁহাকে কামিনী কাঞ্চনের মায়ায় পড়িতে হইবে । সকলের অজ্ঞাতসারে, কহা কমণ্ডলু ধারণ করিয়া জয়দেব গৃহত্যাগ করিলেন ।

( ২ )

প্রভুতত্ত্ববিদগণের মতে—জগন্নাথ দেব বুদ্ধেরই বিগ্রহ, হিন্দুরা তাঁহার দারুমূর্ত্তিকে “নারায়ণ” বলিয়া আপনার করিয়া লইয়াছিল । জগন্নাথ বড় জাগ্রত দেবতা, তদীয় বিগ্রহ দর্শন করিলে জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না । লোকে ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়াও জগন্নাথ দর্শনে ছুটিত, হয়তো দস্যুর নির্দম হস্তেই সাধকের মহামুক্তিলাভ ঘটিত । জয়দেব স্বদেশে থাকিয়াই জগন্নাথের মাহাত্ম্য গুনিয়াছিলেন । বহুদিন ধরিয়া, বহুদেশ পর্যটন করিয়া, কঙ্কচ্যুত ধূমকেতুর মত জয়দেব পুরুষোত্তমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে অকপট ভক্ত জানিয়া পাণ্ডারা শ্রীমন্দিরেই আশ্রয় দান করিল ।

সে’দিন কি একটা উৎসব ছিল । গভীরনাদী বারিধি-কূলে, কোমুদী প্রফুল্লা রজনীতে, পুষ্প-স্বরভি সুবাসিত আলোকোজ্জল নাট্যমন্দিরে,



লোকাবেশে মধ্যে বসিয়া এক সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরী তবঙ্গী গান গাহিতেছিল। সুন্দরী—দেবদাসী। যে সময়ে কথা বলিতেছি, সে সময়ে প্রভুব সেবাব জগু শ্রীমন্দিবে অনেক গুলি যুবতী থাকিত। লোকে তাহাদিগকে দেবদাসী বলিত। দেবদাসীবা চিবকুমারী থাকিত, তাহাদেব বিবাহ হইত না। দেব-প্রসাদ-লব্ধ বৃত্তি হইতে তাহাদেব ভবণপোষণেব ব্যয় নির্বাহ হইত।

দেবদাসী বড় মধুব গাহিতেছিল। বুঝি তাহাব কণ্ঠস্বৰে—বৃষ্টি-ফোভ বহিত জলধবেব মত গম্ভীৰ দাক্ষয় ভগবানেব ধবনীতেও শোণিতেব স্পন্দনে তড়িতবজ্ৰেব অনুকম্পন অনুমিত হইতেছিল। গায়িকা অপূৰ্ণ সুন্দরী! তাহাকে দেখিয়া দৰ্শকগণেব মনে হইতেছিল—বিশ্ব প্রকৃতিব সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন সেই তবঙ্গীৰ সুগঠিত অঙ্গে একসঙ্গে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আব সেই অলঙ্কৃত বাগবজ্জিত চবণযুগলেব স্পর্শমুখ অনুভব কবিবাব জগু, হান্তময়ী ধবিত্রী দেবী যেন সাগ্রহে বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। যুবতীৰ পুণ্য তনুৰ উচ্ছ্বসিত লাবণ্য, যেন সেই যামিনীবল্লভ চন্দ্রেব স্নিগ্ধোজ্জল গুল্ল কিবণেব মত শ্রোতৃবৃন্দেব হৃদয়-মল প্লাবিত কবিয়া, নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সুন্দরীৰ বেশভূষাব কোন পাৰিপাটা ছিল না। পৰিধানে বাসন্তী বর্ণেব একখানি শাড়ী, কবরীতে একগাছি ফুলেৰ মালা জড়ানো, কব প্রকোষ্ঠে, কণ্ঠে, মৃণালতন্তু জড়িত কুসুম স্তবক। এই ফুলেৰ সাজে, পুষ্পিতা ব্রততীৰ মত তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শ্রোতৃবর্গ সকলেই গায়িকাৰ ‘তাবিফ’ কবিতেছিলেন। কেহ তাহাব পবিধেয় শাড়ীখানিব, কেহ সেই চূর্ণকুস্তল শোভী শৈবাল বেষ্টিত প্রফুল্ল পদ্মেব মত সুন্দর মুখখানিব, কেহবা সেই মৃণালনির্মিত সুগোল হাত হ’খানিব প্রশংসা কবিতেছিলেন! সুবেব শ্রোতা বড় বেশী ছিল না।

মর্শ্ববখচিত দেব-মন্দিবেব সোপানে বসিয়া, বসিক জয়দেব—সেই মচ্ছন্দ পিকেব সানন্দ ঝঙ্কাৰ শুনিতেছিলেন; আব এক একবাব সেই

আনন্দেব জনশ্রী গায়িকাব স্বৈদসিক্ত অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি, সম্পূর্ণ হোচনে সকলের চক্ষুকে প্রভাষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। গোস্বামীর হৃদয় কঠোর বৈরাগ্যে মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার এককোণে ‘ওয়েসীসের’ মত একটু প্রেমের ছায়া লুক্কায়িত ছিল। দূর-শ্রুতি সিদ্ধ-কল্লোলের শ্রায়, প্রেমবস্ত্রের সাড়া পাইয়া আজ সেই আসক্তি-হীম নীরস হৃদয়—ছক্‌ছক্‌ স্পন্দনে সহসা কাঁপিয়া উঠিল। জয়দেব আত্মহারা হইয়া, গায়িকাব বীণানিন্দিত মোহন কণ্ঠের স্ততিসূচক ধ্বন্যবাদ প্রদান করিলেন। রমণী তাহা শুনিতে পাইল। একবার মুখ তুলিয়া, পূর্ণোন্মুক্ত নয়নে স্তাবকের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিল, দেখিল—এক জ্যোতির্ময় দেহ যুবা পুরুষ, তাহার গানে তন্ময় হইয়া তাহারই পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, কিন্তু সে চাহনীতে উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের ঘৃণিত উত্তেজনা নাই। তথাপি মলয়ান্দোলিতা চন্দন-লতার শ্রায় তরুণী একবার শিরিয়া উঠিল, কিশলয় কোমল করতল বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া যুবতী সে হৃদয়াবেগ তখনি সম্বরণ করিল। যুবতী আর গান গাহিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বরে ঘেন রোদনের ঝঙ্কার আসিতেছিল। লোক মনে করিল গায়িকা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রধান পাণ্ডা তাহাকে বিশ্রামের অনুমতি দিলেন। অলসমহুরগমনা সুন্দরী, সঞ্চারিণী পল্লবিতা লতার শ্রায় আনত দেহে ধীরে ধীরে রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিল। বাইবার সময়, সোপানোপরি উপবিষ্ট জয়দেবের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, জয়দেব বুঝিলেন—সেই করুণ চাহনীতে, যুবতীর হৃদয়ের চিরসঞ্চিত অক্ষুট অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরব ভাষায় ব্যক্ত হইতেছিল।

( ৩ )

পরদিন প্রথম সূর্য্যরশ্মির অরুণ-আলোকে, জয়দেব ও গায়িকার পরিচয় হইল। গায়িকার নাম পদ্মাবতী। জয়দেব জানিতে পারিলেন—

পদ্মাবতী সেই ব্রাহ্মণেব হুহিতা ; প্রথম যৌবনে বিবাহেব আনন্দময় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া—এই উজ্জ্বল স্বর্ণযুগ্তিকে তিনি ধূলিসৃষ্টির ত্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সেই ধূসরমণিন শশি লেখা—আজ পূর্ণ শশির প্রভা ধাবণ কবিয়াছে । জয়দেবের অনুতাপ হইল—এতদিন মায়াময় মানব-জীবনটা কেবল নিরর্থক স্বপ্নেই কাটিয়া গিয়াছে ! দেবদাসী পদ্মাবতী তাঁহাব ঝঙ্কাহত প্রাণের জড়ত্বকে অপসাবিত করিয়া দিল । প্রভুর অনুকম্পায় জয়দেব আজ বিশ্বরাজ্যে মাথা ঝুঁজিবাব একটু স্থায়ী আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলেন । পদ্মাবতীকে উপেক্ষা কবিয়া একদিন তিনি যে ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহাকে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধিয়া রাখিয়া আজ সেই মহাভ্রম সংশোধন করিলেন ।

বৈষ্ণব ধর্ম হৃদয়হীন অপ্রেমিকেব ধর্ম নহে । গোস্বামী বুঝিতে পারিলেন—অনির্দিষ্ট পথে অসহায় ভ্রমণেব চেয়ে সংসাবে থাকিয়া ধর্ম-চর্যা করা অনেক ভাল । মিলনের মহা সাধনায়—বাধাক্ষেপের প্রেমলাভ হয় । তাহার নামই “সহজ সাধন” ।

পদ্মাবতীর সরল হৃদয় এখনও শৈশবের মত নিষ্পাপ ছিল, পূর্ণ যৌবনেও তাহা কলুষিত হয় নাই । প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি জয়দেবকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ।

সেই দিন, সেই নির্জজন সাগর সৈকতে, মুক্তালোক প্রচুর চক্ৰাতপ তলে দাঁড়াইয়া, বিশ্ব প্রেমিক জগন্নাথ দেবকে সাক্ষী কবিয়া, ভবিষ্যতের আশাপূর্ণ বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে জীবনের গুণ্যময় অবসরে, চিরসন্ন্যাসী ও চিরকুমারী—স্বহৃদয় বিনিময় করিলেন ! তখন মন্দির কূটিমে আরতির মঙ্গল শঙ্খ বাজিতেছিল ।

স্পর্শ অনুভব করিয়া, পদ্মাবতীর কুমারী ব্রত ভঙ্গ হইল। এজ্ঞ পাছে উৎকলবাসীগণের হস্তে প্রেয়সীকে লাজ্জনা সহিতে হয়, সেই ভয়ে জয়দেব পদ্মাবতীর সঙ্গে উড়িয়া তাগ করিলেন।

জয়দেব পূর্ব হইতেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, পদ্মাবতী গতির পদধুলায় শ্রামল যৌবন ঢাকিয়া রাখিয়া ভিখারিণী সাজিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। হরি গুণ গাণে, অমৃতময় ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া পাদপ কুটিরের পর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া, দম্পতীর জীবন বড় সুখে কাটিতে লাগিল।

নারী হৃদয়ের সমস্ত টুকু দিয়া, পদ্মাবতী স্বামীর সেবা করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই পদ্মাবতী জয়দেবের জীবনের অবলম্বন হইয়া উঠিলেন। পদ্মাবতীকে দেখিলে জয়দেবের মনে হইত—কাদম্বিনী ঘন চিকুর ছায়ায় এ পূর্ণচাঁদ কোথা হইতে উদিত হইল? জয়দেব মহাপণ্ডিত ছিলেন। জীবনের গভীর অকাজ্জনা ও যৌবনের অসীম উচ্ছ্বাস একত্র হইয়া তাঁহার হৃদয়ে কবিতা শক্তি জাগিয়া উঠিল।

জয়দেব রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তিনি দরিদ্র, মন্দির নির্মাণের ব্যয় কোথায় পাইবেন? পদ্মাবতীর পরামর্শে, অর্থ সংগ্রহের জন্ত জয়দেব দেশান্তর যাত্রা করিলেন। প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল। রাধামাধবের সেবাযত্নের আর ক্রটি হইবে না ভাবিয়া জয়দেবের আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি দেশে ফিরিলেন।

পশ্চিমধ্যে একদল দস্যু জয়দেবকে আক্রমণ করিল। তাহারা অর্থের সন্ধান পাইয়াছিল। সমস্ত অর্থ অপহরণ করিয়া দস্যুদল প্রস্থান করিল। পিশাচদের নির্দয় প্রহারে জয়দেব অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকেন, কতকগুলি ক্রবক সে যাত্রায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। জয়দেব বহুকষ্টে দেশে ফিরিয়া আসেন।

আমাদের দেশে “মুষ্টি ভিক্ষার” প্রথা বোদ্ধেরাই প্রচলিত করিয়া-

ছিলেন। মুষ্টি ভিক্ষায় রাধামাধবের সেবা চলিতে লাগিল। পতি-পরায়ণা প্রেমময়ী পত্নী পাইয়া জয়দেবের কবিত্ব শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইল। জয়দেব বাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা কবিত্ব পদাবলী রচনা কবিতেন, পদ্মাবতী সেই পদাবলীতে স্বর সংযোগ কবিত্ব, আপনাব স্বভাব মধুব মোহন কণ্ঠে সেই গান দ্বাবে দ্বাবে গাহিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে রাধামাধবের সেবা ও উভয়ের ভরণ পোষণ একবকম চলিয়া যাইত। কিন্তু মুষ্টি ভিক্ষার সাহায্যে গার্হস্থ্যধর্মের প্রধান কর্তব্য ‘অতিথিসংকার’—তাঁহাদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। ভিক্ষালব্ধ সামান্য তণ্ডুল একজন আগন্তকের পক্ষেও প্রচুর হইত না।

অল্পদিন পবেই স্বামী জীতে পরামর্শ কবিত্ব আবার দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

(৫)

পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া জয়দেব বঙ্গদেশের রাজধানী লক্ষণাবতীতে গমন করিলেন। তখন গোড়ের স্বর্ণ সিংহাসনে, বঙ্গের শেষ স্বাধীন বাজা—লক্ষণ সেন, বারিপতনক্ষীণ মলিন মেঘের বুকে দামিনীর শেষ বিকাশের মত—শোভা পাইতেছিলেন।

বৃদ্ধ লক্ষণ সেন বাঙ্গালীর উপযুক্ত বাজাই ছিলেন। বাঙ্গালীর মত বিলাসী, বাঙ্গালীর মত অদৃষ্টবাদী, বাঙ্গালীর মত কাব্যপ্রিয়—রাজা লক্ষণ সেন, কঠোর কর্মকান্ত জীবনের শায়ী, কার্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি শুধু রাজ্যশাসন কবিতেন না, রাজ্য পালনও কবিতেন।

বিক্রমাদিত্যের ছায় তাঁহাব সভায় রসিক, ভাবুক ও কবির আদর ছিল। গোবর্দ্ধন, শবণ, উমাপতি ও কবিকল্পপতি ধোয়ী—এই চারিজন কবি রাজার প্রথম জীবনের রুদ্রলীলায় কাব্যবসের অমিয় সিক্তনে নন্দনের

শান্তি বহিয়া আনিতেন। বৃদ্ধ রাজার সেই ক্ষটিকময় রক্তরাজি-সমাকুল সভায় গুপে, বসন্তেব মলয় বহিত। কুসুমের মৌরভ ছুটিত, নবযুবতী কিকবী, বলয়াক্তিত বাহুবল্লবী ঈষৎ সঞ্চালিত কবিতা রাজাকে চামব ঢুলাইত, মদনেব প্রতিক্রম ছত্রধাবী, বাজশিরে রক্তচ্ছত্র ধাবণ করিত।

জয়দেব পদ্মাবতীকে লইয়া রাজ-সভায় প্রবেশ করিলেন।

চাবিজন কবির সম্মুখে জয়দেব মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। রাজা গুণগুঞ্জিলেন, বুঝিতে পারিলেন—তঁাহাব সভা-কবিগণের মধ্যে কেহই জয়দেবেব মত ভাষা সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী নহেন। কাহারো রচনায় এমন মলয়ের মধুব হিল্লোল নাই।

এই বাব পদ্মাবতীর পরীক্ষা, রাজসভায় অনেকগুলি কোকিল কণ্ঠী গায়িকা ছিল, তাহাদের পুৰোবর্তিনী হইয়া পদ্মাবতী গান আরম্ভ করিলেন। কেন্দু বিব কবির কোমল কান্ত-পদাবলী, যখন দিবা রাগিণীর “পূর্ব্বরাগ”-আলাপে, মুচ্ছনায় গমকে, বঙ্গে ভঙ্গে, দর্শকগণেব অনন্যাসক্ত আবেগ পূর্ণ হৃদয়ে পূর্ণ মাধুর্য্যের তরঙ্গ তুলিতে লাগিল, তখন সেই জনতা-বহুল রাজ সভা, অমৃত নিশ্চন্দ্রিনী স্ববধারায় অভিষিক্ত হইয়া, তরঙ্গ বিহীন জলধির মত স্থির ও শান্তভাবে ধারণ করিল! রাজ সভার শ্রেষ্ঠ গায়িকা নটবধু— “বিছাৎ প্রভা”র \* অরুণরাগ লোহিত মুখ থানি, শিশির মধিতে পদ্মিনীর ন্যায় লজ্জায় মলিন হইয়া গেল। পদ্মাবতীর প্রসংশায় রাজ সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। গায়িকার কণ্ঠ যেমন মধুব, কবির শব্দ বিজ্ঞাস তেমন অপূর্ব্ব; যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ!! গায়িকার সঙ্গে সঙ্গে গীত রচয়িতাও সমাদৃত হইলেন। রাজা এই বৈষ্ণব দম্পতীকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

\* “সেক গুতোদয়া” দেখুন।

(৬)

রাজ্যশ্রেয় নিক্ষেপে, ঐশ্বৰ্য্যের ক্রোড়ে বসিয়া জয়দেব—বৈষ্ণবের  
অমূল্য ধন “গীত গোবিন্দ” রচনা করিলেন।

পদ্মাবতী জয়দেবকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। স্বামী মুখে স্বামীর  
অলীক মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, পদ্মাবতীর মূৰ্ছা হইয়াছিল, মৃতসঞ্জীবনী  
হারানাম স্মরণ জয়দেব সেই মৃত কল্পা পত্নীর চৈতন্য সঞ্চার করেন।  
পদ্মাবতীর ভালবাসার গভীরত্ব বুঝাইবার জন্য, জয়দেব আপনাকে “পদ্মাবতী-  
চরণ-চাবণ চক্রবর্তী” বলিয়া পরিচিত কবিত্তেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই  
দাম্পত্য জীবনের প্রগাঢ় ভালবাসায়—“গীত গোবিন্দের” জন্ম। গীত  
গোবিন্দ—জয়দেব ও পদ্মাবতীর আত্ম-কাহিনী। আত্মজীবনের মিলন-  
বিরহ লইয়া, গীত গোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাই  
কৃষ্ণপ্রেমের বিঘ্নব্যাপী ব্যাকুলতার মাঝখানে, গীত গোবিন্দে আমরা  
মদন-বিকারের পরিচয় পাই। অপাগবিন্দ, উদাসীন কবি রমণী-প্রেমে  
মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় ধর্মের মধ্যেও কেমন একটা লগ্ন-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া  
ফেলিয়াছেন! গীত গোবিন্দ—আদি রসাত্মক প্রেমের নিখুঁত ফটো!  
তাহার প্রত্যেক গীতটীতে—শৃঙ্গার তত্ত্বের উদ্বেগ-ভরা অনুরাগ, প্রত্যেক  
অক্ষরে—মরুময় ইন্দ্রিয়ের চির বুভুক্ষা! গীত গোবিন্দের ভাষা—যেন  
মর্মের পাষণের উপর দীপ্ত-প্রভ-মণিমাণিক্য,—এক একটা করিয়া  
ঘষিয়া মাজিয়া বসানো! মেঘের মেঘদুঃখ্যালোকে, বাহুজ্বলের মধ্যে  
আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া, প্রেমময়ী পত্নীর অধর কম্পন দেখিতে জয়দেব  
গীত গোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন।

গীত গোবিন্দের প্রাণ—মনোবৃত্তির উচ্ছ্বাসময় প্রেম, তাই গীতগোবিন্দ  
আপামর সাধারণের এত মর্মগ্রাহী হইয়াছে। গীত গোবিন্দ—রাধা-  
কৃষ্ণের প্রেমলীলা কীৰ্ত্তন করিয়া, বঙ্গদেশকে বৈষ্ণব ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে।  
জয়দেবের এ ঋণ—বাল্যলী বৈষ্ণব কখনও শোধ দিতে পারিবেন না!

গীত গোবিন্দ রচনা সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি আছে। “প্রিয়ে চাক-  
নীলে” প্রমুখ গানটী বচনাব সময় জয়দেব একটু সন্দ্বিগ্ন হইয়াছিলেন।  
মানিনীৰ মানেব মাত্রা গুরুতব হইলে, নায়ক চরণে ধরিয়া “চণ্ডী”কে শাস্ত  
কবেন। কিন্তু জগদীষ্ট কৃষ্ণ কি সামান্য নায়কেব মত বাধাব চরণ  
ধবিবেন ? জয়দেবেব ইহা সঙ্গত বোধ হইল না। “শ্রাব গবল খণ্ডনঃ  
মম শিবসি মণ্ডনঃ” এই পর্য্যন্ত লিখিয়া জয়দেব ইতস্ততঃ কবিতেছিলেন।  
বুঝি সেই বৈশাখেব পূর্ণিমাৰ মত সমুজ্জল প্রতিভায়, সেদিন ভাষার  
অনাটন পড়িয়া গিয়াছিল।

বেলা হইল দেখিয়া পদ্মাবতী স্বামীকে স্নান কবিত্তে অনুরোধ করি-  
লেন। জয়দেব প্রতাহ গঙ্গাস্নান কবিতেন। জয়দেবেব বাসস্থান হইতে  
গঙ্গা প্রায় অষ্টাদশ ক্রোশ দূৰে অবস্থিত। এতদূৰ হইলেও জয়দেব  
প্রতাহ গঙ্গাস্নান কবিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে—কোনও কাৰণ  
বশতঃ জয়দেব একদিন গঙ্গায় যাইতে পাবেন নাই, ক্ষুদ্র ভক্তেব তৃপ্তিব  
জন্ত সেদিন গঙ্গাদেবী স্বয়ং কেন্দুবিব্র গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। \*

জয়দেব গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন। ইহাব অন্তরঙ্গ পবেই—জয়-  
দেবেব ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, জয়দেবেব রূপ ধারণ কবিয়া জয়দেবেব গৃহে প্রবেশ  
করিলেন। তাহাব পর গীত গোবিন্দেব পুঁথিখানি খুলিয়া কি লিখিলেন।  
পদ্মাবতী পতিব জন্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা ভোজন  
কবিলেন। শেষে পদ্মাবতীকে তাম্বুল বচনায় ব্যাপ্ত দেখিয়া, শ্রীহবিও  
ধীবে ধীবে প্রস্থান কবিলেন।

পদ্মাবতী স্বামীব ভুক্তাবশিষ্ট লইয়া ভোজন কবিত্তেছেন, এমন সময়

\* অজয় নদের সহিত ভাগীরথীর যোগ আছে, হয় তো সে সময়ে গঙ্গার স্রোত  
অজয়ের বারি স্রোতে মিশিয়া জয়দেবেব কুটির প্রাঙ্গণ দাবিত করিয়াছিল। জয়দেবেব  
কোন ভক্ত তাহা দেখিয়া এইরূপ প্রবাদেব স্রষ্ট করিয়াছিলেন।



সিদ্ধ বেশে প্রকৃত জয়দেব উপস্থিত। জয়দেবকে দেখিয়া পদ্মাবতীও যেমন বিস্মিত হইলেন, আপনাব পূর্বে পত্নীকে আহার করিতে দেখিয়া জয়দেবও ততদূর বিস্মিত হইলেন। জয়দেব কারণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। পদ্মাবতী বলিলেন—“ইহার পূর্বে তুমি আসিয়া পুঁথিতে কি লিখিলে, তাহার পর আহাব করিলে, পান না লইয়াই চলিয়া গেলে। আমি তোমার প্রসাদ ভোজন করিতেছি।” জয়দেব অধিকতর বিস্মিত হইয়া পত্নীকে বলিলেন,—“তিনি এই তো আসিতেছেন, ইহাব পূর্বে আসেন নাই, আহারও করেন নাই।” পদ্মাবতী পতিব কথায় অবিশ্বাস করিলেন না; বাস্তবিক অষ্টাদশ ক্রোশ পথ হইতে সত্তর প্রত্যাবর্তন একেবারেই অসম্ভব! কিন্তু এ কি রহস্য! পদ্মাবতী স্বচক্ষে স্বামীকে আহার করিতে দেখিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহাকে পুঁথি লিখিতেও দেখিয়াছেন! এ হৃর্ভেদ্য রহস্য কে ভেদ করিবে? তখন জয়দেবের মনে হইল—আগন্তুককে পদ্মাবতী লিখিতে দেখিয়াছেন, অতএব পুঁথি খুলিয়াই দেখা যাউক। পদ্মাবতীও তাহাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন।

পুঁথি খুলিয়া জয়দেব যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহাব বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তিনি বচনা অসমাপ্ত রাখিয়া জ্ঞান করিতে গিয়াছিলেন। জয়দেব দেখিলেন—সেই অসম্পূর্ণ বচনা সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে! তাঁহারই ইষ্টদেব তাঁহাবই রূপ ধরিয়া, মানিনীৰ পদতলে পতিত হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

“দেহি পদ পল্লব মুদারং”।

নীলাকাশে নক্ষত্র ধবল ছায়াপথের মত সেই পবিত্র করে পুণ্যাকরে জয়দেবের শৃঙ্গার প্রাণ গীত গোবিন্দের মর্মে মর্মে—অতৃপ্ত বাসনার আকুল উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছে! চির বাঙ্কিতের চরণে জয়দেবের প্রাণের আত্মান প্রেমের সাগর সঙ্গমে মিশিয়া গিয়াছে!

জয়দেবের সাধনা সিদ্ধ হইল। তিনি পদ্মাবতীর চরণতলে পতিত

হইয়া বলিলেন—“তোমার নারীজন্য সার্থক হইয়াছে, তুমি প্রভুকে দেখিয়াছ, প্রভুর প্রসাদ ভোজন করিয়াছ ;—আমি হতভাগ্য—প্রভুকে দেখিয়া হৃদয়ের অনন্ত আলা জুড়াইতে পাবিলাম না”। জয়দেব কাঁদিয়া ফেলিলেন। পত্নীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া, আশ্রহারা কবি আপনার ভক্তিমূল-প্রেমব্রত উদ্‌যাপন করিলেন !

\*

\*

\*

\*

এখনও কেন্দুবিষ তীর্থে জয়দেবের স্মৃতি বক্ষার জন্য বৈষ্ণবগণ একটা মেলার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তিতে—যাত্রী-গণ, জয়দেবের সেই জীর্ণ পর্ণকুটিরে বৈকুণ্ঠের অনাবিল শোভা দেখিয়া মৃত্যুমলিন মানবজীবন পবিত্র করেন।

---



# প্রেম রসিক চণ্ডীদাস

( ১ )

পূজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামী ভক্ত ও ঈশ্বকে লইয়া, পতী পত্নীর মধুব প্রেমে অভিষিক্ত কবিয়া “রাধা কৃষ্ণেব” রূপক প্রচাৰ কবেন। কিন্তু সে রূপকের কঠিন আবরণ ভেদ কবিয়া আধ্যাত্মিক প্রেমের উজ্জ্বল মূর্তি প্রত্যক্ষ কবিবাব ক্ষমতা সাধারণের ছিল না। বৈষ্ণব ধর্ম প্রেম পূর্ণ কবিত্ব পূর্ণ ধর্ম, সংসারের আত্মস্তরী পোদাবগণ তাহা চিনিতে পারিল না। দেশে তখন পঞ্চ “ম” কাবের উপাসনা চলিতেছে, পাঠানগণ তখন বঙ্গের বিধাতা পুরুষ; বাঙ্গালাব তখন বড়ই দুর্দিন। অসি চর্ম্মের রুদ্ধ স্বভাব রাজ বিপ্লবে, বাঙ্গালীর জাতীয় ও ধর্ম্মজীবন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাণ হীন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম প্রক্রিয়ায়, হুঃখিতের প্রাণে শান্তি মিলিত না, হুঃখিত জাতির এই অভাবের উচ্ছ্বাসেই— দুর্দিনের কবি চণ্ডীদাসের জন্ম। জয়দেবেব কিছু পরেই, বৈষ্ণব ধর্ম্মেব উদ্বোধনের ভাব লইয়া প্রেমিক চণ্ডীদাস মর্ত্তের মাটিতে পদার্পণ করিয়া- ছিলেন।

বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে দুর্গাদাস বাগচী নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নান্নুব গ্রাম সিউড়ী হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। দুর্গাদাস বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। নলরাজা নামক জনৈক নরপতি নান্নুর গ্রামে বিশালক্ষী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, দুর্গাদাস এই দেবীর সেবাইত ছিলেন। দুর্গাদাসের বাটার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে মনে হয়, তিনি দরিদ্র ছিলেন না। বাঁকুড়া জেলার ছাৎনা গ্রামে দুর্গাদাসের বিবাহ হইয়াছিল। এই পত্নীর গর্ভে অন্তমান ২৩২শকে

ছাৎনা গ্রামে খণ্ডরালয়ে দুর্গাদাসের এক পুত্র ভূমিষ্ট হয়। সেই পুত্রই বাঙ্গলার কবি চূড়ামণি, সাধক বর “চণ্ডীদাস”।

দুর্গাদাস গোঁড়া শাক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ শঙ্কর-বক্ষ-বাসিনী বিশালম্মী ( বাগুলি ) দেবীর পূজা কবিতেন। মত্ত মাংস বিবিধ উপচারে দেবীর অর্চনা হইত, এখনও নান্নুর গ্রামে দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ বর্তমান আছে। কিন্তু পূজার আর সেরূপ আড়ম্বর নাই। আগে দেবীর সম্মুখে প্রত্যহ অসংখ্য মহিষ মেঘ ছাগ বলি হইত, এখন মহাপূজার নবমীতে ছাগ বলি হয়, কদাচিৎ মহিষ বা মেঘ বলিও হইয়া থাকে। দেবীর যে দুর্ব্বার রক্ত পিপাসা রক্তবীজের শোণিত সিন্ধুতে নিবারিত হয় নাই, এখন দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, ছাগ শিশুর গণ্ডুষ পবিমিত রক্তে রাক্ষসীর রক্ত পিপাসা শাস্তির ব্যবস্থা ! মাতা হইয়া সন্তানের রক্ত পান না কবিলে দেবীর দেবীত্ব বজায় থাকিবে কেন ? এরূপ দেব মহিমা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আমরা রক্তের মত রাঙ্গা জবাফুল দিয়া দেবীর পূজা করিতে ভালবাসি। সাধকের ভক্তি থাকিলে, মা বোধ হয় ইহাতেই পরিতৃপ্ত হন।

দেবীর প্রসাদে জন্ম বলিয়া দুর্গাদাস পুত্রের নাম চণ্ডীদাস রাখিলেন।

চণ্ডীদাস যখন বালক, তখন দুর্গাদাস সেই বালকের স্বন্ধে বংশ গোরবের গুরুভার অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসারিত হইলেন। পতি পরায়ণা গন্ধীও স্বামীর অমুগমন করিলেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের ভাগ্যে বিড়ালভাষ্য ঘটিল না। অধিকন্তু বামাচারীগণের সহবাসে অল্প বয়সেই তিনি মদ্যপান করিতে শিখিলেন। লোকে মোহাগ কবিয়া তাঁহাকে “চ’ণ্ডে মাতাল” বলিয়া ডাকিত। এই ভাবে চণ্ডীদাসের স্কুন্মার শৈশব অতীত হইয়া গেল।

নান্নুর গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ব্রাহ্মণগণ দয়া করিয়া পিতৃ মাতৃহীন অনাথ চণ্ডীদাসের উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন করিয়া দিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর পূজারি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

শাক্তের বংশে জন্ম গ্রহণ কবির। চণ্ডীদাসেব শক্তিব প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। তিনি স্বর্গীয় পিতাব অনুকরণে দেবীর পূজা শিখিয়াছিলেন। প্রত্যহ নিয়মিত বিশালাক্ষীদেবীর পূজা কবিতেন, ভোগ বাঁধিতেন, অতিথি অভ্যাগতকে ভোজন কবাইয়া নিজে প্রসাদ পাইতেন।

অনেকে বিবাহ কবিবাব জন্য চণ্ডীদাসকে অনুবোধ কবিল, কিন্তু চণ্ডীদাস বিবাহ কবিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাহাব অভিপ্রায় ছিল চিবদিন কুমাব থাকিয়া শক্তি মন্ত্রেব উপাসনা কবিবেন। চণ্ডীদাসেব পদাবলীর ভণিতায় তাহাব “বডু” উপাধিব পবিচয় পাওয়া যায়। এই “বড ” শব্দেব অর্থ—“কুমাব”, ইহাব আব একটা অর্থ আছে—পূজাবি।

( ২ )

এই সময় নাগুব গ্রামে বামমণি নামী এক বজক বমণী বাস করিত। বামমণি যুবতী, তিন কুলে তাহাব কেহ ছিল না। বামমণি জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন কবে নাই, সে বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির মার্জনা কবিত। বজক কন্যা হইলেও বামমণিব স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল ; ভক্তিমতী ও শুদ্ধচাৰিণী বলিয়া চণ্ডীদাস তাহাকে স্নেহ কবিতেন।

দেশে তখন তান্ত্রিক মতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, বৈষ্ণব ধর্ম তখন লক্ষ প্রতিষ্ঠ হইতে পাবে নাই। জয়দেবেব প্রেম ধর্ম নূতন বলিয়া, শাক্তগণেব সঙ্গে বৈষ্ণবগণেব বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল। নূতন ধর্মেব নূতন উচ্ছ্বাসে, নূতন দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ—জয়দেবেব কোমল কান্ত পদাবলী গাহিয়া পথে পথে ভ্রমণ কবিয়া ভিক্ষা কবিতেন, বামাচাবী তান্ত্রিকগণ—এই সকল নিবীহ বৈষ্ণবকে উৎপীড়ন কবিয়া নৃমুণ্ডমালিনীর জয় ঘোষণা কবিত। চণ্ডীদাস বৈষ্ণবেব দুর্দশা দেখিতেন, তাহাব প্রেম প্রবণ করণ হৃদয় পব-দ্রুখে গলিয়া যাইত। তিনি সেই লাঞ্চিত বৈষ্ণব ভিক্ষুককে কাছে বসা-ইয়া আশ্বাস দিতেন, তাহাদিগেব গান শুনিয়া তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া

সন্মানের সহিত বিদায় দিতেন। এইরূপে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তাঁহার সাহচর্য ঘটতে লাগিল। শাক্ত চণ্ডীদাস ক্রমে বাধাক্ষয় প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি শক্তির সেবাইত, পাছে বৈষ্ণবধর্মে অনুবাগ দেখাইলে শাক্ত গণের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়—এই আশঙ্কায় চণ্ডীদাস ইতস্ততঃ কবিতেছিলেন। শাক্তগণ কুপিত হইলে তাঁহাকে বিষম বিপন্ন হইতে হইবে, অন্নের সংস্থান জন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে, বিশেষতঃ পিতৃধর্ম ত্যাগ করিলে তাঁহার লাক্ষ্মীনাথ সীমা থাকিবে না। অনেক ভাবিয়া চণ্ডীদাস বামাচাৰ্য ত্যাগ কবিতেন পাবিলেন না।

একদিন চণ্ডীদাস স্নান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন—একটি প্রফুল্ল পদ্ম-কোবক স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। চণ্ডীদাস সযত্নে ফুলটী সংগ্রহ করিলেন। তাহার পব মন্দিরে আনিয়া ঐ ফুলটী চন্দন মিশ্রিত করিয়া বিশালাক্ষীদেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। বাত্রিকালে দেবী চণ্ডীদাসকে স্বপ্ন দিলেন—“ভক্ত চণ্ডীদাস! আজ তুই যে ফুলটী আমার পদে অপণ করিয়াছিস্—তাহা বিষ্ণুর নিম্মাণ্য, বিষ্ণু আমার গুরুব গুরু—আমি সে ফুলটী মস্তকে ধারণ করিয়াছি।” পবদিন প্রাত্যবে—চণ্ডীদাস মন্দিরে গিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই সেই চন্দন লিপ্ত পদ্ম কোবক বিশালাক্ষীর মস্তকে উজ্জল পদ্মবাগের মত শোভা পাইতেছে! চণ্ডীদাসের বিশ্বাসের সীমা বহিল না। চণ্ডীদাস বুঝিলেন—আমার মায়েব চেয়ে তবে তো বিষ্ণুই বড়। সেই দিন হইতেই চণ্ডীদাস বিষ্ণুভক্ত হইলেন। তিনি বিশালাক্ষীর মধ্যে—কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আব ভেদ জ্ঞান বহিল না, ভক্তের সবল হৃদয় কালী কালী এক হইয়া, প্রয়াগের মত গঙ্গা যমুনা মিশিয়া গেল। চণ্ডীদাস দেবীর পূজা কবিতেন, কিন্তু যুগবদ্ধ ছাগ শিশুর মূহূগন্ধি আর্তনাদে—তাঁহার নয়ন যুগলে নির্ঝরিত হইত। তিনি বলি দেখিতে পাবিতেন না। শাক্তগণ, বামাচাৰ্য

চণ্ডীদাসেব এই অপকৃপ ভাবান্তর লক্ষ্য কবিতা, চণ্ডীদাসেব উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল । চণ্ডীদাসও বুঝিলেন—শাক্তগণ তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, সুতরাং তাঁহাব জীবনে অশান্তি কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে, এই শাক্ত বোধ শীঘ্রই তাহাব ভাগ্যাকাশে বজ্রানলের বেথা টানিয়া, বদ্ধগত শনি গ্রহেব ত্রায় তাহাব সকল স্তম্ভ নিষ্টুব হস্তে নষ্ট কবিতা ফেলিবে ।

শাক্তগণকে প্রতাবণা কবিবাব জন্ম চণ্ডীদাস এক অপূৰ্ণ কোশলেব সৃষ্টি কবিলেন । সে কোশল অপাপবিদ্ধ ভক্তেব কোশল । সে কোশল কবিজনোচিত কোশল । চণ্ডীদাস স্বয়ং তাহা এইরূপে বর্ণনা কবি ।  
ছেন-

শাল তোড়া গ্রাম, অতি পাঠস্থান, নিত্যেব আলয় যথা ।  
ডাকিনী বাগুলী, নিত্যা সহচরী, বসতি কবয়ে তথা ॥  
চণ্ডীদাস কহে, সে এক বাগুলী, প্রেম প্রচারেব গুণ ।  
তাহাবি চাপড়ে, নিদ ভাঙ্গিল, পিৰীতি হইল সুখ ॥

বাঁকুড়া জেলাব শাল তোড়া গ্রামে “নিত্যা” নাম্নী বনদেবী ছিলেন, ঐ বনদেবী “বাগুলী” নাম্নী এক ডাকিনী সঙ্গিনী ছিল । নিত্যা দেবী বড় “ঝুমু” গুণিতে ভালবাসিতেন । একদিন দেবী ইচ্ছা হইল বাধা-ক্লেশেব বৃন্দাবন লীলাব গান শুনিবেন । বোধ হয় দেবী ঝুমুবে অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল । দেবী সহচরী বাগুলীকে মনেব অভিপ্রায় জানাইলেন । বাগুলী বলিল—“বৃন্দাবন লীলা শুনাইবে কে ? তেমন মধুবক গায়ক, তেমন অকপট ভক্ত কবি—কাহাকেও তো দেখিতে পাট না মা ।” দেবী আদেশ কবিলেন—“লীলাবসজ্জ ভক্তেব অনুসন্ধান কবিত হইবে, তুমি এখন যাও—আমি বৃন্দাবন লীলা অবশ্যই শুনিব ।” বাগুলী আব দ্বিকল্পিত কবিত পাৰিল না , সে অবিলম্বে শাল তোড়া পৰিত্যাগ কবিতা চলিয়া গেল ।



বাঙালী অনেক দেশ ঘুরিল, কিন্তু মনেব মত কাহাকেও পাইল না। অবশেষে—নান্নুবে আসিয়া উপস্থিত হইল। চণ্ডীদাসেব দেবমূর্তি দেখিয়া বাঙালী বুঝিল—“এই ব্যক্তিই লীলা মাধুর্য্য প্রচারেব যোগ্যপাত্র। কিন্তু এ ব্যক্তি দেখিতেছি—শক্তি প্রতিমাব পূজাব, শাক্তের মুখে বৈষ্ণব তত্ত্ব ভাল কবিয়া পবিফুট হইবে না। অতএব চণ্ডীদাসকে বৈষ্ণব মতেব সহজ সাধনায় দাক্ষিত কবা যাউক।

সাবা দিবসেব পবিশ্রমেব পব চণ্ডীদাস তখন নিদ্রা দিতেছিলেন। বাঙালী ডাকিনী নিদ্রিত চণ্ডীদাসেব পৃষ্ঠে সজোবে এক চাপড় বসাইয়া দিল। দাকণ চপেটাঘাতে শিহবিয়া উঠিয়া চণ্ডীদাস শয্যাব উপব উঠিয়া বসিলেন। সুপ্তোদ্রিত চণ্ডীদাসকে ডাকিনী আত্ম পবিচয় প্রদান কবিল, দেবীব আদেশও জানাইল। চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা প্রচাবে সন্মত হইলেন, বলিলেন—“লীলা প্রচাবেব পূর্বে আমাকে বৈষ্ণব তত্ত্বেব গৃঢ় বহস্য জানিতে হইবে। বৈষ্ণব মন্ত্ৰে কে আমায় দীক্ষিত কবিবে?” ডাকিনী উত্তর দিল—“বামমণি”।

উত্তর শুনিয়া চণ্ডীদাস আশ্চর্য্য হইলেন। বজক-কত্ৰা বামমণি ব্রাহ্মণেব দীক্ষা শুক হইবে? ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসেব উপদেষ্টা—বামমণি? মন্ত্ৰ লইতে গেলে বামমণিব সঙ্গে একত্ৰ থাকিতে হইবে, তাহা হইলে লোকেই বা কি বলিবে? কাতব কণ্ঠে চণ্ডীদাস ডাকিনীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—

“প্রবর্ত দেহেব সাধনা কবিলে—

কোন্ বরণ হব?”

ডাকিনী হাসিয়া উত্তর দিল—

“গুনহ দ্বিজ!

কহিব তোমাে সাধন বীজ।”

ডাকিনী চণ্ডীদাসকে বৈষ্ণব ধর্মের মর্ম্ম শুনাইল। তাব পর বাম-  
মণিব সহিত প্রবর্ত্ত হইয়া “সহজ ভজন” সাধনেব উপদেশ দিয়া, শূন্তে  
মিশিয়া অন্তহৃত হইল।

( ৩ )

সেই বাত্রেই চণ্ডীদাস বামমণিব কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।  
বামমণি তখন মন্দির কুড়িমে শয়ন কবিয়াছিল। গুরু পঞ্চমীব খণ্ড চন্দ্র-  
রশ্মি বামমণিব সুন্দর মুখ থানিব উপর পাড়িয়া তাহাব উৎফুল্ল যৌবন-  
শ্রীকে আলোক রঞ্জিত করিতেছিল। গুরু জ্যোৎস্নায়, গুরু বসনা সুন্দরীকে  
বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণ প্রক্ষুটিত রজনীগন্ধাব মধুব সৌভভ  
মাথিয়া, অলস সমীবণ যুবতীব চূর্ণ কুস্তল লইয়া ক্রীড়া কবিতেছিল।  
চারিদিক নিস্তরু, অনন্ত নীলাশ্বব হইতে সসীম বসুন্ধবাব শেষ প্রান্তটী  
পর্যন্ত—সর্বত্র অখণ্ড শান্তি বিরাজিত ! তখন, সেই শান্তিময়ী প্রকৃতিব  
বুকে শায়িতা, সাক্ষাৎ শান্তির প্রতিমা সুন্দরীকে সন্ধান করিয়া শান্তি  
প্রয়াসী চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন—

“শুন রজকিনী রামী !

ও ছু’টা চরণ শীতল জানিয়া

শরণ লইহু আমি।”

রামীকে বাধারূপে কল্পনা করিয়া চণ্ডীদাস ক্রুদ্ধ লীলার আন্বাদ গ্রহণ  
করিলেন। চণ্ডীদাস বাহুজ্ঞান শূন্ত—তন্ময় !

চণ্ডীদাসেব ধর্ম্মাস্তর গ্রহণে শাক্তগণ ঠাড়ে হাড়ে চটিল। ধোপানীর  
প্রতি ব্রাহ্মণ সন্তানেব অমুরাগ—সমাজ ক্ষমা কবিতে চাহিল না।  
ব্রাহ্মণেবা পরামর্শ কবিলেন—চণ্ডীদাস যখন রামীর প্রতি আসক্ত, তখন  
সে পতিত, এরূপ চরিত্র হীন ব্রাহ্মণের দ্বারা কেমন কবিয়া দেবীর পূজা  
হইবে ? লোকে চণ্ডীদাস ও বামমণির অপবাদ রটনা করিতে লাগিল।

সাপাষণের চাক্ষুস্মণীত হইয়া ভক্ত চণ্ডীদাস পুৰোহিতের অধিকাৰ চ্যুত হইলেন। বামী মন্দিৰ হইতে তাড়িতা হইল।

এইৰূপ অতৰ্কিত বিপদে বিপন্ন হইয়া অশ্রুমুখী বামমণি চণ্ডীদাসকে বলিল—

“কি বহিব বধুহে ! কঠিতে না জুয়ায় ।  
কাঁদিয়া বহিতে পোড়া মুখে হাসি পায় ॥  
অনামুগ মিলে গুলাব কিবা বৃকের পাটা ।  
দেবী পূজা বন্ধ কবে বুলে দেয় বাটা ।  
চাক বাজিয়ে সহজ বাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে ।  
চ’ন্দে না দেখিয়া মিছা কলঙ্ক রটায় হে ॥

প্ৰেমিকার আক্ষেপ শুনিয়া চণ্ডীদাস কহিলেন—

“কপিলে বিষের গাছ হৃদয় মাঝাবে ।  
গরলে জাবল অঙ্গ দোষ দিবে কাবে ?  
ইন্দ্ৰ আদি কবি, স্বর নর দানব,  
তিন পুৰ জিনিল দশ মাথে ।  
বিশ বাহ পব বিজয় ধনুর্ধর,  
নুপতি নিশাচব নাথে ॥  
মোহি লঙ্কাপতি, দৈবে হরণ মতি,  
বিপদ সময় যব ভেলা ।  
রতন মুকুট পব বনচর বানর—  
চবণ ঘাত কত দেলা ॥”

যখন বাৰণেবই এইৰূপ দুৰ্দশা হইয়াছিল, তখন আব অগ্র পবে কা কথা ? আমাদেব “শ্যাম কলঙ্কী” অপবাদই ভাল ।”

এই কথাতেই বামমণি প্ৰবোধ পাইল। তখন উভয়ে মিলিয়া গ্ৰামেব প্ৰান্তভাগে নিৰ্জ্জন মাঠেব মাঝে পৰ্ণ কুটিব বচনা কবিয়া, চণ্ডীদাস সহজ সাধনায় মত্ত হইলেন।

( ৪ )

অন্নচিন্তায় ব্যস্ত থাকিলে ধর্ম্মাচরণেব ব্যাঘাত ঘটে। উভয়ের অন্ন সংস্থানের আশায় ভিক্ষা কবিরাব জগ্গ বামননি গ্রামান্তরে চলিয়া গেল, বলিয়া গেল—তাঁহাব ফিবিয়া আসিতে দুই চাঁব দিন বিলম্ব হইবে। চণ্ডীদাস কুটিবে একাকী বাস কবিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীবা সকলে গিয়াও তাঁহাব প্রতি অত্যাচার ববিতে লাগিল।

অনশনে থাকিয়া চণ্ডীদাস পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পীড়া ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। চণ্ডীদাস পিপাসায় অস্থির হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে কাতব ভাবে মুহূর্ন্তঃ চীৎকার কবিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীগণ দূর হইতে সে মন্মভেদী আর্তনাদ শুনিতে পাইল। ছ' একজন নিকটে আসিয়া উকি মাঝিয়া চণ্ডীদাসেব শোচনীয় অবস্থা দেখিল, কিন্তু কেহই সেই আসন্ন মরণ ব্রাহ্মণেব ক্ষুধার্ত্ত মখে একবিন্দু “পিপাসায় জল” দিল না। পিশাচবা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া—হতভাগ্য ব্রাহ্মণেব যম যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল! কাহাবও দয়া হইল না, এমনি সমাজপতিব কঠোর শাসন যে, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্ভ্রম অথাত বাথিবাব জগ্গ, জন্মদাতা স্নেহময় পিতা, একাদশীব দিন বাল-বিধবাব শুষ্ক প্রাণে জলবিন্দু প্রদানে অগ্রসব হ'ন না, সেই হিন্দু কি চণ্ডীদাসেব অস্তিমকালে উদাব করণাব মুক্তহস্ত প্রসারিত কবিতে পাবে? তাহ'লে যে শাস্ত্রেব মর্যাদা থাকিবে না!!

এইভাবে দুই দিন কাটিল। তৃতীয় দিবসেব প্রভাতে চণ্ডীদাসেব কুটিব নিস্তদ্ধ হইল। কোনও সাড়া শব্দ না পাইয়া ছ' একজন প্রতিবেশী দেখিতে আসিল; আসিয়া কি দেখিল?—এক বিন্দু জলেব অভাবে দবিত্ত ব্রাহ্মণেব হৃৎপিণ্ডেব গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, হতভাগ্যেব প্রাণশূন্ত শবদেহ—কুটিবেব মৃত্তিকায় গড়াগড়ি যাইতেছে।

গ্রামে শবদেহ পড়িয়া থাকিলে নিজেদেবই অমঙ্গল হইবে—এই ভয়ে গ্রামবাসীগণ চণ্ডীদাসেব মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল। চিতা সজ্জিত

হইল, চিতাব উপব শব স্থাপন কবিতা, চিতায় অগ্নি সংযোগেব উজ্জোগ কবিল।

ত্বিক এই সময়—আলুথালু বেশে কঙ্ককেশা বোরুজ্জমানা রামমণি—  
উদ্ধৃথাসে ছুটিতে ছুটিতে ঞ্শশানে উপস্থিত হইল। বিয়োগবিধুবা বামমণি  
উন্মাদিনীৰ মত চীৎকাব কবিতা বলিতে লাগিল—

“কোথা যাও ওহে প্রাণ বঁধু মোব! দাসীবে উপেক্ষা কবি।

না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোব বুক, ধৈবজ ধবিতে নাবি ॥

বাল্যকাল হ’তে এ দেহ সঁপিছু, মনে আন নাহি জানি।

কি দোষ পাইয়া, মথুবা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি ॥”

বামীৰ বিলাপে নিদ্রোথিতেব ত্রায় চণ্ডীদাস চিতাব উপব উঠিয়া  
বসিলেন। শবদেহ বহন-কাবীবা মনে কবিল—ব্রাহ্মণকে বুঝি “দানায়”  
পাইয়াছে! তাহাবা ঞ্শশান ছাড়িয়া পলায়ন কবিল। চণ্ডীদাসকে জীবিত  
দেখিয়া বামী আনন্দে নৃত্য কবিত্তে লাগিল। চণ্ডীদাস বামীৰ হাত ধবিতা  
বলিলেন—“এদেশে ববনা সই! দূব দেশে যাব।”

তখন, সন্ধ্যাব ধূসববাগে পশ্চিম দিক্ বজ্জিত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস  
বামীৰ সঙ্গে কুটিবে ফিবিতা আসিলেন। রাত্রে উভয়েব অনেক কথা  
হইল। চণ্ডীদাস সঙ্কল্প কবিলেন—প্রভাতে তাঁহাবা অগ্ৰ গ্রামে যাভা  
কবিবেন। বামী আহাবেব উদ্যোগ কবিতা দিল।

( ৫ )

সেই বাত্রে আব একটা আশ্চৰ্য্য ঘটনা ঘটিল।

বিজয় নাভায়ণ চক্রবৰ্ত্তী নামক একজন সন্তান্ত ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন,  
যেন বিশালাক্ষী দেবী তাঁহাকে তিবঙ্কাব কবিতা বলিতেছেন—“ওয়ে  
পিশাচ! তোবা আমাব সেবক সেবিকাব মিথ্যা কলঙ্ক বটনা কবিতাছিস,  
তোদেব উৎপীড়নে তাহাবা দেশ ছাড়িতা চলিতা যাইতেছে! এই পাণে

ভোদেব সর্বনাশ হইবে । যদি মঙ্গল চাস্—এইবেলা সকলে মিলিয়া চণ্ডীদাস ও রামমণিকে প্রসন্ন কর ।”

চক্রবর্তী প্রভাতে সকলেব কাছে স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন । চণ্ডীদাসকে সমাজচ্যুত কবিবাব নেতা ছিলেন—এই চক্রবর্তী মহাশয় । গ্রামেব সকলেই তাঁহাব অন্তঃকৃত ছিল । তাঁহার কথায় কাহাবো অবিস্থাস বহিল না । চক্রবর্তী গ্রামবাসীদের সঙ্গে লইয়া চণ্ডীদাসের শরণাগত হইলেন । কবযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন । উদাব প্রেমিক চণ্ডীদাস সকলকেই প্রেমভাবে আলিঙ্গন কবিলেন । এইখানেই চণ্ডীদাসের মহত্ব, যিনি শত্রুকে এমনভাবে ক্ষমা করিতে পাবেন, তিনিতো দেবতা ! “এমন দেবতার সঙ্গে কি ব্যবহাবই করিয়াছি”—ইহা ভাবিয়া, স্ব স্ব কৃতকাৰ্য্য স্ববণ কবিয়া গ্রামবাসীগণ লজ্জায় অধোবদন হইল । সেই দিন, নান্দুরেব সেই পবিত্র মাঠে, তাহাবা চণ্ডীদাসের কাছে পবিত্র বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষা গ্রহণ কবিল । চণ্ডীদাসের প্রধান শিষ্য হইলেন—স্বয়ং চক্রবর্তী মহাশয় ।

ক্রমে, চণ্ডীদাসেব পুনর্জীবন প্রাপ্তির অলৌকিক কাহিনী দেশ বিদেশে প্রচার হইয়া পড়িল । লোকে বুঝিলেন চণ্ডীদাস ও রামমণি সামান্ত নর-নাবো নহেন । চণ্ডীদাসের মাহাত্ম্য শুনিয়া, কবিবর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে দেখিতে আসিয়াছিলেন । পতিতপাবনী জাহ্নবীর পৃথ্যাতীরে, শ্রামপত্র বহণ বটবৃক্ষ মূলে—এই দুই অপূর্ব প্রেমিক পরস্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন !

( ৬ )

বৈষ্ণব কবি জয়দেবের কণ্ঠ হইতে যে অপার্থিব প্রেম সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছিল, সেই অপূর্ব রাগিণীর অমিয়স্বরে, ললিত পঞ্চমে কণ্ঠ মিলাইয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা গাহিয়াছিলেন । আজ ভারতের দেশে দেশে চণ্ডীদাসের মধুর গান প্রভাত সন্ধ্যায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে । প্রেম ও

মোহেব পার্থক্য বুঝিয়া, চণ্ডীদাস প্রেমের নাম বাখিয়াছিলেন—“পিবাসিত” ।  
 প্রেমিক চণ্ডীদাস পেমের বলেই সিদ্ধিলাভ কবিয়াছিলেন । চণ্ডীদাসের  
 পদাবলী বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য বস্তু । সে পদাবলীর পত্যেক পদ—  
 আবেগে ও সৌন্দর্যে পৰিপূর্ণ । চণ্ডীদাসের কাব্যতা—বসন্তানিল তাড়িত  
 পুষ্পময়ী প্রিয়ঙ্গুলতা ! চণ্ডীদাস বুঝিয়াছিলেন, প্রেমের অর্থ—স্বার্থত্যাগ ।  
 তাই বাধার ফেব পবিত্র পেমের আদর্শে, আপনাব জীবন গঠন কাব্যে,  
 তিনি বৈষ্ণব জগতে আপনাব হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত দেখা গিয়াছেন ।  
 আজ কালকার শিক্ষিত সম্প্রদায় চণ্ডীদাসের পদাবলীকে অশ্লীল বলা  
 য়না করেন । কিন্তু, চণ্ডীদাসের তস্মাৎ—অসুন্দর বা জুগুপ্সাজনক  
 নহে । চণ্ডীদাসের “আদিবস” দেহের সঙ্গে পুড়িয়া যায় না, সে আদিবস  
 প্রেমিকের পেমলীনতা । চণ্ডীদাসের কাব্যতাৰ চিত্রে চিত্রে—তাহাবই  
 নিজ জীবনের সত্যের অন্তর্ভূতি, তিনি ছুঃখের কবি । তিনি পেমের  
 “জগৎ” বালিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই অনন্ত পেমের মাখনা কবিয়া, তিনি  
 নিজের ইষ্টদেবকে কখনও “গোয়ামিনা” কখনও বা “নাপিতানা” মাজা-  
 ইয়া বৈষ্ণবকে বিষ্ণু ভক্তি শিখাইয়া গিয়াছেন ।

শৈশব হইতেই চণ্ডীদাসের সঙ্গীতে আসক্তি ছিল । তিনি যেমন  
 উচ্চদেবের সাধক, উচ্চদেবের কবি ছিলেন, তেমনি উচ্চদেবের গায়কও  
 ছিলেন । তাঁহাব কীর্তন শুনিলে, অতি পাষণ হৃদয় পাণ্ডও কাঁদিয়া  
 ফেলিত । চণ্ডীদাস যদি পদ বচনা কবিয়া ব্রজের গুহাতিগুহ মধুব বস  
 গীতচ্ছন্দে প্রকাশ না কবিতেন, তাহা হইলে ভক্তগণ মধুব বসের আশ্বাদ  
 বুঝিতে পারিতেন না ।

শেষ জীবনে, ১৩৯৯ শকে, মহাত্মা চণ্ডীদাস বৃন্দাবন ধামে—সমাধি লাভ  
 কবিয়াছিলেন । আজ পর্যন্ত বৃন্দাবনে তাঁহাব সমাধি বর্তমান আছে ।

বৃন্দাবনে রামীরও মৃত্যু হইয়াছিল ।

## ‘তদা কবি বিজ্ঞাপতি

( ১ )

উদ্ভাব তুণাব মণ্ডিত নগবাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে দিগু পদোদ্ভবা  
পুণ্য সলিলা ভাগীবথি, পূর্বে লোক প্রসিদ্ধ কোষিকী-ধাবা, পাশ্চিমে  
শাকব স্তম্ভাশা গণ্ডকী, এই চতুঃসীমা বদ্ধ ভূভাগ—যাহা জনক গৌতমাদি  
রাজর্ষি মহর্ষিগণের অমানুষিক লাসার কেন্দ্রস্থান—সেই অত্রভেদী  
মণিময় প্রাসাদমালা ভূষণ সমৃদ্ধিময়ী মিথিলা নগবীব মধ্যে কমলা  
নদাব তীব্রহিত গড় বিদ্যাপীগ্রাম, ভক্ত চুডামণি কবিকুল-কেশবী বিজ্ঞাপতিব  
জন্মস্থান।

বিজ্ঞাপতিব পূর্বপুরুষগণ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞান-পরিমায়,  
রাজ-সম্মানে,—একদিন এই “ঠাকুর বংশ” মণিহাবেব মধ্যমণির জায়  
উজ্জল প্রভাষ বিসম্পী গ্রাম আশোক দাপিত কবিয়াছিল। বিজ্ঞাপতির  
পিতৃদেব গণপতি ঠাকুর মহাবাজ গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন।  
তঁাহার ভাস্কর প্রতিভায় “গঙ্গাভক্তি তবঙ্গিনী” জন্ম। পিতামহ ‘জয়দত্ত’  
ধর্মপরাগতাব জন্ত ইহলোকে “যোগীশ্বর” উপাধি পাইয়াছিলেন।  
বিজ্ঞাপতির প্রপিতামহেব নাম বীরেশ্বর। বীরেশ্বর মিথিলেশ্বর  
কামেশ্ববেব বিশেষ বৃত্তিভোগী ছিলেন। তঁাহার কল্পনাগ্রহৃত “বীরেশ্বর  
পদ্ধতি” নামক গ্রন্থ অনুসাবে অত্যাধি মিথিলাগামী ব্রাহ্মণগণ দশকর্ম-  
সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই আজন্ম পুণ্যপ্রথিত বরেন্দ্র ঠাকুরবংশে,  
অনুমান ২৪১ লক্ষ্যগ সম্মতে \* বিজ্ঞাপতি ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।

\* Prof Kielhoruএর মতে ১১১৯ খঃ ৭ষ্ঠ অক্টোবর



বিদ্যাপতির বালা জীবনী জানিবার উপায় নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন চরিত জনশ্রুতির মুখে পল্লবিত। কিন্তু তাঁহার অমর কাব্যের প্রত্যেক পদাবলীতে বাজাশিবসিংহের প্রভাব বড় বেশী। এই রাজা শিবসিংহ ২৯৩ লক্ষ্মণসম্বতেব চৈত্রমাসে, কৃষ্ণপক্ষীয়া বষ্টী তিথিতে, বৃহস্পতি বাবে মিথিয়ার সিংহাসনে অভিষিক্ত হ'ন। সে সময় বিদ্যাপতিও পাণ্ডিত্য প্রভাবে—মিথিলা গোবরময়ী। বাজ্য গ্রহণের চাষি মাস পবে, রাজা এই ঠাকুরকুল তিলক বিদ্যাপতিকে আপনাব সভায় সমাদরে আহ্বান করেন। বিদ্যাপতি রাজ-সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা বুঝিলেন,—এ ব্রাহ্মণ শুধু নীরস বিতণ্ডায় অনুরাগীত কঠোর পণ্ডিত নহে, ব্রাহ্মণ দেবদুর্গত কবিত্ব বসের প্রকৃত অধিকারী। বাজা গুণীর গুণেব সম্মান পক্ষা কবিলেন, বিদ্যাপতিকে “অভিনব জয়দেব” উপাধি দিয়া, বিসপী গ্রাম দান কবিয়া, আপনাব সভাপণ্ডিতেব উচ্চপদ প্রদান করিলেন। বিদ্যাপতিও সম্রাট রাজাশ্রয়ে বাণী আরাধনাব সুযোগ্য অবসর প্রাপ্ত হইয়া কাব্যেব অকণ-রাগে বাজ সভাকে কোকনদের মত শতদশে প্রস্তুতি করিলেন।

বিদ্যাপতিও পূর্বপুরুষগণ শৈব ছিলেন। বলা বাহুল্য আশৈশব বিদ্যাপতিও কৈলাসনাথ “বাণেশ্বরকে”কে আপনাব ছদ্মবেব মন্মথমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কবিাছিলেন। তাঁহাব “শিবভক্তি” জনসমাজে তাঁহাকে দ্বিতীয় শঙ্করেরেব ত্যায় মহত্ব দান কবিয়াছিল। এমনকি প্রবাদ আছে যে, বিদ্যাপতিব ভক্তিবলে আকর্ষিত হইয়া স্বয়ং শূলপাণি মহাদেব ছদ্মবেশে বিদ্যাপতিব দাসত্ব কবিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির এক ভৃত্য ছিল, তাহাব নাম “উগনা”। একদিন এই ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাপতি স্থানান্তরে যাত্রা করেন। আতপ-তাপিত নিদ্রাঘ স্তম্ভিত ধূলি-সমাকর্ণ পথে চলিতে চলিতে বিদ্যাপতির অত্যন্ত পিপাসা পাইল, তিনি ভূষিতকণ্ঠে ভূতোব কাছে বারি প্রার্থনা কবিলেন। ভৃত্য উগনা—প্রভুর নয়নান্তরালে আত্মগোপন কবিয়া

আপনার শিবস্থিত জটাব ভিতর হইতে জল বাহির কবির প্রভুব সম্মুখে উপস্থিত কবিল । বিদ্যাপতি জনমান করিয়া বিস্মিতভাবে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ জল তুমি কোথায় পাইলে ? এ যে মন্দাকিনীর মদগন্ধিত স্নিগ্ধ, শীতল নিম্মল জল ; এখানে তো গঙ্গা নাই—তবে গঙ্গাবাব কোথা হইতে আনিলে ?” উগনা কোনও উত্তর দিল না । বিদ্যাপতিও ছাড়িবাব গান নহেন । প্রভুব সনির্ধন অনুবোধে গত্যন্তর বিহীন ভৃত্য, শেষে আপনার জটা হইতে জল বাহির কবির দেখাইল ! তখন এই ভৃত্যকে সাক্ষাৎ শব্দব জানিতে পারিয়া ভৃত্যের পাদমূলে পতিত হইলেন । ভৃত্যকপৌ শিব বিদ্যাপতির হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—“বিদ্যাপতি ! তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি । কিন্তু দেখিও—এ কথা জনসমাজে প্রকাশ করিও না, প্রকাশ হইলে আব আমি তোমার গৃহে থাকিব না ।” উগনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, বিদ্যাপতি অনেক স্তবস্তুতি করিয়া, উগনাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন । কিছুদিন এইরূপে কাটিল ।

বিদ্যাপতিব পত্নীভাগা অল্পকাল ছিল না । কথিত আছে—এই রমণী অত্যন্ত কোপন স্বভাব ও মুখবা ছিলেন ।

একদা ব্রাহ্মণী উগনাকে কোনও দ্রব্য আনিতে আদেশ করেন । প্রভুপত্নীর আদিষ্ট পদার্থ লইয়া ফিরিয়া আসিতে উগনার একটু বিলম্ব হইয়াছিল । এই তুচ্ছ অপবাধে ব্রাহ্মণী নারিমূলভ কোমলতায় বিসর্জন দিয়া, সরোষে যষ্টিহস্তে উগনাকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বিদ্যাপতি বাটতেই ছিলেন । তিনি পত্নীর পুংস্কোকেলি বিড়ম্বনী আততায়ী চীৎকার শুনিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন ; আসিয়া দেখিলেন—তঁহার রোষপরায়ণা পত্নী প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া উগনাকে লগুড়াঘাতে অর্জরিত করিয়া আপনার প্রভুকে দেখাইতেছেন । উগনার লাঞ্ছনা দেখিয়া বিদ্যাপতি ছুটিয়া আসিলেন, পত্নীর দৃঢ়হস্ত হইতে কুলিশ কঠোর

যষ্টি কাড়িয়া লইলেন ; বলিলেন,—“কি করিতেছ ? কাহার সঙ্গে  
প্রণাব করিতেছ ? উগনা সামান্য ভৃত্য নহে—উগনা সাক্ষাৎ শিব ।”  
পত্নীৰ ব্যগ্রহাবে বিজ্ঞাপতিব বৈধব্যচ্যাত ঘটনাছিল, আত্মবিস্মৃত বিজ্ঞাপতি  
উগনার পাবচয় পত্নী-পাশে প্রকাশ কবিয়া ফেলিলেন । উগনাও—  
সেই স্থান হইতে বিদ্যুৎচকিত গাণ্ডে অস্থূল হইলেন ।

উগনাশোকে উদ্ভাদ বিজ্ঞাপতি নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী বচনা করিয়া-  
ছিলেন ;—

উগনা মোর কতয় গেলা ।  
কতয় গেলা কি শিব দহু ভেলা ॥  
ভাঙ নছি বটুয়া রুসি বৈসলাহ ।  
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ ॥  
জে মোর कहতা উগনা উদেশ ।  
তাহি দেবীও কর কঙ্কলা বেশ ॥  
নন্দন বনমে ভেটল মহেশ ।  
গৌরি মন হরখিত মেটল কলেশ ॥  
বিজ্ঞাপতি ভন উগনা সো কাজ ।  
নাহি হিতকর মোর ত্রিভুৱন রাজ ॥

( ৩ )

তরুণ বয়সে বিজ্ঞাপতি “কীৰ্ত্তিলতা” ও “কীৰ্ত্তিপতাকা” এই দুই  
খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । তিনিই সৰ্ব্ব প্রথমে স্মমধুব মৈথিলি  
ভাষায় কাব্য রচনা কবেন । তাঁহাব “পুরুষ পরিকা” প্রভৃতি বহু  
গ্রন্থ—সাহিত্য জগতের জ্যোতিৰ্ম্ময় নক্ষত্র ।

বঙ্গদেশে বিদ্যাপতি বৈষ্ণবধর্মী বলিয়া পরিচিত । কিন্তু মিদিল্লার তাঁহাকে সকলেই শৈব বলিয়া ডানে । জয়দেবের যেমন কান্ত-পদাবলী মুরলীর প্রেম নিম্ননে বিদ্যাপতির শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল । কৃষ্ণ লীলার আশ্বাদ পাইয়া বিদ্যাপতির কচি হৃদয় ভাব মুগ্ধ হইয়া পড়ে । এই সময় হইতেই তিনি রাধাকৃষ্ণ ১২ অদ্বেষণ করেন । তাঁহার কৃষ্ণ লীলা বিসয়ক পদাবলী—এ সময় চুঁচুটেই প্রেম মাহিমায় মণ্ডিত হইয়া জন-সমাজে প্রাণী লাভ করে । বিদ্যাপতির করুণ রসান্ধিষিক্ত আশ্রিত-তায় পরিপূর্ণ পদাবলী শুনিয়া—একদিন প্রেমানতার শ্রীচৈতন্য দেবও দিখোয়াদ হইয়াছিলেন । এতদপেক্ষা তাঁহার পদাবলীর প্রশংসা আর কি হইতে পারে ? বিদ্যাপতি-পদাবলী—লালসা বিবহে ভ্রম্য হইয়া বৈষ্ণবগণের ধমনীতে শ্রোতের মত তরল প্রেম মিশাইয়া দিয়াছিল । সে পদাবলী বুঝি পৃথিবীর নহে,—অপ্সরার চরণ সিক্তিতের গুঞ্জনমিশ্রিত স্বর্গীয় সজীবনী সুবায় অভিষিক্ত,—দেবেশ্বরের প্রসাদে প্রফুল্ল !!

বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ । বৈষ্ণবগণ—তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি বৈষ্ণবদিগের গুরুস্থানীয় হইয়াও বামন ও “বৈষ্ণবদ্বের” গোড়ামী করেন নাই । প্রকৃত ধার্মীকের মত তিনি হরি হরকে অভিন্ন ভাবিতেন । সে মত হৃদয়ে—ভেদ জ্ঞানের লঘুতা কখনও স্থান পায় নাই । তাঁহার নিম্নলিখিত পদটাই তাহার প্রমাণ ;—

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা ।

খন পীত বসন খনহি বঘছা ॥

খনে পঞ্চানন খনে ভুজচারি ।

খন শঙ্কর খন দেব মুরারি ॥

খন গেকুল ভএ ভরাবথি গায় ।  
 খন ভিখ মাগিয়া ডমরু বজায় ॥  
 খন গোবিন্দ ভএ লিয় মহাদান ।  
 খনহি ভসম ভরু কাঁধ বোকান ।  
 এক শরীর লেল ছুই বাস ।  
 খনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাস ॥  
 ভনই বিজ্ঞাপতি বিপরীত বাণী ।  
 ও নারায়ণ ও শূলপাণী ॥

( ৪ )

বিজ্ঞাপতির বহু পদের ভনিতায় শিব সিংহ ও তাঁহার পত্নী লছিমা দেবীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । তাহার পব “চণ্ডীদাস ও বামীর সহজ সাধনের মহিমার সাধারণেই তখন “রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বে” নায়ক নায়িকার ইন্দ্রিয় বিলাসের আনন্দ পাইয়াছিলেন । এই সময়ে বিজ্ঞাপতির পদে—নায়িকা সন্ধি সম্ভাষণ শুনিয়া লোকে লছিমা দেবীর প্রতি বিজ্ঞাপতির প্রেমাসক্তি কল্পনা করিয়াছিল । শুধু কল্পনা নয়, এমনকি হলাহল-প্রেমবিনী খেলের জিহবা—এই ঘটনায় বাজা শিবসিংহের আদেশে বিচারপতির শূলদণ্ডে মৃত্যুসংবাদ রটনা কবিত্তেও ছাড়ে নাই । কিন্তু জনবব সম্পূর্ণ মিথ্যা । রাজা শিবসিংহের মৃত্যুর পর ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপতি জীবিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ।

তবে এ কলঙ্কের মূল কি ? বিজ্ঞাপতি, শিবসিংহের আশ্রিত ছিলেন । সর্বজীবে স্নেহশীল সাধবী লছিমা দেবীকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করিতেন । রাজা ও রাণী মধুব বসাস্থিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন, বাজাজায় বিজ্ঞাপতি সজ্জীত রচনা

করিতেন । রাজদম্পতি অন্তঃপুরে বিশ্রাম-সুখ কামনায় উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্ত সঙ্গীত-রসিকা পুরন্ধিগণ সেই সকল পদাবলী গান করিত । এই কারণে পদাবলাতে কবি অপূর্ব কোশলে রাজা ও রানীর নাম সংযুক্ত করিয়া দিতেন । সাধারণ লোকে কবি কোশলের মৰ্ম্ম না বুঝিয়াই—বিজ্ঞাপতির সঙ্গীতে মদন বিকারের বিকট গন্ধ অনুভব করিয়াছিল ।

( ৫ )

মিথিলায় প্রবাদ আছে,—একবার রাজা শিবসিংহ সম্রাটের কোপে পতিত হইয়া দিল্লীতে বন্দী হ'ন । রাজার সঙ্গে রাজকবি বিজ্ঞাপতিও দিল্লীগমন করিয়াছিলেন । রাজাকে সম্রাট্ বন্দী করেন ; বিজ্ঞাপতির অপূর্ব কবিত্বময়ী সঙ্গীত শুনিয়া দিল্লীস্থর শিবসিংহকে মুক্তিদান করিয়া-ছিলেন ।

বিজ্ঞাপতির পুত্র ও কন্যা হইয়াছিল । পুত্রের নাম হরপতি । ৩২৯ লক্ষ্মণ সম্বতে, কার্তিক মাসের শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে কবিরাজ রাজ-মুকুট বিজ্ঞাপতির লীলা অবসান হয় । প্রফুল্লমুখে আত্মীয় স্বজনদের কাছে অন্তিমবিদায় লইয়া, কুলদেবী বিশ্বেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া জীবনের সায়াহ্নে, গঙ্গাভীরে সজ্জানে বিজ্ঞাপতি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ।

\*

\*

\*

\*

বাজিতপুরের যেস্থানে বিজ্ঞাপতির মৃত্যু হইয়াছিল, সেস্থানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কবির বংশ এখনও সৌরাট্ প্রদেশে বর্ত্তমান আছে । কবিকে রাজা শিবসিংহ যে বিসপী গ্রাম দান করিয়াছিলেন, ১২৫৭ নালে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেন্ট অধিকার করিয়াছেন ।

# প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য

( ১ )

আত্মার সহিত পবমাত্মার যে ঘনিষ্ঠ সন্ধন্ধ, সে সন্ধন্ধ স্ত্রী-পুরুষের সন্ধন্ধ ব্যতীত আর কিছুই অল্পরূপ হইতে পারে না। যোগের সেই ঘনিষ্ঠ সন্ধন্ধ রাধাকৃষ্ণ লীলায় প্রকাশ। রাধা প্রকৃতির পরমতত্ত্ব, কৃষ্ণ পুরুষের রূপ; প্রকৃতি-পুরুষের আসক্তির নাম—রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। সংসারের কুটিলতা ও মায়া হইতে আত্মা যখন পরিত্রাজিত হ'ন—তাহার নাম ব্রজভাব। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বরীর মিলন—বৃন্দাবন ধামে! যতদিন আত্মার সংসার-বীজ সমস্ত না নষ্ট হয়, ততদিন আত্মার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই সংসারিকতা নির্বাণের জন্তই কৃষ্ণ-বিরহ।

পুরুষ প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ ভাবই জগৎসংসার। জগতেই উভয়ের আসক্তি, বিচ্ছেদেই উভয়ের মুক্তি। রাধার শত বৎসরের বিচ্ছেদে—জীবাত্মার শত বৎসরের অনাসক্তিতে—মুক্তির আবির্ভাব! যোগের এই নিগূঢ় তত্ত্ব এক একটা করিয়া অবয়বী কল্পনায় কৃষ্ণলীলায় মূর্তিমান! যোগের জীবাত্মা পরমাত্ম-তত্ত্বের সমস্ত স্তরই কৃষ্ণলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়। কথাকাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি;—

কৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন তিনি সাংখ্যের উদাসীন পুরুষ, প্রকৃতিতে অনাসক্ত, তখন তিনি জগতের হিতকারী। প্রজ্ঞাপালনরূপে গোপালনে কৃষ্ণ, সংসার-গোষ্ঠে বিহার করেন। নন্দ-যশোদার স্নেহানুরাগে শ্রীহরি শ্রীর নবনীতে হৃষ্ট, তার পর রাধার প্রেমানুরাগে—হৃদয়ের উৎকৃষ্ট উপহার ফুলচন্দনে চর্চিত। পাঠক মহাশয়! ব্রজলীলার উপাখ্যানগুলি

স্বরূপ করুন । বাৎসল্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্রিত হইয়া অনুরাগে প্রগাঢ়তর, সেই অনুরাগ আবার রাধার প্রেমে প্রগাঢ়তম । যে অনুরাগ সংসার মায়া উপর বিজয়ী, সেই অনুরাগ রাধার অনুরাগ, সেই অনুরাগ যোগীর ঈশ্বরানুরাগ । এই অনুরাগের ক্রম ক্ষুদ্রিতি যোগতত্ত্বে অনুভব করা যায় ।

প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ, জ্ঞী-পুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অনুরাগে—কিরূপে রাধাকৃষ্ণলীলায় পরিণত হইয়াছিল, উপরে সংক্ষেপে তাহা বুঝাইলাম । বৈষ্ণবের হৃদয়, প্রেমে, অনুরাগে, উচ্ছুসে পরিপূর্ণ । বৈষ্ণব রাধার প্রেমাদর্শে আপনার হৃদয় গঠিত করেন, কৃষ্ণের জুগুলালিত হন, ভক্তের অনুরাগ ভালবাসেন । রাধা মানবপ্রকৃতির পরমেশ্বরী । রাধা—রাধার অমামুষ দেবতুল্য প্রেম—বৈষ্ণবের জপমালা । বৈষ্ণব সংসারের সকল সুখ বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জীবনকে কৃষ্ণপ্রেমে উৎসর্গ করেন । বৈষ্ণবের ভক্তি প্রথমে জয়দেবের পদাবলীতে উচ্ছুসিত হইয়াছিল ।

বৈষ্ণবানুরাগের বাসস্তি বিকাশ—বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাস । প্রেমের উল্লাস, প্রেমের মুগ্ধতা—কৃষ্ণলীলাচ্ছলে ততদিন বঙ্গদেশকে মুগ্ধরিত করিয়াছিল । সেই মুগ্ধরিত কুসুম—শ্রীমতী রাধা সুন্দরী । রাধার অনুরাগ, ঐকান্তিকতা, উন্মত্ততা, মধুরতা—আত্মহারা জয়দেব পদ্যাবলীতে দেখিয়াছিলেন, প্রেমিক বিজ্ঞাপতি লছিম দেবীতে কল্পনা করিয়াছিলেন । মাতোয়ারা চণ্ডীদাস রামমণি রজকিনীতে উপভোগ করিয়াছিলেন ।

ভক্তি—ভগবানের আদরের জিনিষ । সেই আদরেই রসময়ী কল্পনা—মান । প্রেমের সহিত প্রেম আকৃষ্ট হইবে বলিয়া—শ্রীমতী মালিনী । প্রেমের পরিপুষ্টি সাধনের বিশিষ্ট উপায়—বিরহ । জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিজ্ঞাপতি বিরহে বড় উন্মত্ত । এই তন্ময়তা কিন্তু সাধারণে বুদ্ধি নাই ।



তাহারা রাধাকৃষ্ণ লীলার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেখিতে পাইল। রাধার হৃদয়োচ্ছ্বাসে শ্রামাবির্ভাবের স্বপ্নচিত্র—মানবলীলার প্রেমে পরিণত হইল। রাধাকৃষ্ণের লীলা অসংখ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ—নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি করিল।

তান্ত্রিকগণ আবার মাথা নাড়া দিয়া উঠিল। লোকে ঘোর কল্পনার প্রাহেলিকার মধ্যে নিপতিত হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাধি পূর্ণ বিকারের বিভীষিকাময়ী মূর্তি ধারণ করিল! মধুর ভক্তিতত্ত্ব—নারদ গর্গাদি মহাজ্ঞানীর কথা ছাড়িয়া দাও, গোপিকাগণও যে ভক্তির অমুবর্তিনী হইয়া তরিয়া গিয়াছিল, সেই ভক্তিতত্ত্বও বিকৃত বুদ্ধি নরনারীর কাছে উপেক্ষিত হইয়া পড়িল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিতের অভাব ছিল না, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কাজেই শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি সূদৃঢ় হইল না।

ইহার কারণ বৈষ্ণবগণ বৈদিক ঋষিরপরিতর্পণ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া ভক্তিলভ করিতেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও কর্মকে ঘৃণা করিতেন। তাহার ফলে বৈষ্ণব সমাজের সর্বনাশের সূচনা হইল। পণ্ডিতগণ রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বকে দীর্ঘরের পরিতর্পণ মনে করিতেন। অশিক্ষিত বৈষ্ণবগণ ‘সহজ ভজন’ পন্থায় নারীসঙ্গ করিয়া সেই সন্দেহকে জনসমাজে সত্যে পরিণত করিল।

বৈষ্ণবদের এই দুঃসময়ে বঙ্গ সমাজের বৃহৎ ধর্মশিক্ষার মন্দিরে, ভক্তির বিকট বিকাশ বুঝাইবার জন্ত, ধর্মসঙ্কটের নিবিড় তিমিরে, ভক্তবীর চৈতন্তচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের মত দিগ্বাঙল উদ্ভাসিত করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ তীর্থে উদ্ভিত হইলেন!

( ২ )

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে, জ্যোৎস্না মধুর গৌর্ণমাসী তিথিতে, ব্রিহ্ম নীলাকাশে ষোল কলার পূর্ণ শশী আনমনে রূপের বাজার খুলিয়া বসিয়াছিলেন।

গগণ-নিকুঞ্জে সেদিন চাঁদের যেরূপ অপূর্ব শোভা হইয়াছিল, তেমন শোভা বুঝি আর কখনও হয় নাই ! তাই রূপ লুক্ক, চিরকুর বুদ্ধি, দৈত্যধর্মী রাহু লোভ স্বরণ কবিতেনা পারিয়া, ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধিয়া সেই অমল ধবল জ্যোতিঃ শুধাংশু দেবকে গ্রাস করিতে উগ্রত হইল ! তখন তিমিরাঞ্চলা সন্ধ্যা স্তন্দরী অভিসারিকার বেশে মাটীতে ধীরে ধীরে পদার্পণ করিতেছিলেন ।

ঠিক এই সময়ে সিংহলগ্নের শুভ মুহূর্ত্তে নবদ্বীপের এক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রেমাবতার চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন ।

চৈতন্যের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচীদেবী । এই রূপ জনশ্রুতি আছে যে, চৈতন্যদেব ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে থাকিয়া চন্দ্র-গ্রহণের সময় ভূমিষ্ট হন । অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয় হইল বলিয়া, সকলঙ্ক আকাশের চাঁদকে রাহু বুঝি সেদিন গ্রাস করিয়াছিল ।

চৈতন্যদেবের অসামান্য রূপলাবণ্য ও দেবশ্রী দেখিয়া, পাড়া প্রতিবেশীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল । শিশুর দেহে “কঁাচা সোণার মত” গৌর-কান্তি দেখিয়া এবং ঐ শিশু রোক্তমান অবস্থার “হরিনাম” শুনিয়াই হাসিয়া উঠিত বলিয়া, কামিনীগণ তাহার নাম রাখিল—“গৌরহরি ।” ডাকিনী যোগিনীর দৃষ্টির ভয়ে মাতা নাম রাখিলেন—“নিমাই ।” চৈতন্যের মাতামহ নবদ্বীপের তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ নীলাধর চক্রবর্ত্তী শিশুর নাম রাখিলেন—“বিশ্বস্তর ।”

এই তিন নামেই চৈতন্যদেব বিখ্যাত হইয়াছিলেন । যে শিশু যত আদরের, তার নামও তত বেশী । চৈতন্য বাপ মার আদরের ছেলে ছিলেন । শচী দেবীর উপর্যুপরি ৮টা কন্যা ভূমিষ্ট হইয়াই মরিয়া গিয়াছিল । আট মেয়ের পর, একছেলে হয় “বিশ্বরূপ,” বিশ্বরূপের পর এই দেবের জন্ম । কোলের ছেলেটির উপর মাতার মমতা কিছু অধিক পরিমাণেই হইয়া থাকে । তাই চৈতন্যকে শচী দেবী চ'থের আড় করিতেন না ।

## জীবন-চিত্র।

( ৩ )

চৈতন্যের ‘বাল্যলীলা’ অতি অদ্ভুত ! স্বভাবের ধর্ম, জনশ্রুতি সেই অদ্ভুতকে বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত করিয়া পল্লবিত করিয়া তুলিয়া-ছিল।

ষষ্ঠমাসে চৈতন্যের ‘অন্নপ্রাশন’ হয়। অন্নপ্রাশনের দিন বালককে অনেক দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেই সকল দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে একখানি “শ্রীমদ্ভাগবত” গ্রন্থও ছিল। চৈতন্য সকল দ্রব্য ছাড়িয়া সেই গ্রন্থখানি লইয়াই খেলা করিলেন। ছয় মাসের ছেলেব কাণ্ড দেখিয়া শচী দেবী, মিশ্র মহাশয় এবং প্রতিবেশীগণ সকলেই অবাক হইলেন। এই ঘটনা তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন ও কোতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

শচী মাতার সুন্দর শিশু গুরু পক্ষের শশীকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বালকের ‘দ্রবস্তপনাও’ দেখা দিল। গ্রামবাসীদের গৃহে গিয়া চৈতন্যদেব বড়ই উৎপাত করিতেন। গোকুলের সেই গোপ শিশুটার মত, শচীমাতার সম্ভানের স্নেহের আবদার, প্রীতির উৎপাত, ভালবাসার অত্যাচার অহর্নিশি সহ করিয়া প্রতিবেশীগণ একদিকে বিরক্ত ও রুষ্ট এবং অপর দিকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইত।

ক্রমে অত্যাচারের মাত্রা আরও একটু বৃদ্ধি হইল। চৈতন্য বলিতে লাগিলেন তিনি ঈশ্বর ! জাহ্নবীর সৈকত পুলিনে কুলনারীগণ যখন পুষ্পচন্দনে ইষ্ট সাধনা করিতেন, চৈতন্য সেই সময়ে গিয়া বলিতেন “তোমরা আমার পূজা কর।” শুধু ইহাই নহে, লোকের দেবার্চনার উদ্দিষ্ট দ্রব্য কাড়িয়া থাইতেন। বিরক্ত হইয়া সকলে শচী দেবীর কাছে শিশুর দোয়ায়োর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মাতা বালককে শাসন করিতেন, অন্তরে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ঘাট্ ঘাট্ বলিয়া শিশুকে কোলে তুলিয়া মেহমধুর বচনে কত বুঝাইতেন।

একদিন একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের বাটিতে আতিথা স্বীকার করেন । শচী দেবী ও মিশ্র অতিথির আহ্বারের উত্তোগ করিয়া দিলে, ব্রাহ্মণ অন্ন প্রস্তুত করিয়া মৃদিত নয়নে সেই ঘৃতান রাশি ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করিলেন । তাহার পর যেমন আহ্বার করিতে যাইবেন, অমনি দেখিলেন—মিশ্রের শিশুপুত্র শান্ত স্ত্রবোধটীর মত সেই নিবেদিত অন্নগ্রাস ধীরে ধীরে মুখে তুলিতেছেন । ব্রাহ্মণ মিশ্রকে এ ঘটনা জানাইলেন । পুত্রকে তিরস্কার করিয়া আবার অতিথির আহ্বারের উত্তোগ করিয়া দিলেন । দ্বিতীয়বার অন্ন প্রস্তুত হইল । সে অন্ন ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবার পূর্বে অতিথি দেখিলেন—সেই ছুট বালক আবার তাহা উচ্ছিষ্ট করিতেছে । এইরূপে তিন বার অন্ন প্রস্তুত হইল, তিন বারই চৈতন্য তাহা উচ্ছিষ্ট করিলেন । শেষে ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন এ বালক সাধারণ নহে । তাঁহার ইষ্টদেবতাই এই বালক গোপালের বেশে অন্নভোজন করিতেছেন ! তখন ব্রাহ্মণ চৈতন্যের স্তবস্তুতি করিয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন ।

আর একদিন শচীদেবী পূজা করিতে আসিয়া দেখিলেন, চৈতন্য ঘরের শালগ্রামগুলিকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং ঠাকুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ! বালকের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া শচীদেবী তিরস্কার করিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কি এক আকর্ষণী শক্তিগুণে মুগ্ধ হইয়া শচীদেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন !

চৈতন্যের ঐশ্বরিকতার অভ্যাসে শচীদেবী ও মিশ্র মহাশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । তাঁহারা চৈতন্যকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না, চৈতন্যও কাহাকে ভয় করিতেন না । কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে চৈতন্য নীরবমুখে শাস্তভাবে ধারণ করিতেন । বিশ্বরূপও অমুজের অলৌকিক কার্যাবলীর পরিচয় পাইয়া, কেবল বিস্ময় স্তিমিত নেত্রে চৈতন্যের পানে চাহিয়া থাকিতেন ।

এইরূপে কাহাবও ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া, কাহারও খাড়া লইয়া পলায়ন করিয়া, কাহারও কোন দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়া, কোন প্রাত্যহিক বহু বিভ্রাটের মধ্য দিয়া চৈতন্যের স্নকুমার শৈশব অতীত হইয়াছিল। শিশুর দৌরাণ্ডো উৎপীড়িত জনমণ্ডলীক কাছে শচীদেবী কেবল ক্ষমা চাহিতেন, কাহাকেওবা মিষ্ট কথায় পুত্রের অপরাধ মার্জনা করিতে অমুরোধ করিতেন।

এই চটুল চতুৰ শৈশবে, কালনাদিনী জাহ্নবী পুলিনে বহ্নভাচার্য্যের হুহিতা লক্ষ্মীদেবীর সন্তিত চৈতন্যের বালাপ্রেমের সঞ্চার হয়।

যথাসময়ে মিশ্রমহাশয় পুত্রের বিদ্যা শিক্ষাব ব্যবস্থা করিলেন। বিখ্যাত বৈয়াকরণিক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট চৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইল। চৈতন্যের অলোকসামান্য প্রতিভার পবিচয় পাইয়া, গঙ্গাদাসের আব বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহাব কিছুদিন পূর্বেই চৈতন্যের অগ্রজ সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্ন্যাসীক সঙ্গ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। বিধ্বংস ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। চৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষার অসাধারণ অভি-নিবেশ দেখিয়া শচীদেবী ও মিশ্র মহাশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাহাদের ভয় হইল—নিমাই হয়তো সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে। জনক জননী পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধক হইলেন। কিন্তু চৈতন্য কোন বাধাই গ্রাহ্য করিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই লোকে শুনিল—মিশ্র ঠাকুরের সেই দুরন্ত ছেলেটি এক মণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাসুদেব সার্কভৌম নামক এক অধিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বাপের নিকটস্থ বিদ্যা নগর গ্রামে এক চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। চৈতন্য এই টোলের সৰ্ব্বপ্রধান ছাত্র-রূপে পরিগণিত হন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি চৈতন্যদেব আপনার অসাধারণ প্রতিভার ভাস্বর মহিমায় কাব্য, সাহিত্য, ন্যায়, শ্বতি, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি সৰ্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

( ৪ )

চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বকপ উদাসীন বেশে গৃহ পবিত্যাগ করিলে, মিশ্রচারু ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যের ছাত্রাবস্থাতেই পুত্রবিয়োগবিধুব জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হইল। সংসারানভিজ্ঞ চৈতন্য পিতৃবিয়োগে বড়ই বিপন্ন হইলেন। চৈতন্যের সে বাল্যস্বভাবমূলত ঢাংল্য তপনোদয়ে কুজ্জটিকাব ন্যায় সহসা তীব্রোহিত হইল, শোকাতুরা নাতাকে তিন শান্তগন্তীর ভাবে সাস্তুনা করিতেন। স্বামীহীনা অসহায় বৈধবা চৈতন্যের আশ্বাসবচনে বজ্রদণ্ড বলবীর মত সংসারে বাস করিতে লাগিলেন।

মাতার মলিনমুখে অভয়ের অভিযাজনা দেখিয়া গৃহকারণের প্রতি চৈতন্যের দৃষ্টি পতিত হইল। চৈতন্য বুঝিলেন সংসারধর্ম পালন করিতে হইলে সহধর্মিণীসহ সাহায্য চাই। শচীদেবীও পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। পুত্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শচীদেবী চৈতন্যের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন।

শুভদিনে, শুভক্ষণে বনমালী ঘটকেব মধ্যাহ্নভায়ে, চৈতন্যের সেই শৈশবসঙ্গিনী ধর্মপবায়ণ বলভাচার্য্যের স্ত্রীদেবী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে চৈতন্যের শুভ পরিণয় সম্পাদিত হইল। চৈতন্য গৃহস্থ হইলেন। সংসারের নানা অসঙ্গতাব মধ্যেও পুত্রের বিবাহব্যাপার সম্পন্ন করিয়া, শচীদেবীর মনে নিমায়ের সংসারত্যাগরূপ ভাবী বিপদের আশঙ্কা জনিত উৎকর্ষা একবকম দূর হইয়া গেল। ধৈর্য্যের দৃঢ়বন্ধনে বুক বাঁধিয়া, শচীদেবী পুত্র পুত্রবধূকে লইয়া আবার সংসার করিতে লাগিলেন।

( ৫ )

সংসার করিতে গেলে অর্থ চাই। বিবাহের পর বাধ্য হইয়া চৈতন্য বাটীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। অন্নদিনের মধ্যেই তাঁহার অধ্যা-

পনার যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল। নানা দিগ্দেশ হইতে ছাত্রমণ্ডলী আসিয়া চৈতন্যের চতুষ্পাঠীর শোভা বর্দ্ধন করিল। এই নবীন যুবকের শাস্ত্রজ্ঞান গরিমার কথা শুনিয়া, অনেক পণ্ডিত চৈতন্যেব সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সে সর্বতোমুখী প্রতিভার কাছে লজ্জায় অধোবদন হইয়া পলাইবার পথ পাইলেন না। অচিরে ‘দিগ্বিজয়ী’ গৌরবে চৈতন্যের জয় ছন্দুভি ঘোর রবে বাজিয়া উঠিল। সমাজে তাঁহাব অতুল প্রতিপত্তি জন্মিল। স্বর্ণ, বোপা, বস্ত্র, তণ্ডুল, তৈজসাদি বিবিধ উপহারে চৈতন্যের ক্ষুদ্র কুঠীর পূর্ণ হইতে লাগিল। চৈতন্য আদর্শ গৃহীর ন্যায় দীন দরিদ্রের প্রতিপালন, এবং অতিথি অভ্যাগতের সৎকার করিয়া, শচীদেবীর সাধের সংসারে দেবতার আশীর্বাদ বহিয়া আনিলেন।

গৌরাঙ্গের পত্নী লক্ষ্মী দেবী ধর্ম্মনিষ্ঠায়, শ্রদ্ধাসেবায়, পতিভক্তিতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবিয়া স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া নারীধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

একদিন গঙ্গাপার হইবার সময়, নৌকায় এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে চৈতন্যের আলাপ হয়। চৈতন্যের হস্তে একখানি পুঁথি ছিল। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ওখানি কি পুঁথি?” চৈতন্য উত্তর দিলেন—এখানি ন্যায়-শাস্ত্রের টীকা, আমি রচনা করিয়াছি।” ব্রাহ্মণ ঐ পুঁথির কিয়দংশ পড়িতে বলিলেন। চৈতন্য পাঠ করিতে লাগিলেন, পাঠ শুনিতে শুনিতে ব্রাহ্মণের মুখ বিষাদ কালিমায় একেবারেই ম্লান হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিয়া ফেলিলেন—“আমার সর্ব্বনাশ হইল! আমি বহু বর্ষ ধরিয়া, বহু পরিশ্রম করিয়া একখানি টীকা রচনা করিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইল। আপনার ও টীকার নাম শুনিলে কেহই আমার টীকা গ্রাহ্য করিবে না।” ব্রাহ্মণের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া সহাস্যবদনে চৈতন্য কহিলেন,—“ইহার জন্য আর চিন্তা কি?” ব্রাহ্মণের বিষম উজ্জিক্ত করিয়া চৈতন্য সেই সঘণ্টরচিত অপূর্ব পাণ্ডিত্য-

ময়ী ঢাকা তরঙ্গসকল জাহ্নবীর জলে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিলেন । এই অপূর্ব উদারতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দেখিয়া, ব্রাহ্মণের হুই গণ্ড বহিয়া কৃতজ্ঞতা অশ্রুবিন্দু বরিয়া পড়িল ।

ইহার পর চৈতন্যদেব শিষ্যমণ্ডলী সহ পূর্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে গমন করেন । তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বৎসর ।

তিনি যে দেশে গমন করিতেন, তদ্দেশবাসিগণ তাঁহাকে সুপণ্ডিত জানিয়া অভ্যর্থনা করিত । তাঁহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া কৃতার্থ হইত । অনেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র প্রভৃতি বহুমূল্য উপহার লইয়া নিমাই পণ্ডিতের একটা মুখের কথা শুনিবার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিত ।

চৈতন্য যখন পূর্ববঙ্গে, তখন তাঁহার গুণবতী সহধর্মিণী কালগ্রাসে পতিত হইলেন । এই মৃত্যুর কারণ—স্বামী-বিরহ । কেহ কেহ বলেন সর্পাঘাতেই লক্ষ্মীর মৃত্যু হইয়াছিল ।

( ৬ )

ভক্তের ভক্তি উপহার, বহু দ্রব্য সম্ভার লইয়া চৈতন্যদেব গৃহে প্রত্যাগত হইলে, শচীদেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন । মাতৃ-কণ্ঠের মর্ম্মভেদী আর্তনাদ চৈতন্যকে লক্ষ্মীদেবীর অকালমৃত্যুর কাহিনী জানানীয়া সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিল । লক্ষ্মীশোকে চৈতন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন । কিন্তু সে শোক বাহিরে প্রকাশ পাইল না, অন্তরে অরুন্দ্ভদ যন্ত্রণা লইয়া চৈতন্য মাতাকে বঝাইলেন—“মরণং প্রকৃতি শরীরীণাং” ।

লক্ষ্মীর বিরহ-জালা জুড়াইবার জন্য চৈতন্যদেব দ্বিগুণ উৎসাহে ছাত্রমণ্ডলীর অধ্যাপনায় ব্যাপৃত হইলেন । কিন্তু মাতৃসকাশে পুত্র-হৃদয়ের অন্তগূঢ় মর্ম্মব্যথা অগোচর ছিল না । চৈতন্যের প্রতিকার্যেই শচীদেবী নৈরাশ্রের ছায়া দেখিতে পাইলেন । শেষে শচীদেবী আপনি



উজ্জোগ করিয়া সনাতন পণ্ডিতের আদরিণী চুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া সহিত চৈতন্যের আবার বিবাহ দিলেন। নববধূ পুষ্পপেলব সৌন্দর্য্যে শচী দেবীর আধার গৃহ আবাব উজ্জল হইয়া উঠিল।

ছাত্রগণের অধ্যাপনায়, পণ্ডিতবর্গের সহিত বাদ-বিতণ্ডায়, বহুবিধ শাস্ত্র আলোচনায় লিপ্ত থাকিয়া, চৈতন্য আবার সংসারবাত্তা নিকাহ করিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীচৈতন্য কৌমুদী বিভাসিত ফুল্ল রজনীতে শিষ্যবর্গসহ জাহ্নবীতটে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৌরাক্ষকে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই পণ্ডিত পুরুষ যুবক গৌরাক্ষের তর্কতবঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। পণ্ডিতের দুর্দশা দর্শিয়া শিষ্যগণ হাসিয়া উঠিল। গৌরাক্ষ তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন, দাস্তিক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে অপমানিত দেখিয়া নিজেই কুণ্ঠিত হইয়া বিনয়নম্র-বচনে তাঁহার অনেক প্রশংসা করিলেন। হতগর্ব্ব দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৌরাক্ষের বিনীত ব্যবহারে আরও লজ্জিত হইলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয়বার্ত্তা অচিরে পণ্ডিত সম্প্রদায়ের কর্ণগোচর হইল।

জ্ঞান গরিমায়, কূটতর্কের প্রভাবে, চৈতন্য জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও মনে শান্তি পাইলেন না। তিনি আনন্দের অনন্ত উৎসের সন্ধানে লালায়িত হইয়া পড়িলেন। মাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, বিদ্যার গৌরব, সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি প্রাণের ভিতর কিসের অভাব অনুভব করিয়া দাবদগ্ধ কুরঙ্গের মত ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; চতুর্দিক হইতে অশান্তি আসিয়া চৈতন্যের ব্যাকুল আত্মাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

মনের এই বিপর্য্যয় অবস্থায় চৈতন্যদেব শিষ্যগণের সহিত পবিত্র গঙ্গাধামে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য—পিতৃলোকের সদগতির জন্ত বিষ্ণু

পাদ-পদ্মে পিণ্ডদান করিবেন । এই স্থানেই তাঁহার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল । চৈতন্য গয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবা মাত্র দেখিতে পাইলেন, শত শত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গদাধরের পাদপদ্ম পরিবেষ্টন পূর্বক ভক্তি ভরে পূজা কবিতোছেন ! এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া চৈতন্যেব হৃদয়েও ভক্তি প্রসবনের দাব উদ্ঘাটিত হইল । একটা কথা বলিতে ভুলয়াছি, পাণ্ডিত্যের নিদারুণ অভিমানে ইদানীং চৈতন্যদেব নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন । গয়াধামে আসিয়া তিনি হৃদয়ের অন্তস্থলে কি এক অভূতপূর্ব, অনাস্বাদিত পূর্ব, বিমল আনন্দ উপলব্ধি কবিলেন । যে বিষ্ণু পাদ পদ্মে শত সহস্র লোক আসক্ত, সেই বিষ্ণুকে পাইবার জন্য চৈতন্য ব্যাকুল হইলেন । বিষ্ণু পাদপদ্ম হইতে উন্মুক্ত ভক্তির উৎস চৈতন্যের বিশাল বক্ষ প্রাবিত করিল ।

গয়াক্ষেত্রে—কুমার হট্ট ( হালিসহর ) নিবাসী বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে চৈতন্যের পরিচয় হইল । ঈশ্বর পুরী—ভক্তিপরায়ণ মাধবেন্দ্র পুরীর একজন প্রধান শিষ্য । এই নিঃসঙ্গ বৈরাগীর পবিত্র হৃদয়ে,—চৈতন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির সুপন্থা দর্শন করিলেন । ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে হৃদয়স্পর্শী প্রেমবার্তা শুনাইয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন । ঈশ্বর পুরীর নিকট পবিত্র দশাঙ্কর মন্ত্রলাভ করিয়া চৈতন্য বিষ্ণুপদে জীবন উৎসর্গ করিলেন ।

কৃষ্ণপ্রেম চৈতন্যকে উন্মত্ত করিল । মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভাব বিহ্বল চৈতন্য কিন্তু প্রেমাক্বেশ, ব্যাকুল বিরহে, আত্মহারা হইয়া উঠিলেন । শিষ্যগণ বহুকষ্টে চৈতন্যকে লইয়া ঘরে ফিরিল । এই সময় চৈতন্যের বয়স দ্বাবিংশ বৎসর মাত্র ।

( ৭ )

অভিমান, পাণ্ডিত্য গর্ব, জ্ঞান গরিমা—সকল বিসর্জন দিয়া চৈতন্য নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন । লোকে দেখিল—নিমাই পণ্ডিতের সে

শাস্ত্রাভিজ্ঞতার উজ্জলমূর্তি, তর্কপ্রিয়তার জীবন্ত উচ্ছ্বাস—সমস্তই একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে !

দেশ প্রত্যাগত চৈতন্তের সঙ্গে অনেকেই সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। চৈতন্ত সকলের সঙ্গেই দৈন্ত্যতার বিনয় সম্ভাষণ করিলেন। এইবার নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। চৈতন্তের নয়নে প্রেমাক্ষ, দেহে প্রেমাবেশের কম্পন, জীবনে অসামান্য ভক্তির লক্ষণ, হৃদয়ে অভূতপূর্ব ভাব সমষ্টি দেখিয়া বৈষ্ণবগণ বুঝিলেন—নিমাই পণ্ডিতের জীবনে বিহ্বলতা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। পুত্রের উন্মাদাবস্থা, নির্জন প্রিয়তা, আকুল রোদন প্রভৃতি সাম্বিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া শচীদেবী চৈতন্তকে ব্যাধিগ্রস্ত ভাবিলেন। তিনি পুত্রের আরোগ্য প্রার্থনায় ঠাকুর দেবতার চরণে ‘মানসিক’ করিতে লাগিলেন।

চৈতন্তের বৈষ্ণব মন্ড্রে দীক্ষায় আনন্দ প্রকাশের জন্ত একদিন শুক্লাশ্বরের গৃহে বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইলেন। ভক্ত বৃন্দের মধ্যস্থলে ভাব বিভোর গৌরচন্দ্রেরও আবির্ভাব হইল। “কৃষ্ণ কোথায়?” বলিতে বলিতে বাহুজ্ঞান শূন্য চৈতন্ত শুক্লাশ্বরের গৃহের একটা খুঁটি এমন জড়াইয়া ধরিলেন যে খুঁটি তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্ত দেবও মূর্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। বৈষ্ণবদের যত্নে শুশ্রূষায় তাঁহার সংজ্ঞা ফিবিয়া আসিল।

চৈতন্তের প্রেম-বিহ্বলতা—নগরে মল্ল আন্দোলন উপস্থিত করিল। বৈষ্ণবগণ চৈতন্তকে ত্রীকৃষ্ণরূপ অবতার দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চৈতন্ত—অধ্যাপনা, ছাত্র, সংসার আসক্তি, সব ছাড়িয়া অশ্রুক্ষমলে পৃথক পূর্ণ শরীরে—একেবারেই উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠে কেবল “হরিশ্রবণী”র গুঞ্জরণ মানবদেহের সীমায় দেবত্ব আনিয়া হাজির করিল।

( ৮ )

অধিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত নিমাই—বিচার গৰ্ব পদদলিত করিয়া সামান্য বৈষ্ণবগণের সঙ্গে মিশিয়াছেন—ভুনিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী চৈতন্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন । বামাচারী শাক্তগণ চৈতন্যের ভক্তি দেখিয়া—তাহাকে মানবের দৌৰ্বল্য ভাবিয়া চৈতন্যকে ঘৃণা করিতে লাগিল । চৈতন্যের এই অধঃপতন ঘটয়াছে বলিয়া তাহার নবদ্বীপের প্রত্যেক পল্লীতে আক্ষালন করিয়া বেড়াইতে লাগিল ।

এদিকে ভাবে মুগ্ধ চৈতন্য বৈষ্ণব সেবার মত্ত হইলেন । তিনি স্নাত বৈষ্ণবের সিক্তবস্ত্র স্বহস্তে নিংড়াইয়া দিতে লাগিলেন, কাহার পূজার সামগ্রী, কুশাদি যোগাইয়া দিতে লাগিলেন, কাহারও পদ সেবা করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে বৈষ্ণবগণকে লইয়া চৈতন্য হরি নাম সঙ্কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন । সংসার সুবাসন্ত নিদ্রাপ্রয়াসী প্রতিবাসীগণ রাত্রি কীর্তনের উন্মত্তরোল ও প্রেমোষ্পদের তাণ্ডব নৃত্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল । তাহার বৈষ্ণবগণকে রাজ্যাশাসনের বিভীষিকা দেখাইয়া জল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । একদিকে শাক্তগণের ক্রুর জিঘাংসা, অত্মদিকে বৈষ্ণবগণের প্রশান্ত আত্মরক্ষা—ক্ষুব্ধ নবদ্বীপে রীতিমত ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল ।

এই মায়াবাদী বিপ্লবের চুঃসময়ে বৈষ্ণব বৃন্দের বল বৃদ্ধি করিতে, অবধূত নিত্যানন্দ চৈতন্যের সহিত মিলিত হইলেন । নিত্যানন্দ একচাকা গ্রামে হার ওঝার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, অতি শৈশবেই একজন সন্ন্যাসী আসিয়া নিত্যানন্দকে গৃহত্যাগী করিয়া সঙ্গে লইয়া যান ।

নিত্যানন্দের পিতা মাতা অতিথি সেবা তৎপর গৃহস্থ ছিলেন, সন্ন্যাসী অতিথি বেশে আসিয়া তাঁহাদের একমাত্র পুত্র নিত্যানন্দকে প্রার্থনা করেন । ব্রাহ্মণ দম্পতী ধর্মের অমুরোধে হৃদয়ের ধনকে বিদায় দিলেন ।



নিতাই গৌর এই উৎসবে যোগদান করিলেন । এই সময় বৃদ্ধ অষ্টৈশতা-  
চার্য্যও নিতাই গোবকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন । এইরূপে পবিত্র যোগ সঞ্চয় করিয়া বৈষ্ণব সমাজ—নবদ্বীপে  
প্রেম মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন ।

ক্রমে, নিমাই গৌরের ভক্তিব আকর্ষণে, মুবারি, হিরণ্য, গঙ্গাদাস,  
বনমালী, বিজয়নন্দন, জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ, রাম, গরুড়াই, নারায়ণ,  
হরিদাস, বাসুদেব, বক্রেস্বর, গোবিন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, সদাশিব,  
শ্রীমান, শ্রীগর্ভ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ—এক বিরাট সঙ্কীর্ণের  
দল গঠন করিলেন । এই সব ভক্ত মণ্ডলাকে লইয়া প্রতি নিশীথে গৌরাজ  
সঙ্কীর্ণ আরস্ত করিলেন । মুদঙ্গ, মন্দিবা, শঙ্খ, করতালের গভীর  
ধ্বনি—নবদ্বীপকে ভক্তি রসে মাতাইয়া তুলিল ।

শাক্তগণের সর্বনাশ হইল । তাহারা বৈষ্ণবের শত্রুতা সাধনে হৃদয়ের  
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল । বৈষ্ণবগণের গৃহদ্বারে, জবাফুল,  
মত্তভাণ্ড, সিন্দূর রক্তচন্দন, মাংস, অস্থি প্রভৃতি বামাচারীর পূজাকরণ  
ছড়াইয়া দিতে লাগিল । অধিকন্তু বৈষ্ণবগণের প্রেমলীলাকে গুপ্ত  
ব্যভিচার বলিয়াও ঘোষণা করিল ।

( ৯ )

গৌরাজ দেব শাক্তদের শত বাধা বিষ় তুচ্ছ করিয়া নাম মাহাত্ম্য  
প্রচার করিতে লাগিলেন । সঙ্কীর্ণ স্থলে তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়া  
বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস জন্মিল—চৈতন্য সাক্ষাৎ ভগবান, কলিয়ুগে কলুষহারী  
নাম মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন । গৌরাজ শ্রীকৃষ্ণ,  
নিত্যানন্দ বলরাম, অদ্বৈত মহাদেব, শ্রীবাস নারদ, হরিদাস ব্রহ্মা—অবতার  
তত্ত্বে বিশ্বাসবান বৈষ্ণবমণ্ডলী সাধারণকে ইহা বুঝাইতে লাগিলেন ।

যখন সঙ্কীর্ণের দল নগর ভ্রমণে বাহির হইত, তখন ভক্তগণ চৈতন্য

ও নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে পুষ্পমালা চন্দনে সজ্জিত করিয়া দিতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর শিরে ছত্র ধারণ করিতেন, ভক্ত মণ্ডলীর শ্রদ্ধা উপহার পাইয়া চৈতন্তের মনে রাজসিক বিকার প্রবেশ করিতে পারিল না, চৈতন্ত আপামর সাধারণকে আলিঙ্গন করিয়া হরিনাম মহামন্ত্র শিখাইতে লাগিলেন। যবন কুলোদ্ভব হরিদাসও তাঁহার কাছে—ব্রতনিষ্ঠ স্নত্রাস্কণের প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

বৈষ্ণব দলের অগ্রণী হইয়া চৈতন্য নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সকলেই সেই তেজব্যঞ্জক কলেবর সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষকে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু চৈতন্য তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—“ভাই সকল! আমি অন্য ভিক্ষা চাহি না, আমার ভিক্ষা—তোমারা একবার বদন ভরিয়া হবি হরি বল”। তৎকালে সাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচার বিধির অল্পতান হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল না, চৈতন্যই প্রথমে—এইরূপ দেশব্যাপী ধর্ম প্রচারের পথ দেখাইয়াছিলেন।

( ১০ )

চৈতন্ত যুগে, নবদ্বীপে “জগাই” ও “মাধাই” নামক দুইজন মহাপাষণ্ড বিরাজ করিত। ইহারা দুই ভাই, ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব হইয়াও এই পাষণ্ডদ্বয়—মত্তপান, ব্যভিচার, অথাৎ ভোজন প্রভৃতি পৈশাচিক কুক্রিয়ায় চিরাত্যস্ত ছিল। নবদ্বীপের প্রত্যেক নরনারী—এই দুর্জয় নারকীদ্বয়কে ভয় করিত। চৌধ্যবৃত্তি নরহত্যা, গৃহদাহ, সতীত্ব হরণ—প্রভৃতি দুর্কার্য সাধনে ‘জগাই মাধাই’—ভদ্র সমাজে সাধারণের চক্ষেই উপেক্ষিত হইয়া পথে ঘাটে প্রেতলীলার আশ্বালন করিয়া বেড়াইত।

চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের প্রতি—পাষণ্ডদ্বয়ের আক্রোশ জন্মিল। নিত্যানন্দ—ভ্রাতৃত্বের পাপ জীবনের দুর্দশা দেখিয়া তাহাদের চরিত্র শোধনের উদ্যোগ করিলেন।

একদিন প্রভু নিত্যানন্দ স্বদলের সহিত—জগাই মাধাইয়ের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া হরিধ্বনি করিলেন। সুরাপানে আরক্ত লোচন জগাই মাধাই, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে নিত্যানন্দের পানে চাহিল। তারপর সেই পিশাচদ্বয় নিত্যানন্দকে এক ভগ্ন মৃৎপাত্রের দ্বারা গ্রহার করিল। নিত্যানন্দের ললাটদেশ হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইল। চৈতন্তদেব এ সংবাদ পাইলেন। চৈতন্তদেব নিত্যানন্দের উদ্ধার বাসনায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, নিত্যানন্দ চৈতন্তকে বলিলেন—“প্রভো! এ অবোধ ভ্রাতৃদ্বয়কে রক্ষা কর’। নিত্যানন্দের কথায় চৈতন্তদেব কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—“ভাই নিতাই! তুমিই প্রকৃত সাধু! শত্রুকে যে রক্ষা করিতে পারে, সে দেবতা। তোমার এই উত্তম রক্ত ধারায়—জগাই মাধাইয়ের আজন্ম সঞ্চিত পাপ রাশি—আজ বিধোত হইয়াছে।”

বাস্তবিক, সেইদিন সেই মুহূর্ত্তেই—জগাই মাধাই কৃতকার্যের জন্ত অমৃতপ্ত হৃদয়ে—চৈতন্তদেবের চরণে শরণাগত হইল। চৈতন্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। জগাই মাধাই বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের কঠিন হৃদয় অলৌকিক প্রেমের বিশ্বব্যাপী তেজে—একেবারেই গ লিয়া গেল। ভক্তগণ পাপীর উদ্ধার হটল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিলেন। জগাই মাধাই ‘হরি হরি’ ব্যোমনাদে—সকলকে বিস্মিত করিয়া, প্রেম ভরে নৃত্য করিতে লাগিল।

জগাই মাধাইয়ের অদ্ভুত পরিবর্তনে—অনেক পাষণ্ডই চৈতন্তের দৈব-শক্তির মহিমা বুঝিল।

( ১১ )

নগরাধ্যক্ষ কাজী সাহেব একদিন পথে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই সময় গোরাঙ্গের সঙ্কীৰ্ত্তন সম্প্রদায় কাজির সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণবদের চীৎকারে কাজী সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“যদি তোমরা এইরূপ



চীৎকার করিয়া দেশেব শান্তিভঙ্গ কব, আমি তোমাদিগকে কারাগারে রাখিব।” কাজী সাহেব জাতিনাশেরও ভয় দেখাইলেন।

কাজীর কথায় বৈষ্ণবগণ ভীত হইলেন। আব কেহ সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে সাহস করিলেন না। এ স বাদ গোবিন্দদেব শুনিতে পাইলেন। ভক্তগণ সঙ্কীৰ্ত্তন বন্ধ কাব্যেছেন—ইহাতে তাঁহাব মন্বন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি সমস্ত বৈষ্ণবকে আহ্বান করিলেন। প্রত্যেকেই বুঝাইয়া বলিলেন—“কাজীব ভয়ে সঙ্কীৰ্ত্তন বন্ধ করিলে চলিবে না, নাম সঙ্কীৰ্ত্তনই বৈষ্ণব ধর্মের জীবনী শক্তি! আপনাবা প্রস্তুত হউন, আজ আমিই আপনাদের সঙ্গে নগর সঙ্কীৰ্ত্তনে বহির্গত হইব।” চৈতন্তের আশ্বাসে নিশ্চিন্ত বৈষ্ণব সমাজে আবাব নবজীবন সঞ্চার হইল। ভক্তগণের জয়ন নাচিয়া উঠিল। আজ বেরাট নগর সঙ্কীৰ্ত্তন বাহিব হইবে—সে দলের নেতা স্বয়ং চৈতন্ত মহাপ্রভু,—অচিবেই এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল। আবাব বনিতা বৃদ্ধ কোতুলকাকান্ত হইয়া নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভক্তগণ সঙ্কীৰ্ত্তনের পথ আশ্রয় পল্লব, পুষ্পমালা, দীপশ্রেণী, কদলীকাণ্ড প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিলেন। গৃহস্থেব গৃহদ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়া শুভ চিহ্ন সূচনা করিল।

গোধূলীব সময়ে, বিবাহের এব সজ্জার ছায়া নগর সঙ্কীৰ্ত্তনের দল বাহির হইল। সহস্র সহস্র নরনারী পুলক পূর্ণ অন্তবে এই অভিনব সমারোহে যোগদান করিলেন। নগরবাসী পুরুষগণ, প্রজলিত মশাল লইয়া এই আনন্দ কোলাহলেব মধ্যে আপনাদিগেব জয়ধ্বনীর মিশাইয়া দিল।

সেনাপতির আদেশে, সৈন্তগণ যেমন সংগ্রাম কোশল প্রদর্শনে অগ্রসর হয়, চৈতন্তের ইঙ্গিতে তেমনি বৈষ্ণবগণ দলে দলে অগ্রসর হইলেন! মেঘগভীর নাদী শত শত মৃদঙ্গে ‘দশকুশীর’ মধুর বোল বাজিতে লাগিল, করতাল, শূঙ্গ, মৃদঙ্গের ধ্বনীর সঙ্গে বাজিয়া উঠিল! লক্ষকণ্ঠে ঐক্যতানে

—হরিনামের মহিমা ঘোষিত হইল । বিপক্ষের বুক—গৌরাজের জয় নাদে গুরু গুরু গর্জনে কাঁপিতে লাগিল ।

তখন, মালাচন্দন বিভূষিত বৈষ্ণবদল হরিগুণ গান করিতে করিতে রাজগথে বহির্গত হইলেন । অগ্রে অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস, পশ্চাতে—শ্রী গৌরাজ—ভুবনমোহনরূপে পথ আলো করিয়া চলিলেন ! প্রভুর মস্তকে ভ্রমর নিন্দিত কৃষ্ণ অলকদাম—পবন স্পর্শে হুলিতে লাগিল, কমল নয়নে প্রাণস্পর্শী প্রেমধারা ! কর্ণে সুবাসিত কুসুমমালা, স্বক্কে—হিমালয় বক্ষে ভাগীরথীর ত্রায় যজ্ঞসূত্র শোভিত ! দেহে অপূর্ব লাবণ্য রাশি ভাস্বর জ্যোতির মোহাগে উথলিতেছিল, নৃত্য ভঞ্জনায় মনোরম পদ-সঞ্চালন দেখিয়া, ধরণী সাগ্রহে বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন ! গৌরাজের মুখে ঘন ঘন হরিনাম !! উভয় পার্শ্বে প্রেম বিহ্বল নিত্যানন্দ ও ভাবুক গদাধর ! কি অপরূপ দৃশ্য ! এই অপূর্ব সমারোহ, এ উন্মত্ত ভক্তির প্রকাশ যে স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, সেই স্থানেরই অধিবাসীগণ আসিয়া সঙ্কীর্ণনের দল পুষ্টি করিতে লাগিল । এই বিরাট সঙ্কীর্ণন—অতি বড় পাষাণের শরীরেও রোমাঞ্চকর তন্ময়তা ঢালিয়া দিল ।

সঙ্কীর্ণন করিতে করিতে ভাবোন্মত্ত ভক্তগণ গঙ্গাপুলিনের পথ বাহিয়া চলিলেন । পুরনারীগণ মজল শব্দে অধর সংযোজন করিল । লক্ষকণ্ঠে সপ্তস্বরের মূর্চ্ছনা উঠিল—

“তুমার চরণে মন লাগুছ রে শারঙ্গ ধর” ।

ক্রমে সঙ্কীর্ণনের দল কাজীর বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল । সেই উত্তাল তরঙ্গ সম প্রমত্ত সমারোহের ভীষণ নিনাদে সন্তপ্ত হইয়া কাজী তাঁহার এক অমুচরকে বলিলেন—“ও কিসের গোলমাল, সন্ধান লইয়া আইস ।”

দূত কাজীকে সংবাদ দিল—“নিমাই পণ্ডিতের দল গান গাহিতে গাহিতে এই দিকে আসিতেছে । শুনিয়া কাজী বাহিরে আসিলেন, সেই

বিরাট জন সংঘ দেখিয়া ভয়ে কাজীর প্রাণ উড়িয়া গেল। এই সময় গৌরানন্দেব কাজীর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। কাজী ভাবিলেন—বোধ হয় ইহারা সঙ্কীর্ণনে বাধা দেওয়ার প্রতিশোধ লইতে আসিতেছে।

চৈতন্য কাজির হস্তধাবণ করিয়া সহাত্রে বলিলেন, “কাজী সাহেব ! ভয় কি ? আমরা অত্যাচার করিও আসি নাই। আমরা আসিয়াছি আপনার কাছে সঙ্কীর্ণনের অনুমতি লইতে। কাজী সাহেব ! আজ আমরা আপনার অতিথি, আপনি দেশের শাসন কর্তা, আপনার ক্ষমতা অসীম, আজ অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ করুন।”

কাজী জিজ্ঞাসা করিলেন—“পণ্ডিতজী ! বল, তুমি কি চাও ?”

চৈতন্য বলিলেন—“আমাদের কীর্তনে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইও না।”

কাজী নত মস্তকে চৈতন্যের কথায় স্বীকৃত হইলেন। বৈষ্ণবগণ জয় মহাপ্রভুর জয়” বলিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। আবার সঙ্কীর্ণণ আরম্ভ হইল।

( ১২ )

চৈতন্যদেব গৃহী হইয়াও আসক্তি শূন্য বৈরাগী ছিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন—এরূপ ভাবে সংসারে থাকিলে লোকে আমার নিমুক্ত ভাব বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং লোক শিক্ষার জন্ত আমার সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে।

ভক্ত মণ্ডলীর কাছে চৈতন্য স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলেন। বৈষ্ণবগণ বুঝিলেন—বিষয় স্পৃহা হইতে মুক্তি লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কার্য না দেখিলে, লোকে কেবল বাক্যে অনুসরণ করিতে সম্মত হইবে কেন ? সুতরাং জীবের কল্যাণের জন্ত চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

চৈতন্য হৃদয়ের বলে সকল বন্ধন ছিন্ন করিলেন। গদাধর, নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর সহগামী হইবার জন্ত প্রস্তুত

হইল। প্রিয়তমার গাঢ় প্রেমালিঙ্গন, মাতার অমিয় মধুব উদার মেহ, আত্মীয় স্বজনের বিরহ খিন্ন। বরস বদন—চৈতন্যকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। চৈতন্য সর্বভ্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন। নবদ্বীপের চতুর্দিকে গগণভেদী হাহাকার উঠিত হইল। আনন্দ কোলাহলময় নবদ্বীপে শোকের প্রবল ঝঙ্কাবাতে—শ্মশানেব নৈরাশ্র মাথিয়া নীরব হইল। পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহের দীর্ঘখাস গুণিতে গুণিতে, স্নেহময়ী শচীমাতার নয়নযুগলে নির্ঝরিতর উৎস দেখিতে দেখিতে, অটল প্রতিজ্ঞ চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্ত কাটোয়া নগরে যাত্রা করিলেন।

কাটোয়ায় বিখ্যাত গোস্বামী কেশব ভাবতী মহাশয় বাস করিতেন। চৈতন্য ভারতীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। যথাকালে দীক্ষা গ্রহণের আয়োজন হইল। ভারতীর অনুরোধে একজন ক্ষৌরকার চৈতন্যের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল। তপ্তকাঞ্চন দেহে গৌরাজ্জদেব অরুণ বসন পরিধান করিয়া দেপ্রবভায় উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ণ আধারণ করিলেন। সেই দণ্ড কমণ্ডলু ধৃত ব্রহ্মাচারী মূর্তি দেখিবার জন্য কেশবের গৃহ লোকে লোকারণ্য হইল।

১৪৩১ শকাব্দে (১৫০৯ খৃঃ) পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক্রে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গৌরাজ্জদেব সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। দীক্ষার পর, কেশব ভারতী তাঁহার নাম রাখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব পশ্চিমাভিমুখে বহুদেশে পর্যটন করিয়া লীলাচলে গমন করেন। লীলাচল যাত্রার পূর্বে চৈতন্যদেব একবার নবদ্বীপে সকলের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন। এই সময় শচীদেবী একবার পুত্র মুখ দর্শন করিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু অভাগিনী বিষ্ণু প্রিয়া নিকটে পাইয়াও পতি পাদপদ্ম পূজা করিবার অমু-

মতি পান নাই। সন্ন্যাসীর পত্নী সন্দর্শন নিষিদ্ধ। চির হুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলি শয্যায় লুপ্তিত হইয়া নারী জীবনে ধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার তখনকার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

চৈতন্যেব অনন্ত লীলা সংক্ষেপে কি বলিব? মহাপ্রভুর প্রেমলীলা বঙ্গ সমাজকে এক অপূর্ব ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ধর্ম বিপ্লবে আত্মচাৰ্য্য মূঢ় মানব কুলকে তিনি ভক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন, ভক্তি পথের পথিক হইতে গেলে, জ্ঞান, ধন, মান— কিছুই আবশ্যকতা নাই; বলবীৰ্য্য পাণ্ডিত্যেবও প্রয়োজন নাই— প্রয়োজন কেবল জ্ঞানের। বৈবাগ্য ও দৈত্যের চবম উৎকর্ষ দেখাইয়া তিনি নরনারীকে শিখাইয়া গিয়াছেন—

“তৃণাদপি সুনীচেন, তবোরিব সহিষুনা।

অমানিনা মানবেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥”

( ১৩ )

১৪৫৫ শকে, অষ্ট চত্বরিংশ বর্ষ বয়সে মহাপ্রভুব মর্ত্যলীলা সমাপ্ত হয়। ভাবাবেশে উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়া গোবান্ধদেব সমুদ্র গর্ভে পতিত হন। তাঁহার শবদেহ একজন ধীবর জালে করিয়া তীরে উত্তোলন করিয়াছিল। কেহ বলেন—গদাধরের গৃহস্থিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহেব সহিত লীন হইয়া গিয়াছিলেন।

বিষয় কৌটগণকে শাস্তি নিকেতন দেখাইয়া দিবার জন্ত মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গোলকধাম হইতে যে হরিভক্তি সূধা আনিয়া মর্ত্যালোকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, পাঁচগু আমরা সে অমূল্য ধনের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলাম না! আমরা যখন সংসার বিবে জর্জরিত হইয়া, কলুষ তাড়নায় সমস্তপু থাকিয়া, দারিদ্র্য শোকের আঘাত সহিয়া পাগলের মত ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াই, অশান্তিব হস্ত হইতে পরিত্রাণের

আশার শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন কৈ ? একবারও তো মনে পড়ে না যে, মহাপ্রভু আমাদের জন্য যে অমৃত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই বিষম বিষম বাসনার ঘোরতর বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র মহোষধ ! কত শতাব্দি অভীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে অমৃত এখনও চির নূতন । সে কল্পতরুর নিকট হাত পাতিলে, মানবের কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না ।

## ভক্তপ্রবর নব্বহরি সরকার ঠাকুর

( ১ )

সে আজ ৩৪ শত বৎসর পূর্বের ঘটনা ; তান্ত্রিকের তামসিকতায়—  
পঞ্চ মকারের প্রবল প্রলোভনে—বৃথা আড়ম্বর ও অনাচারের মধ্যে ধর্ম  
বখন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন লক্ষ্যহীন ভাবহীন আচারহীন  
প্রকৃতি গুঞ্জের মঙ্গলের জন্ত বৈকুণ্ঠের অমিয় ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া  
শাস্ত, দাশ, বাৎসল্য সখ্য, মধুরাদি অপরূপ রস-ধারায় সিক্ত হইয়া  
বাক্যলাগ বৈষ্ণবধর্ম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। চৈতন্তের উদ্যম  
ছুটাছুটিতে, অতৃপ্ত অনির্ব্বাচ্য ইন্দ্রিয়সুখ পায়ে ঠেলিয়া জীব-জগৎ প্রকৃত  
আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিল। গৌরাজ পাগল হইয়া অনেককে পাগল  
করিয়াছিলেন, বুঝাইয়াছিলেন—মানুষের সুখ-তৃষ্ণা কিছতেই মিটিবার  
নয়, সে চায় “সাগরসঙ্গম”—সে সাগর কোথায় ? সে সাগর স্বয়ং  
শ্রীভগবান ! জীবের পরম পুরুষার্থ, সর্ব্বদুঃখ নাশের একমাত্র উপায়,  
অনন্ত তৃপ্তির আধার আনন্দময় ভগবানে আত্মসমর্পণ। প্রেমের প্রথম  
বিকাশে দাস্ত ভাবের উদয়, তখন ভক্ত ভগবানে পার্থক্য থাকে ; শেষে  
এই পার্থক্য ঘুচিলে ভক্তের অঙ্গুরাগ সখে পরিণত হয়, সখ্য হইতে  
ক্রমে মধুর রসের উৎপত্তি। ইহাই বৈষ্ণবধর্মের জীবনী, ইহাই প্রেমময়  
মহাপ্রভুর হৃদয়ের হিরণ্ময় ইতিহাস। চৈতন্ত নিজলীলার এই সকল  
ভাবই পর্যটন করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব স্তন্দর, বৈষ্ণবের প্রেমময় ও স্তন্দর, স্তন্দর না হইলে স্তন্দরে  
মিলিবে কেন ? বৈষ্ণবের যেমন আনন্দ মিলনে, তেমনি আনন্দ বিরহে।  
বৈষ্ণবের সাধনা ভক্তির সাধনা, প্রেমের সাধনা,—মিলনে প্রাপ্তি,

বিরহে অনন্ত ব্যাপ্তি। বৈষ্ণবের জীবনের স্বামী—চিরানন্দময় অনন্ত সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমের চরমোৎকর্ষই বৈষ্ণবের রাধিকা; অনিত্যের উপর ভালবাসা ভুলিয়া, নিত্যের উপর অনন্ত শরণার আশ্রয়সম্ভ্রম—বৈষ্ণবের যুগল মিলন। বৈষ্ণবের সর্ব লীলার সার—মধুর “রাস-লীলা”।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন ভাবরাজ্যে প্রেমের বসন্ত দেখা দিয়াছিল, যখন তাঁহার উদার ধর্ম, অবাধ প্রেম আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন শ্রীখণ্ডে পঞ্চবিংশতি জন মহা-সাধক সেই অসম্ভব স্বার্থশূন্য মহাপুরুষের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া জন্ম সফল করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বৈষ্ণবধর্মকে সম্ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ঠাকুর নরহরি দাস সরকারের নাম আমরা সর্বপ্রথমে উল্লেখ করিতেছি।

( ২ )

শ্রীখণ্ড কাটোরার সরিকটহ একখানি গঙগ্রাম। ইহার চতুর্দিকে হরিৎ তৃণক্ষেত্র, তাহার মাঝে গ্রামখানি যেন নীলাবুবেষ্টিত কুবলয় কুঞ্জের মত শোভমান! কিন্তু হায়! বৈষ্ণবের মহাতীর্থ শ্রীখণ্ডের আর সে গৌরব নাই! এখন আছে কেবল প্রাতঃসঙ্ক্যার নিয়মিত নাম সঙ্কীর্্তন—মহাজন পদাবলীর অমৃতধারা! আর শত শত জীর্ণ মন্দিরে, ভগ্ন প্রাসাদে, চূর্ণ কুটিরে সেই অতীত গুহ্মদিনের গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় !!

এই পুণ্যভূমি শ্রীখণ্ডের এক পরম ভাগবত বৈষ্ণবংশে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর নরহরির জন্ম হয়। নরহরির পিতার নাম নারায়ণ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুকুন্দ দাস। মুকুন্দ গোড়ের “রাজবৈষ্ণব” ছিলেন। সুতরাং নরহরির পিতার অবস্থা বেশ সম্বল ছিল। নরহরি পিতার আদর্শে অতি শৈশবে নরহরির প্রাণে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হয়। যথেষ্ট লাল-সঙ্কীর্্তন হইত, সকল ভুলিয়া ঝালক নরহরি সেইখানেই বসিয়া থাকিত।



ভেন। মাতার কোলে বসিয়া তাঁহার মুখে নরহরি কৃষ্ণলীলার গরু  
তুলিতেন। এই সময় হইতে শিশু-রূপে কৃষ্ণপ্রেম দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, পণ্ডিতের দেশ বলিয়া তখন নবদ্বীপের  
বড় সম্মান। সমগ্র বঙ্গের জ্ঞানের প্রবেশদ্বার নবদ্বীপে, তখন দেশান্তর  
হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতে আসিত। নারায়ণ বিদ্যাশিক্ষাব জ্ঞাত  
নরহরিকে এই বাণীর বিলাস-কাননে প্রেরণ কবিলেন। বালকের  
সুন্দর আকৃতি, “প্রতপ্ত কনকোজ্জল” বর্ণ দেখিয়া একজন মহা-  
পণ্ডিত তাহাকে ছাত্ররূপে গৃহে স্থান দিলেন। এই পণ্ডিতের  
চতুষ্পাঠী সর্কশাস্ত্র সাধনার কেন্দ্র ছিল। শুভদিনে নরহরির বিদ্যাবস্তু  
হইল।

একদা নবদ্বীপের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে নরহরির সঙ্গে গোবাক্স  
দেবের সাক্ষাৎ হয়। গোবরুর সুন্দর রূপ দেখিয়া নরহরি আশ্চর্য্য  
হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মনে হইল এমন সৌন্দর্য্য বুঝি তিনি  
আর কাহারও দেখেন নাই! নরহরির মুখে প্রেমের অপূর্ণ জ্যোতিঃ  
দেখিয়া গোবাক্সও মুগ্ধ হইলেন। ইতিপূর্বে কেহ কাহাকেও চিনিতেন  
না, আশ্চর্য্য অলঙ্কিত দৃষ্টিতে সেইদিন উভয়ের পরিচয় হইল। পরিচয়  
ক্রমে গাঢ় প্রণয়ে পরিণত হইল।

নরহরি শ্রীগোবাক্সকে জন্ম জন্মান্তরে সাধনার ধন, প্রাণের দেবতা  
ভাবিয়া পূজা করিতেন। নরহরিকে পাইয়া সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ আশ্চ-  
গৌরব অনুভব করিল। পাড়ায় পাড়ায় মহোৎসবের আয়োজন  
হইল।

( ৩ )

শিশুামাতার অনুরোধে কৃতবিদ্য নরহরি শ্রীখণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।  
এই সময় আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু  
ভেঁটী সকল হইল না। নরহরি দায়পরিগ্রহে স্বীকৃত হইলেন না, তিনি

গৌরপ্রেম যজ্ঞে সমস্ত কাম আছতি দিয়াছিলেন। রমণীর মোহ কটাক তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

নরহরি আজন্ম কোমার ব্রত পালন করিয়াছিলেন।

চৈতন্তের অপূর্ব লীলা, বিরহ মিলন, মান অভিমান, ধ্যান ধারণা, প্রেমের উচ্ছ্বাস, কঠোর বৈরাগ্য, অতুল করুণা, সর্বোপরি তাঁহার বিরাট মহিমার মহান চিত্রগুলি নরহরির সরল হৃদয়ে অমর তুলিকা স্পর্শে অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি গোরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীখণ্ডে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। নরহরির নাম সর্কর্তনে ভাবের “সোণার কাঠি”র স্পর্শে নির্জীব শ্রীখণ্ড চকিতে সরস ও সজীব হইয়া উঠিল। নরহরির গৌরভক্তি আশ্রয় কুন্তলের মত স্বতঃ বিকশিত হইয়া দশদিক আমোদিত করিল।

তিনি চৈতন্তদেবকে পুরুষ এবং আপনাকে ‘রমণী’ ভাবিয়া মিলনা-কুলা সতীর পতি সমাগমের স্থায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই ভাবোন্মত্ততার সংবাদ পাইয়া, বৈষ্ণব সমাজ পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণের ধারণা হইল—এই নরহরি সামান্য ভক্ত নহেন। ইনি রাধিকার সখী “মধুমতী”—“পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা, অধুনা নরহর্য্যায় সরকার প্রভুপ্রিয়ঃ।” নরহরিকে দেখিবার জন্য ভক্ত মণ্ডলী শ্রীখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নরহরির অবস্থা—“গৌরান্ন-মাধুরী, বাহার হরয়ে জাগে, কুলশীল তার সব ভাসিয়া বার, গৌরান্নের অম্বরগে।” বৈষ্ণবগণের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিল না। সকলেই বুঝিলেন—নরহরি রাধার সখী মধুমতীই বটে! এতদ্বিষয়ে বাধার্থ নির্ণয়ের জন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ একদিন সপারিষদে শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। নরহরি নিত্যানন্দকে আদর্শনা করিলে, প্রভু মধু পান করিতে চাহিলেন। নরহরি প্রভুকে একটা পুফরিণী দেখাইয়া দিলেন। সকলেই সেই পুফরিণীর জল পান করিলেন, জল শুভে

পরিণত হইয়া গিয়াছে । \* নিত্যানন্দ আবেগময় বক্ষে নরহরিকে আলিঙ্গন করিলেন । ভক্তগণ প্রেমিক নরহরিব পদধূলি লইলেন ।

( ৪ )

ক্রমে অনেকেই নরহরির নিকটে গোব-প্রেমেব দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । গোব-প্রেমে সমগ্র বঙ্গদেশ সঞ্জীবীত কবিবার জ্ঞাত নরহরির মনে বহুদিন হইতেই আগ্রহ জন্মিয়াছিল । চিরবাঞ্ছিত শচীনন্দনের প্রেমে তিনি যে অমৃত লাভ করিয়াছেন, সে অমৃত জগজ্জনে বিলাইবার জ্ঞাত তাঁহার প্রাণ অধীর হইল । একদিন শিষ্যগণের কাছে গৌরভক্ত নরহরি মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

গৌরলীলা দরশনে,                      বাঞ্ছা বড় হয় ননে,

ভাষায় লিখিয়া সব রাখি ।

মুই ত অতি অধম,                      লিখিতে না জানি ক্রম,

কেমন করিয়া তাহা লিখি ।

সে গ্রন্থ লিখিবে যে,                      এখনও জন্মেনি সে,

জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু ।

ভাষায় রচনা হ'লে,                      বুঝিবে লোক সকলে,

কবে বাঞ্ছা পূরাইবে প্রভু ?

নরহরির আর এক ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম রঘুনন্দন ঠাকুর । ইনি গোবাক্ষের একজন অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ বলিয়া বৈষ্ণব সমাজ ইহঁাকে যথেষ্ট সম্মান করিত । কথিত আছে এই মহাত্মা চৈতন্য দেবকে চামব ব্যঞ্জন করিতেন, ইনি গৌরাক্ষের সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । বঙ্গভাষায় গৌরলীলা প্রকাশিত হইলে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হইবে, সুতরাং রঘুনন্দন খুল্লভাত নবহরিকে পদাবলী রচনায় উৎসাহিত করেন ।

এই পুস্তিকা অন্ত্যবধি শ্রীখণ্ডে “মধুপুস্তক” বলিয়া বিখ্যাত ।

এইরূপে ঠাকুর নরহরিই সর্বপ্রথমে গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলী প্রকাশ করিয়া নবভাবে নবকল্পনায় বৈষ্ণব সাহিত্যকে অমর সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছিলেন । নরহরির রচিত ৪ খানি লীলাগ্রন্থ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় । তাঁহার “শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত”, “ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল” ও “নামামৃত সমুদ্র” সাধকোচিত অপূর্ব বিনয়ে পরিপূর্ণ, ভাব সরোবরের ফুটন্ত পারিজাত প্রেমের শিশির সম্পাতে তাহা বড় উজ্জ্বল ! প্রেমিকের সমস্ত প্রেম, কবির সমস্ত কল্পনা দিয়া নরহরি গোবের মতিমা অমর ভাবায় অঙ্কিত করিয়াছেন ! অণুক্রমে, তাঁহার পরবর্তী সময়ে গোবিন্দ দাস, লোচন দাস প্রভৃতি সাধকগণ বঙ্গভাষায় গৌরলীলা বিষয়ক পদাবলী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইতিপূর্বে এ সাহস কাহারও হয় নাই ।

( ৫ )

চৈতন্য দেব সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া যখন লীলাচলাভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন নরহরি বড়ই কাতর হইয়া পড়েন । শেষে জাজি গ্রাম-নিবাসী শিষ্যপ্রধান শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরামর্শে নরহরিও লীলাচলে যাত্রা করেন । নরহরিকে পাইয়া গৌরাজ্জ অত্যন্ত আনন্দিত হন । সেই অবধি প্রতি বৎসর রথের সময় পুরীধামে গৌরাজ্জের সহিত নরহরির সাক্ষাৎ হইত ।

চৈতন্যদেব পুরুষোত্তমে গিয়া এক মহাসঙ্কীৰ্ত্তন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন । ঐ সম্প্রদায় সপ্তদলে বিভক্ত হইয়াছিল । ঠাকুর নরহরি একদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । কিন্তু বেশীদিন তাঁহার ভাগ্যে গৌরাজ্জ দর্শন ঘটিত না । অনেক অহুন্নয় করিয়া গৌরাজ্জ নরহরিকে শ্রীধণ্ডে পাঠাইয়া দিতেন ।

গৌরাজ্জের অদর্শনে নরহরির প্রাণে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত । তিনি কাঁদিয়া কাঁটিয়া পাগলের মত ছটফট্ করিতেন । শেষে শ্রীধণ্ডের

এক নির্জন স্থানে নরহরি এক ভজনালয় নির্মাণ করিয়া তাহাতে গৌরান্ধ্র প্রভুর দাক্ষম্য বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই দেব মন্দিরের প্রাঙ্গণে, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে, চান্দ্র কার্তিক দ্বাদশী তিথিতে ঠাকুর নরহরির বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। তাঁহার ঐরোভাবের পূণ্যান্দনে, প্রাতঃ বৎসর ত্রীখণ্ড গ্রামে একটা মেলা বাসনা থাকে। ঐ মেলা উপলক্ষে তথায় বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। নরহরির প্রতিষ্ঠিত গৌরান্ধ্র মূর্তি এখনও ত্রীখণ্ডে বর্তমান। বৈষ্ণবগণ ভক্তিভরে প্রভুর বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন।

নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র ঠাকুর রঘুনন্দনের বংশাবলী আজিও ত্রীখণ্ডে বিরাজ করিতেছেন।

# লীলা-রসিক লোচন দাস

( ১ )

চৈতন্য যুগে, এই অধঃপতিত বঙ্গে—আচারহীন ধর্মের তিমির-পটল দূরীভূত করিয়া, শত সূর্যের ময়ূখ মালায়—যে সকল অদ্বিতীয় মহাপুরুষ প্রাহুভূত হইয়া, কর্মভোগের কঠোর আশ্রম প্রেমের কুসুম কুঞ্জে পরিণত করিয়াছিলেন—সাধকবর লোচনদাস তাঁহাদের অগ্রতম। একদিন এই মহাত্মার অপরাঞ্জের মহাশক্তি, ভক্তির মন্দাকিনী ধারায় অভিষিক্ত হইয়া, অজ্ঞানান্ধ কোটা কোটা নরনারীর উদ্ধারের জন্ত, বৈকুণ্ঠের তোরণদ্বার খুলিয়া দিয়াছিল !

ত্রিলোচন, লোচনানন্দ, লোচন—তাঁহার এই তিনটি নাম ; “চৈতন্য মঙ্গল” ও “ভুল্লভসাব” গ্রন্থে—এই তিন নামেই তিনি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু লোচন নামেই তিনি বিখ্যাত। বর্দ্ধমানের দশকোশ উত্তরে, কোগ্রাম নামক কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, জ্ঞানগৌরব বিপুল বৈষ্ণবকুলে, গৌরভক্ত লোচনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর, মাতার নাম—সর্বানন্দী দেবী। পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়া, লোচন দাস ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই কোগ্রামেই তাঁহার মাতুলালয় ছিল। লোচন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র সন্তান, পিতামাতার পবিত্র কোমল স্নেহ উষায়, তাঁহার প্রভাত জীবন সুধাময় হইয়াছিল। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত ও মাতামহী অভয়া দেবীর অত্যধিক আদরে লোচনের বিজ্ঞানশিক্ষার অবকাশ হয় নাই, সরল হাসি খেলার মধ্য দিয়াই তাঁহার স্নকুমার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল।

কমলাকরের যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ছিল। অন্নসংস্থানের কোন ভাবনা ছিলনা। স্ত্রতরং পুত্রের শিক্ষা হউক আর না হউক, পৌত্রমুখদর্শন-রূপ মহাপুণ্যের প্রলোভনে, পিতা কমলাকর অতি অল্প বয়সেই পুত্রের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। আভিজাত্যে কমলাকর মহাকুলীন, দেশে সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া তাহার সম্মান ছিল, এমন সুযোগ সন্তে বাঙ্গালীর ঘরে পাত্রী জুটিবার বিলম্ব হয় না। শীঘ্রই কমলাকরের পুণ্যভবন, বিবাহ-বাসরের মঙ্গল মধুর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একাদশ বর্ষীয় বালক লোচন, এক অষ্টম বর্ষীয়া বালক চম্পক দাম গৌরী দেব-বালিকাকে বধূরূপে বরণ কবিয়া, মাতা পিতার পারত্রিক পিণ্ডের ঘোণাড় করিলেন। নববধূ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখিয়া, অন্তমান রবিসদৃশ গভীর প্রশান্তমূর্তি কমলাকর, জাগ্রত কৌতুকে আপনার অক্ষয় স্বর্গের আভাষ পাইলেন, স্নেহময়ী স্বশ্রীর মুখেও হাস্যের রেখাও ফুটিল। কিন্তু কি জানি কেন বালিকাবধূর সহিত ক্ষণস্থায়ী সন্ধি সংস্থাপনে—লোচনের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ রহিল না। বিবাহের পর আটদিন নববধূ গৃহলক্ষ্মীরূপে স্বামীর কক্ষ উজ্জ্বল করিল,—এই আটদিন লোচনের মুখে কেহ পুলকের চিহ্নও দেখিতে পায় নাই। লোচনের মনে হইল—অনন্ত কাল-সাগরের কোটী তরঙ্গের মাঝে, যেন একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ নিঃশব্দে আসিয়া, নিয়তির লোহ-শৃঙ্খল চিরকালের জন্ত তাঁহার হৃদয়ে পরাইয়া দিয়াছে! এই বিবাহের ঘটনায়, একজনকে ঋণমুক্ত করিয়া, চিরজীবনের জন্ত তিনিই ঋণী হইয়া গিয়াছেন!

সংসার যখন আপনাকে কর্ম-কোলাহলের মধ্যে ডুবাইয়া দিত, লোচন তখন অশ্রমনস্তভাবে নির্জনে বসিয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা ব্যাধ-ভাঙিত মৃগের মত ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতেন। লোচনের স্বভাব চঞ্চল ছিল বলিয়া, এ পরিবর্তন কেহ বড় একটা লক্ষ্য করিত না।

( ২ )

কিছুদিন এইভাবে অতীত হইল। কাংশান্তক পরিহিতা, পঙ্কজ-লক্ষণা প্রফুল্লমুখী শরৎ—ধরণীর বক্ষে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন! বর্ষার বিষণ্ণতা ও স্থিরগম্ভীরভাব ভুলিয়া নিসর্গ স্নন্দরীর মুখে স্নেহের স্বচ্ছ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সরমময়ী সেফালী লাজাজলি বর্ষণ করিল। স্থলে স্থলপদ্ম, জলে কুমুদ কহলার কোকনদ, গগনে নিম্মল জ্যোৎস্না, সর্বত্র ছায়ালোকের অপূর্ণ মাধুবী! দিবা সূর্য্যের কনক কিরণে উদ্ভাসিত, রজনী—শশি-সনাথ তারামণ্ডলী ভূষিতা; শরতের মধুর ছবির সহিত, প্রকৃতির মধুব পরিবর্তন মিশিয়া, বাদ্যলার ঘরে ঘরে আনন্দ-কোলাহল জাগাইয়া দিল।

প্রেমের, আনন্দের সৌন্দর্য্যের পূর্ণ পরিণতি এই শরতে! শান্ত তাই শরতের উপাসনা কবেন, বৈষ্ণবের সারদীয় মহোৎসব বড় স্নন্দর, সেই চিরস্নন্দর বাসমণ্ডপে—লীলাময়ের মধুব মিলন লীলা! জীব তাহার অনন্ত লীলার সাথী—রাসের রাসেশ্বরী! রাসের অতৃপ্ত সুখ-লালসা—প্রেমিকবরের বাঁশরী নিনাদ।

সৌন্দর্য্যের হাট শ্রীখণ্ডে তখন রাসের বড় ধুম হইত। মিলনের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্ত দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া ভক্তগণ শ্রীখণ্ডে সমবেত হইতেন। সেই মহানন্দের ঈষদাভাষ এখনও নরহরি প্রমুখ মহাঅগণের স্মৃতি বিজড়িত শ্রীখণ্ডের শত শত তৃণলতা জটিল ভগ্ন স্তূপে, মন্দিরে দেউলে—দেখিতে পাওয়া যায়।

রাসোৎসব দেখিবার জন্ত ছুই চারিজন গ্রামবাসীর সঙ্গে বালক লোচন দাস শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। নরহরির কানন কুটীরোখিত বিশ্বজাগরণ মন্ত্র—লোচনের হৃদয়কে চুষকের মত আকর্ষণ করিল। স্পর্শ মণির স্পর্শে লৌহপিণ্ড রক্তচাতি বিকীর্ণ করে, ভাববিহ্বল বৈষ্ণব-



বৃন্দের গৌরপ্রেমে তন্ময়তা দেখিয়া, লোচনের লোচন যুগলে আনন্দেব নির্বাক বহিল। লোচন আর দেশে ফিরিলেন না, নরহরির শিষ্য হইয়া ত্রীখণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। এই অপ্রত্যাশিত মিলনের জন্তই বৃদ্ধি ত্রীখণ্ডে সেদিন মোহমধুর পূর্ণিমা রজনীর উদয় হইল।

গৌরভক্ত নরহরিকে সকলেই সন্তমের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। তিনি একজন সৰ্বশাস্ত্রাবদ্ব মহাপণ্ডিত ছিলেন। লীলাচলে, গৌরান্দেবের সম্মুখে, লোকানন্দ নামক জনৈক দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, নরহরির নিকটে তর্কে পরাভূত হইয়াছিলেন। পুত্র লোচন সেই ধর্মপ্রাণ নরহরির শিষ্য হইয়াছে,—এ সংবাদে লোচনের পিতামাতাও আনন্দিত হইলেন। সর্বসম্মতিক্রমে লোচন দাসের ত্রীখণ্ডে থাকাই স্থির হইল। কমলাকর মধ্যে মধ্যে পুত্রকে দেখিতে আসিতেন। পুত্রের অভিনিবেশের পরিচয় পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিত না।

চন্দন তরুর পারিপার্শ্বিক পাদপ বেমন তৎসৌরভে সুরভিময় হইয়া উঠে, ঠাকুর নরহরির আশ্রয়ে থাকিয়া লোচন দাসও তেমনি ত্রীগোবাক্সের একনিষ্ট সাধক হইয়া উঠিলেন। নরহরির পুত্রবৎ স্নেহ, মধুব উপদেশ মহৎ চরিত্রের অতুল প্রভাব—লোচনকে সাধনের পথে এতদূর অগ্রসর করিয়া দিল যে, তাঁহার আর সংসারে আসক্তি রহিল না। শৈশবের সুখস্বপ্নরচিত সাধের জন্মভূমি, জ্ঞানের প্রথম সোপান পিতা, অনন্ত স্নেহ-স্নিগ্ধ মাতৃকোড়, প্রেমের প্রতিমা প্রণয়িনী—সকলি বিশ্বস্তির গর্ভে বিসর্জন দিয়া, লোচন গৌরপ্রেমে আত্মসমর্পণ করিলেন। আজ্ঞা ব্রহ্মচারী জিতেজ্বর নরহরি ঠাকুরের আদর্শে—লোচনের চরিত্র গঠিত হইল। লোচন গৃহভ্যাগী সন্ন্যাসী সাজিলেন। আলালের ঘরের ছালাল, প্রারম্ভিক শুচি তপঃ কৃশ ব্যক্তিকের মত দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলেন।

( ৩ )

এদিকে লোচনের বালিকাপত্নী, সত্ত্বপ্রফুল্ল মধুগর্ভ অনাব্রাত কুসুম-কলিকার শ্রায় পিতৃগৃহে বদ্ধিত হইতেছিল ; সেই পরিণয় রজনীতে শুভ দৃষ্টির সময় ব্যতীত তাহার ভাগ্যে আর স্বামী সন্দর্শন ঘটে নাই । বাসনা ও তৃপ্তিব মাঝে কত যে গিবিনদী ব্যবধান—বালিকা তাহা জানিত না ।

আপনার সমস্ত শৈশব-অভিধান নিরবচ্ছিন্ন অধরের হাসিতে ডুবাইয়া দিয়া, আর বড় বেশী দিন সে নিরাপদে থাকিতে পারিল না । জীবনের স্নমধুর বসন্ত কাল কমনীয় যৌবন, বালিকার নিভাস্ত অজ্ঞাতসারেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল । পুষ্পস্তবক বিভূষণা নবমল্লিকার শ্রায় তাহার কোমল তনু অপূর্ব শ্রীসম্পদে ভরিয়া উঠিল । যেন কোন অজ্ঞাত শিল্পীর ঐশ্বর্যজালিক করস্পর্শে—বালিকার চটুগনয়নে অলস মদির ভাব, চরণে সবিলাস মন্থরগতি এবং সর্বাস্থে লজ্জাবতীর সরম জাগাইয়া দিল । জীবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, পিত্রালয়ে সকলের চ'খে চ'খে থাকিয়াও তবঙ্গী আপনাকে নিভাস্ত অসহায় মনে করিল ।

অষ্টম বর্ষে তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার পর আরও আটটি বসন্ত তাহার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে,—তথাপি স্বামীর পবিত্র স্মৃতি পূর্ব জন্মার্জিত পুণ্যের শ্রায় এখনও তাহার প্রাণে জাগিয়া আছে । কুসুম কলিকার সৌরভের মত বালিকার হৃদয় কোরকে প্রেম যে কোথায় লুকাইয়া ছিল, তাহা সে জানিত না । কবে কোন পথ দিয়া তথায় অরুণালোক প্রবেশ করিল, লালসার স্নহমন্দ সমীরণ বহিল, স্পষ্ট হৃদয়কে সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত করিয়া দিল—তাহাও সে বুঝিতে পারিল না । প্রেমের সৌরভ হৃদয়কন্দরে চাপিয়া রাখিবার জন্ত বালিকা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু শ্রোতের জল অতি ক্রীণ—তাহার বাঁধ একবার ভাঙিলে আর তাহাকে সংযত করা অসম্ভব ।

এই আট বৎসরের মধ্যে স্বামী তাহার সংবাদ লন নাই, দেখিতেও আসন নাই। সে কেবল পিতামাতার মুখ হইতে অন্তরালে দাঁড়াইয়া স্বামীর কুশল সংবাদ শুনিতে পাইত, তখন তাহার মনে হইত— এই উন্মুক্ত গগনতলে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর ত্রায় বায়ুসাগবে পাড়ি দিয়া স্তনীল অলসত্ব ভেদ করিয়া, বেদনাক্রিষ্ট হৃৎথময় জীবনের কাহিনী লইয়া, একবার সেই হৃদয়েশ্বরের চরণ সমীপে ছুটিয়া যায়। একদিন এক মুহূর্তের জন্ত, জৈশ্বর মানুষ সকলকে সরাইয়া ফেলিয়া, প্রাণের কাছে প্রাণেশ্বরকে টানিয়া আনে।

রমণীর সেই রহস্যময় অজ্ঞের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি—অন্তর্গামী কণ-গোচর হইয়াছিল।

( ৪ )

স্মৃতির সহিত, অতীতের সহিত যে মূর্তি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, চ'থে দেখিতে না পাইলেও সে মূর্তি যুবতীর প্রাণের অগোচরে ছিল না। কল্লোলিনীর কলতানে সে স্বামীর অব্যক্ত প্রণয়কাহিনী শুনিতে পাইত, শারদ জ্যোৎস্নার তরলাভায় নাথৈব অপকণ রূপ প্রভাসিত দেখিত, ফুলের ফুল হাসিতে স্বামীর প্রফুল্ল মুখেব শোভা দেখিত, বাসন্তী মলয়েব মৃদল স্পর্শে—জীবিতেশ্বরের কোমল কবের রোমাঞ্চস্পর্শ অনুভব করিত। কবির ভাষায় তাহার অবস্থা—“ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে!” কিন্তু রমণী অনন্তের মাঝে অনন্ত প্রকৃতির মতই নীরব থাকিত।

যুবতীর এই ভাব তাহার মাতা বুঝিলেন। বুঝিলেন—শৃংগ নয়নে ফুল আকাশের পানে কত্তার উদাস চাহনি দেখিয়া, বুঝিলেন—অতর্কিত আহ্বানে কত্তার চকিত ভাব দেখিয়া, বুঝিলেন—কত্তার আহাবে অনিচ্ছা, ভ্রমণে অনুরাগ, হাসিতে বিষন্নতা, লাবণ্যে কালিমার ছায়া দেখিয়া।

মাতা তখন জামাতাকে আনিবার জন্ত ব্যাকুল হইলেন।

স্বামীবিরহে সতীর শিশিরমখিত পদ্মিনীর ত্রায় মলিন মুখখানি দেখিয়া, প্রতিবেশিগণ লোচনেব নীরস ব্রহ্মচর্য্যকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। পুত্রকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত কমলাকর ঠাকুর নরহরির শরণাগত হইলেন।

নবহবি লোচনকে বিরলে বুঝাইলেন,—“ইহলোকে এমন করিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। বিশেষতঃ তুমি যখন বিবাহিত, তখন পত্নীর প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে। অনন্তশরণা আশ্রিতা অবলাকে উপেক্ষা করিলে, অপরাধী হইতে হয়, ইহাতে লোকনিন্দারও ভয় আছে। সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিলে, ইষ্টদেব কখনও অপ্রসন্ন হইবেন না।

স্বয়ং আজন্ম ব্রহ্মচারী হইয়াও, নরহরি জোর করিয়া লোচনকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন—যাবার সময় বলিয়া দিলেন—“যদি সংসারে থাকিতে তোমার ভাল না লাগে, তবে পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিও। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে মাতা ও পত্নীর অনুমতি লইয়াছিলেন।”

বহু নির্বন্ধে বাধ্য হইয়া লোচন শ্বশুর-আলয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিবাহের পর এই যাত্রাই তাঁহার প্রথম। আমোদপুর কাকুট গ্রামে তাঁহার শ্বশুর বাটী—লোচন পদব্রজে যাত্রা করিলেন।

( ৫ )

গ্রামে প্রবেশ করিয়া লোচন পথিপার্শ্বে এক অসামান্য সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। চঞ্চল দীপ শিখার ত্রায় বনপথ আলো করিয়া যুবতী শূন্য কুন্ত বক্ষে লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। অপরাহ্নের অলস সমীরণ, তাহার অযত্ন বিভ্রান্ত অলকগুচ্ছ লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল।

শ্বশুর বাটীর পথ লোচনের জানা ছিলনা। তিনি বিনয়ের স্নিগ্ধ কণ্ঠে—তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা! অমুকের বাটী কোন্‌দিকে?”

রমণী পূর্ণোন্মুক্ত নয়ন তুলিয়া একবার আগন্তকের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ইঙ্গিতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া পাশ্বে এক সঙ্কীর্ণ পথ দেখাইয়া দিয়া অধোমুখে অন্তরীক দিক দিয়া গেল।

বিহঙ্গ সঙ্গীত নাদিত পাদপমূলে, প্রদোষ নক্ষত্রের আলোকে হৃদয়ের শূণ্যতায় যুবক যুবতীর মুহূর্তের মিলন—অদৃষ্ট দেবতা অলস্তে বসিয়া ক্রুর হাসি হাসিলেন।

লোচন ঋতুর বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গেল।

বসন্তের জ্যোৎস্না পুলকিত মধু যামিনীতে, এক নির্জজন কক্ষে, বহুকাল পরে স্বামী স্ত্রীতে চারিচক্ষের মিলন হইল। কিন্তু হায়! এ মিলন প্রণয়ের প্রথম উন্মেষেই—বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এত কাছাকাছি হইয়াও—দুইটী বিস্মিত হৃদয় পাশাপাশি শিহরিয়া উঠিল। লোচন দেখিলেন—তাঁহার পত্নী সেই পূর্বদৃষ্টা যুবতী—যাহাকে পথিমধ্যে তিনি মাতৃ সৎসোধন করিয়াছেন। রমণীও চিনিলা—সেই অপরিচিত পথিক তাহারই চির পরিচিত প্রাণের দেবতা! অমনি, অতীতের স্মৃতি প্রাথার্য, সেই মাধুরীমাধা স্বর্ণপ্রতিমার আয়ত ইন্দ্রবর লোচনে অভিমানে অশ্রুর মুক্তাবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। তাহার পর সব স্থির! যুবতী অঞ্চল প্রান্তে সিন্ধু নয়ন মুছিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু মানবের পদতলে স্রুচীবিদ্ধ হইলে সে যেমন চমকিত, বিব্রস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠে, প্রথম যৌবনের প্রথম স্বামী সন্দর্শন—তেমতি তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল।

নবযুবতী পত্নীর এ মর্ম্মবাতনা—লোচনও বুঝিতে পারিলেন। লোচনের মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না। চিরোজ্জল বরণী ওরুণী—দেবরাজ্যের সমস্ত স্বয়ম্বা অঙ্গে মাথিয়া আজ লোচনের নয়ন সম্মুখে আবির্ভাব হইয়াছিল,—আজ তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা একটা মুখের কথায় ওলট পালট হইয়া গিয়াছে! তবুও সে—স্বামীর

পানে চাহিয়া আছে ! তাহার সেই করুণ চাহনিতে বুঝি হৃদয়ের চির-  
সঞ্চিত অক্ষুট অসম্পূর্ণ প্রেমকাহিনী নীরবে ব্যক্ত হইতেছিল । হায় !  
এই শয়নকক্ষে প্রবেশের পূর্বে সতী তো জানিত না—তার  
জীবনের অনন্ত তৃষা—একটী ত্রিযামা যামিনীর প্রথম যামেই নিভিয়া  
বাইবে !

এইবার সেই নীরব নিম্পন্দ মর্ম্মর মূর্ত্তির মুখে কথা ফুটিল । সমস্ত  
বাক্য ধরিয়া স্বামীব পাদমূলে বসিয়া রমণী অনেক কথা কহিল । কথা  
আব থামে না । কবির বৃথাই কথার মাধুবীর গোরব করেন ।  
দূর তাবকা বশ্মির মত বাহাদের মুখে কথা ফুটিতে চায় না, সেই অবলা,  
অশিক্ষিতা, নাবীক মুখে—সেই ঘোরা নিশিথিনীর বৃকে, লোচন যে স্বতঃ  
নিঃসৃত বীণার অমৃত ধারা শুনিলেন,—সে প্রকার গভীর কবিতা বিশ্বের  
কোন কাণেই পাওয়া যায় না । রাত্রি শেষে—নিদ্রায় প্রদোবে অক্ষুট  
ঔষ্মদ ধবীক ত্রায় কল্প কর্ণে রমণী বাঁধল—“আমি তোমার দাসী হইয়া  
জন্মিয়াছি, চিরজন্ম দাসীই থাকিব । জীবনে কখনও ঈশ্বরকে ভাবিনি,  
কিন্তু পলে পলে, স্বপনে, জাগরণে, কৈশোরে ঘোবনে কেবল  
তোমাকে ভেবেছি ।—তোমাকে আর স্পর্শ করিবার অধিকার আমার  
নাই, কিন্তু সেবা করিবার অধিকার আছে । আর আমার ফেলিয়া  
যাইও না ।”

পর দিন অরুণোদয়ের পূর্বে—লোচন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে  
ফিরিয়া আসিলেন ।

পিতার মৃত্যুতে,—অনেক ভ্রমসম্পত্তি লোচনের করতলগত হইল ।  
লোচনের সংসারাসক্তি একেবারেই ছিল না, দেহপিঞ্জর বিমুক্ত স্বর্ণ  
গমনোন্মুখ জীবাত্মার ত্রায় তাঁহার মন তখন সম্মুখেই চলিয়াছে ।  
তিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে দান করিয়া গ্রামের

পবিত্রাত্ম প্রান্ত সীমায়—পত্নীকে লইয়া কুটিবে বাস করিতে লাগিলেন। \*

লোচনের পর্ণকুটির অতি মনোহর স্থানে অবস্থিত ছিল। স্নানার্থিনী শ্রামল প্রকৃতিব স্নানীতল আলিঙ্গনে—পত্নীর প্রশান্তমুখে—লোচন কেবল সান্ত্বনার স্বর্ণীষ আভাষ পাইতেন। লোচন যুবা পূর্ব, তাঁহার পত্নীও যুবতী, তাঁহাদের ভালবাসাও বচ্যাব উদ্বেলিত প্রভাবে উচ্ছ্বসিত নদীর মত কুল ছাপাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু দম্পতীর এই মধুর প্রেমে মোহময় আত্মবিস্মৃতি ছিল না। ধর্ম্মের প্রভাবে, চবিত্ত্রের দৃঢ়তায়, আলোকবিহীন স্থানেব উদ্ভিদেব মত দম্পতীর ইন্দ্রিয়লালসা বর্জিত হইতে পাবে নাই। যুবক যুবতী দাম্পত্য প্রেমের পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি প্রাণের দেবতা ত্রীগোবাক্ষের পদে অর্পণ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র দাম্পত্য প্রেম শেষে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে, সময় তাণ্ডবে নৃত্য করিয়া সর্ববিজয়ী পঞ্চশর,—তাইটী হৃদয়কে শত চেষ্টাতেও আসক্তলিপ্সায় এক করিতে সমর্থ হয় নাই।

ক্রমে স্বামীর উপদেশে যুবতীর মোহেব আবরণ লুপ্তান্তর গ্রাস ছিন্ন হইয়া পড়িল। পৃথিবীর সকল বন্ধন হইতে সকল অবগুণ্ঠন হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, এই অলোকসামান্য স্নানদরী—জগতের সমক্ষে আপনার ভাস্কর-ছাতি প্রকাশ করিল। তাহার যৌল বৎসবেব পরিপুষ্ট আবেগপূর্ণ ধোবন,—একদিনের জগৎও মদির বিহ্বলতায় স্বামীকে আলিঙ্গন করিতে চাহে নাই। শোভাশালিনী, পূর্ণিমা রজনীতে, প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ ও জ্যোৎস্নার লীলা হাস্তের মধ্যে, নিভৃত চিন্তায়

---

\* লোচনের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি—“লোচনের ডাঙ্গা” নামে প্রসিদ্ধ। লোচনের কুলজবংশীয় পুত্রের অধিকারীরা আজিও তাহা ভোগদখল করিতেছেন। ঐ সকল ভূমিতে অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করেন।

উপবিষ্ট স্বামীর অধরে, যুবতীর সেই পূর্ণ, রসাল বিষাদর—তৃষিত চূষনের কুহবণ অনুভব কবে নাই ! যৌবন বসন্তের প্রথম অঞ্জলি গৌরাঙ্গ-চরণে সমর্পণ করিয়া, তরুণী প্রেম শ্রদ্ধার শ্রবণ চন্দনে—ঈশ্বর জ্ঞানে স্বামীর পূজা কবিত ! তাহার তরঙ্গায়িত রূপের উচ্ছ্বাস—ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র শ্রী ফুটিয়াছিল !—ভাদ্রমাসের ভরাগাঙ্গে প্রবৃত্তির তুফান ছিল না, দীর্ঘনিশ্বাসের বক্ষায় স্তম্ভিত আবেগ, তাহার হৃদয়ে চাক্ষু্য আনিতে পারিত না । যে নাবী স্বামীর চরণে আপনাকে অক্ষুণ্ণ চিত্তে সমর্পণ করিতে পাবে, ধর্ম্ম স্বয়ং আসিয়া তাহাকে ভোগলালসার অন্ধকূপ হইতে নিজের নিভৃত নিরাপদ বক্ষে শত আবরণে বেষ্টন করিয়া ধরেন ।

কুটির প্রাঙ্গণে বসিয়া লোচন যখন “চৈতন্ত মঙ্গল” গান করিতেছেন, সেই বীণাবিনিদিত কণ্ঠে যখন ভ্রমর গুঞ্জনের শ্রাব্য বাক্যের উচ্চৈঃস্বরে, তাহার উচ্ছ্বাস যখন মূর্ছনায় মূর্ছনায় উত্তেজিত হইয়া, প্রক্ষুটিত রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ গন্ধ বাহিত নৈশ সমীরণে মিশিয়া, হিল্লোলে হিল্লোলে—অপার রহস্তনিলয় আকাশের পানে উর্দ্ধমুখে ছুটিত, যুবতী ছায়াব মত স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া তাহা শুনিত । গানের প্রতিবর্ণ তাহারই অতৃপ্ত বাসনারূপে বদ্ধ হইত । এমন নবীন যৌবন, এমন শশধর-কিরণ বিধৌত ধরাতল, এমন বসন্তের স্নেহস্পর্শ সমীরণ, এমন কুসুম-সুস্বাদু সমাকুল মধুর রজনী,—সমস্তই তাহার সেই বাসনাব্যাপ্ত বেদনা-বিক্রম যৌবনের প্রতি প্রকৃতির তীব্র বিক্রম বলিয়া মনে হইত । তাহার আরক্ত নয়ন, নীহার স্নাত রক্ত কমলের মত জলে ভরিয়া আসিত !

লোচনও বুঝিতেন—ধর্ম্মপত্নী হইয়াও যুবতী আজ তাহার পক্ষে নভঃ সঞ্চারিণী মৌদামিনীবৎ দুঃপ্রাপ্য । তিনি পত্নীকে সাধনার সহচরী—আত্মার সঙ্গিনী করিয়া গঠিত করিয়াছিলেন । স্তন্যদায়ী সেই আয়ত চঞ্চল ভঙ্গিময় কৃষ্ণতার নেত্রযুগল, সেই মৃণাল গঞ্জিত চম্পক রাগরঞ্জিত



সুকোমল বাহুবল্লরী, সেই নব কিশলয় কোমল গণ্ডস্থল, সেই আকৃষ্ট প্রাণান্ত, অর্কেন্দু সদৃশ স্ত্রীম ললাট, আর সেই তবঙ্গিত সাগর ফেণনিত উষাবাগ দীপ্ত, উছল ভূষিত হৃদয়, লোচনের ভক্তি লুক্ক চিত্তকে এক-মুহূর্তের জন্তও বিচলিত করিতে পাবে নাই। অথচ পত্নীর প্রতি তাঁহার অনুবাগ কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার বঙ্গবিখ্যাত মহাকাব্য চৈতন্যমঙ্গলে এই পত্নীর প্রেমের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

( ৭ )

লোচনদাস—বাল্যালীর গৃহে গৃহে উদার বৈষ্ণব ধর্ম প্রচাৰ কবেন। তাঁহার গৌরভক্তিতে বঙ্গদেশ একদিন প্লাবিত হইয়াছিল। ঠাকুর নরহরির— ইচ্ছা ছিল বঙ্গভাষায় “গৌরলীলা” প্রকাশিত হয়, মহাত্মা লোচন দাস—শুধুর সেই আশা আগ্রহের সহিত পূর্ণ করিয়াছিলেন।

“চৈতন্যমঙ্গল” বৈষ্ণব সাহিত্যে একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। ইহা আদি মধ্য অন্ত এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যের সমস্ত লীলাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। অনেকের অনুমান—মুরারিগুপ্তের সংস্কৃত “চৈতন্য-চরিত” অবলম্বনে—লোচন চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। এখনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পঁচালীরূপে “চৈতন্যমঙ্গল” গীত হয়। এই গ্রন্থে ইতিহাসের নীরস অস্থিপঞ্জর, ভাবপ্রবাহে সরস ও কবিত্ব কল্লনাব অপকণ লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়াছে। যে প্রস্তাবের উপর বসিয়া লোচন দাস ইহা বচনা করেন, বৈষ্ণবগণ আজিও তাহা সমস্তে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। \*

\* মহাপ্রভু নির্ভ্যান্দের আদেশে বৃন্দাবন দাস একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, ঐ গ্রন্থের নামও “চৈতন্যমঙ্গল” ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ববর্ত্তে বিষ্ণুপ্রিয়া সহিত গৌরান্দ্র দেবের যে সফল বথাবর্ত্তা হয়, লোচনদাস সাধনপ্রভাবে তাহা অবগত হইয়া লিপিবদ্ধ করেন। বৃন্দাবন দাস এ ঘটনা লিখেন নাই। ইহার যথার্থ্য লইয়া উভয় কবির মধ্যে তর্কযুদ্ধ হয়। শেষে বৃন্দাবনের জননী নাবায়ণী দেবী—লোচন-লিখিত ব্যাণীব স্তম্ভ বলিয়া প্রকাশ বিল, বিবাদ মিটিয়া যায়। সেইদিন হইতে বৃন্দাবনের গ্রন্থের নাম “চৈতন্য ভাগবত” রাখা হয়, এবং লোচনের গ্রন্থ “চৈতন্যমঙ্গল” নামে খ্যাতি লাভ করে।

“চৈতন্যমঙ্গল” বৈষ্ণবের সাধনার ধন, ইহার ভাষা প্রেমের ভাষা, ভাব সর্বস্ব হৃদয়ের ভাষা।

“চৈতন্য মঙ্গল” ব্যতীত—“দুর্লভ সার” “রাগ লহরী” “বস্ত্ততত্ত্ব সার”, “আনন্দ লতিকা” “প্রার্থনা” “শ্রীচৈতন্য প্রেমবিলাস” ও দেহ-নিকপণ—এই সাতখানি গ্রন্থ লোচন দাস রচনা করিয়াছিলেন।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে, ২৯শে পৌষ,—৬৬ বৎসর বয়সে, লোচনদাস লোকান্তরিত হ’ন। তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে অজয়নদের তীরস্থিত প্রসিদ্ধ “লোচন ডাঙ্গায়” দিবসত্রয়ব্যাপী এক বহু জনাকীর্ণ মেলা বসিয়া থাকে। ঐ মেলায় অনেক সাধু ভক্তের সমাগম হয়। লোকে ঐ মেলাকে “উজানীর মেলা” বলে।

কোণার্মের কুন্ডুর নদীর তীরে, লোচনের সমাধি বর্ত্তমান। বহু দূর-দেশাগত ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিদিন এই সমাধি পূজিত হয়। সমাধির স্থানটী কবির সমাধিরই উপযুক্ত, উপরে—আকাশের চন্দ্রাতপ, পার্শ্ব দিয়া প্রসন্নসলিলা তটিনী কলতানে প্রবাহিতা, চারিদিকে শ্রামল তৃণক্ষেত্র। সমাধি প্রদেশ কুন্ডমিত মাধবীলতায় বেষ্টিত—সেই মাধবী ফুল প্রকৃতির পুষ্পাঞ্জলির মত সমাধির উপর অহর্নিশি বরিয়া পড়িতেছে! দেখিলে নয়ন সার্থক হয়, অধম মনুষ্যজন্মকে কত গরীয়ান্ বলিয়া মনে হয়।

# গুরু নানক

( ১ )

নিয়তির অনন্ত শক্তির মহিমায় কাগাবের তটে হিন্দুদেব বিজয় বৈজয়ন্তী ধরাশায়ী হইলে, এক নূতন জাতি ভাবতে প্রবেশ করিল। হিন্দু পরিষ্কালিত স্বর্ণভূমিতে আবাব ধর্ম্য বিপ্লবের সূত্রপাত হইল।

তখন হিন্দুগণ এই রণদক্ষতায় ক্ষত্রিয়স্পর্ধি নূতন জাতির অভ্যুত্থান বিশ্বয়াকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কপিলাবস্ত্র হইতে সমুৎথিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপ ক্ষণক্ষুর্তিমান জল-বিষের গ্রায় সময়ের অনন্ত বাবি প্রবাহে মিশিয়া গিয়াছিল; ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবও স্থিররশ্মি দীপমালাব গ্রায় যুহু আলোক প্রদান করিতেছিল, ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশ, বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতি ও বিভিন্ন নরপালের অধীনে থাকিয়া, পবস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এইকপ শুভলগ্নে, নূতন জাতি দৃঢ়হস্তে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা ধরিয়া, ভারত-বাসী নরনারীকে আপনার ধর্ম্মে আনয়ন করিবার জগ্ৰ যত্নশীল হইয়া উঠিলেন। মোল্লা, পীব, সৈয়দগণ—মহম্মদের ঈশ্বরত্ব ও কোরাণের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্ম শীত-সঙ্কুচিত বুদ্ধের মত জড়সড় হইয়া পড়িল। এই সংঘর্ষে ধর্ম্মের একতা, উদারতা ও নিষ্ঠা অনেকাংশে তিরোহিত হইল। কেহ কেহ ‘নূতন ধর্ম্ম’ বিদেশী ধর্ম্ম গ্রহণও করিল।

জাতিভেদের অহুশাসনের আবর্তে পড়িয়া ভাবতবাসী ঘূর্ণমান হইতে-ছিল, মুসলমান ধর্ম্ম অবসন্ন সম্প্রদায়কে জাতিভেদেব অপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। উদাবতার অভাবে সম্প্রদায় কিন্তু তৃপ্তিলাভ

করিতে পারিল না, নূতনেব মোহ কাটিলে আবার লোক নূতনের জ্ঞাত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই উত্তেজনার সময় ধর্মবিষয়ে উদারতা ও সরলতা দেখাইবার জ্ঞাত মহাত্মা নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাবা নানক শিখসম্প্রদায়ের আদি গুরু। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে এক অতি দরিদ্র ক্ষত্রিয় কুলে তাহার জন্ম হয়। জন্মস্থান লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণবর্তী কাণাকুচা গ্রাম। পিতার নাম কান্থ বেদী, মাতার নাম রিবা।

( ২ )

নানকের বংশের উপাধি “বেদী”। এই উপাধি সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। ঐ কিম্বদন্তী প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে পাঠকগণের সমক্ষে বিবৃত কবিরাম।

রামায়ণের রহস্যবিদ পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন—রামচন্দ্র ভগবানের অবতার। সীতা দেবীর গর্ভে রামচন্দ্রের যে দুই যমক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেব একেব নাম “লব” অত্রের নাম “কুশ”। লব-কুশ বয়োপ্রাপ্ত হইলে, স্ব স্ব নামে দুইটা রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুশ-প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম—কুশাবতী। ইহা ফিরোজপুরের দ্বাদশ দূর্বতী স্থানে অবস্থিত। লবের রাজধানীর নাম—“লবকোট”। এই নগর বর্তমান সময়ে “লাহোর” নামে পরিচিত।

কালক্রমে কুলপুত্র নামক জনৈক নৃপতি কুশাবতীর এবং কুলরাও নামক লবের এক বংশধর, লাহোরের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। কুলপুত্রের বিষয় লিপ্সা অত্যন্ত বলবতী ছিল, তিনি লাহোরাধিপতি কুলরাওকে সাদবে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য ক্রমে, কুলরাও পরাজিত ও দেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন। দক্ষিণাপথের প্রতাপশালী মহীপাল অমৃত, কুলরাওকে আশ্রয় দিলেন। শুধু আশ্রয় নহে, মহারাজ মহীপাল নিজের একমাত্র কন্যাকেও—কুলবাওর হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

মহাবাজ অমৃত পবলোক গামী হইলে, তদীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যেব একমাত্র উত্তবাধিকারী হইয়া, বাজ জামাতা কুলবাও বাজ্য শাসন কবিতে লাগিলেন । অমৃত-কল্পার গর্ভে কুলবাস্ত্রয়েব এক সন্তান জন্মিল । রাজা রাণী সন্তানেব নাম বাখিলেন “মদীবাও” ।

কুলরাওব মৃত্যুব পব মদীবাও দক্ষিণাপথের অধিপতি হইলেন, তাঁহাব অধিকাব আৰ্য্যাবৰ্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তাব লাভ কবিল । এই সময় একজন অমাত্য বাজপদে নিবেদন করিল—“মহারাজ ! আপনি অসংখ্য জনপদেব শাসন কর্তা, কিন্তু এখনও আপনাব পৈত্রিক বাজ্য “লাহোব” আপনাব হস্তগত হয় নাই ।” মন্ত্রী উত্তেজনায বাজা পঞ্জাব আক্রমণ কবিলেন । এই যুদ্ধে কুলপুত্র পবাত্ত হইলেন । মদীবাওব প্রবল প্রতাপ সহ্য কবিতে না পাবিয়া, কুলপুত্র ছদ্মবেশে নানাস্থানে পর্য্যটন কবিয়া, হিন্দুর প্রধান তীর্থ বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন ।

( ৩ )

পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে পদার্পণ কবিয়া কুলপুত্রেব স্তান চক্ষু উন্মীলিত হইল । তিনি দেখিলেন—কাশী স্তান গবিষ্ঠ মুক্তিব স্থান । অন্তর্পূর্ণা ও বিশ্বেশ্বর মূর্তি দর্শনে তিনি বড় তৃপ্তি পাইলেন । স্থান মাহাত্ম্যে—তাঁহাব মন হইতে বিষয় বাসনা একেবাবেই দূব হইয়া গেল ।

সাধু সন্ন্যাসী, দণ্ডী প্রভৃতি বিষয় বিবাগীদেব সহবাসে থাকিয়া তিনি শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন । তাঁহাব মতি গতি ফিবিয়া গেল । তিনিই একদিন পিতৃসঙ্ঘ হইতে কুলরাওকে বঞ্চনা কবিয়া “লবকোট” অধিকার কবিয়াছিলেন—পবস্ত্র হবণ কবা—মহাপাপ, এই সকল অতীত ব্যবহাব স্মরণ কবিয়া তাঁহাব বুক ফাটিয়া বাইতে লাগিল । হায় ! কুলবাও আর তো বাঁচিয়া নাই, বাঁচিয়া থাকিলে, এখন সমস্ত আত্মাভিমন বিসর্জন দিয়া কুলপুত্র কৃতাপবাদেব জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা কবিতেন ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—অনুতাপে । কুলপুত্র, কুলরাওর পুত্র মদী-  
রাত্তর কাছে আসিয়া আপনার দোষ স্বীকার করিয়া কতই ক্রন্দন  
করিলেন । মহানুভব মদীরাও কুলপুত্রকে ক্ষমা করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে  
লাহোরের সিংহাসন অর্পণ করিলেন । সততায় চিরবিবাদ মিটিয়া  
গেল ।

মঙ্গল ব্রত শুচিকায় কুলপুত্র মদীরাত্তব সভায় গিয়া প্রথমেই বেদপাঠ  
করিয়াছিলেন । এইজন্ত মদীরাও কুলপুত্রকে “বেদী” উপাধি দান  
কবেন । সেই অবধি কুলপুত্রের বংশধরগণ “বেদী” উপাধিতে অলঙ্কৃত  
হইয়া আসিতেছেন । নানকের পিতা কানু এই বংশের সম্মান বলিয়া  
লোকে তাঁহাকে “বেদী” বলিত ।

এই কৌতুককর জনশ্রুতির সাহায্যে বুঝা যাইতেছে—শিখসমাজের  
নেতা নানক সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

( ৪ )

নানকের জীবনবৃত্তেব সহিত অনেক অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণ  
দেখিতে পাওয়া যায় । বাহাবা জগতসমক্ষে অসামান্য কার্য্য সম্পাদন  
করিয়া আপনাব প্রভাব সংস্থাপিত করেন, মানব কল্লনা তাঁহাদিগের  
কাৰ্য্য পরস্পরকে ঐশী শক্তি মণ্ডিত করিয়া অভিশয়োক্তিতে দেবতা  
বলিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকে । নানকের জীবনও অনেক  
কাল্লনিক ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ । সে সকল অমাহুযিক ব্যাপারের  
অনুসরণ না করিয়া আমরা কেবল মহাত্মা নানকের জীবনবৃত্তের  
স্থূল বিবরণ বর্ণনা করিব ।

গুরু নানক অতি অল্পবয়সে অল্প সময়ের মধ্যেই গণিত ও পারস্ত  
ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন । অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার প্রভা  
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল । তিনি স্বভাবতঃই গুচ্ছাচার চিন্তাশীল ও

দয়াপ্ৰবণ ছিলেন। এই সকল অভ্যুদায় শুনে সকলেই তাহাকে ভাণ্যাসিত।

বান্ধবেদা অত্যন্ত দৰিদ্ৰ ছিলেন। সংসারের অচ্ছলতাৰ ব্যথিত ২০০০ টাকার পুত্রের মরণোত্তর হইলেন। পুত্র উপাৰ্জন কৰিয়া টাকা আনয়নে গাৰ্হাৰ্য্য সমস্ত অভাব দূৰ হইবে—এই ভবসায় কাণ্ডো পত্ৰকে চাইলেন। দিয়া লবণ ব্যবসায়ের পৰামৰ্শ দিলেন। নানক ১০। লক্ষ্য লবণ কনিষ্ঠ জন্তু বিদেশে যাত্রা কৰিলেন।

পৰ্ব্বতী শোণন গ্রামে নানককে বাত্ৰিৰাপন কৰিতে হইল। এই গ্রামে কেবল নানক দৰিদ্ৰেব বাস। গ্রামের অবস্থা দেখিয়া, নবনাবীর বুদ্ধিৰূপ হঠাৎবাৰ শুনিয়া নানকেব তৰুণ হৃদয় কৰুণায় ভৰিয়া উঠিল। তিনি ছাব স্থিৰ থাৰিতে পাৰিলেন না। আত্মবিস্মৃত হইয়া—লবণ ক্ৰয়েব জন্তু সংগৃহীত ২০০০ টাকা দৰিদ্ৰ সেবায় বাৰ কৰিয়া, বিক্ৰহস্তে হুটুৰিতে গঠ দিলেন। বলা বাহুল্য গিত্ৰামাতাব কাছে তাহাব আৰ লাক্ষ্য সাম্য বৰ্হিল না।

( ৫ )

১০০০ সৰ্ব্বসাৰ্বক ভোগতৃষ্ণায় তাঁহাব অত্যন্ত বিবক্তি জন্মিল। পিতা এ. উদাসী পত্ৰকে বিষয়বন্ধনে বাধিবাব জন্তু পুত্ৰেব বিবাহেব উদ্যোগ কৰিলেন। নানকেব বংশগৌৰব এবং বিদ্যার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল, স্ত্ৰবাব পাৰাব অভাব হইল না। ১৪১১ শকে, এক সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দৰী বালিকাৰ সঙ্গে নানকেব বিবাহ হইল, কিন্তু তাঁহাব সংসার বিবাগ চুচিল না।

ক্ৰমে এই পত্নীৰ গৰ্ভে, নানকেব দুইটী পুত্র জন্মগ্ৰহণ কৰিল। পুত্ৰ-দ্বয়েব মধ্যে জ্যেষ্ঠ—শ্ৰীচাঁদ, ভবিষ্যতে পিতৃপদানুসৰণে সংসাবত্যাগী পন্নাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্ৰ লক্ষ্মীদাস গৃহবাসী হইয়াছিলেন।

ত্রিচাঁদের ধর্মচাঁদ নামে এক পুত্র হয়, এই পুত্রই উল্লাসী সন্ত্রাসের প্রবর্তক। এখনও ধর্মচাঁদের বংশধবগণ নানকপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি নানকেব অভ্যাসের পূর্বে, হিন্দুধর্ম ও মুসলমান-ধর্মের বিরোধ প্রতিনিবৃত্তি চলিতেছিল। যৌবনে নানক এই উভয় ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁর ধর্মপিপাসা কিছুতেই শান্ত হইল না। নানক দেখিলেন,—উভয় ধর্মের মধ্যেই অস্বাভাবিক ও কুসংস্কারপূর্ণ লৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের অত্যন্ত প্রচা-  
রিত। যাহাতে হ্রদে শান্তিলাভ হয়, যাহাতে পবিত্র ও উদার ক্রিয়াকর্ম তত্ত্ব প্রচা-  
রিত হয়, নানক তাঁর জন্ম আশ্রয়মণ্ডল পরিত্যাগ করেন। তিনি জাতি-  
গত, সম্প্রদায়গত ও অনুশাসনগত সর্ববিধ নৈষয়্য ত্যাগ করিয়া  
সমদর্শী প্রণালীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নানকে এই সাধু-  
চেষ্টায়, স্বর্গ হইতে অর্ধদৈর্ঘ্য বিশেষভাবে শুভ আশীর্বাদ বর্ষিত হইল।

মহাত্মা নানক হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই প্রিয় করিয়া গর্বস্বর  
ভাভাবে সম্মিলিত কবিবাব জন্ম ব্যাকুল হইয়া সন্ন্যাসোপদেশ দেশে দেশে  
ভ্রমণ করিলেন। ভারতের বোগচাবী সন্ন্যাসী আব্রোপকলের সর্বত্রাগী  
ককিব সকলেই কার্যকলাপ দেখিয়া নানক বড় হতাশ হইয়া পড়িলেন।  
কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞানের প্রকৃত আভাস পাঠিলেন না। সর্বত্রই  
কুসংস্কার, সর্বত্রই কর্মকাণ্ডের শোচনীয় বিকল,—নানক ক্ষুব্ধচিত্তে  
স্বদেশে ফিবিয়া আসিলেন। শেষে সন্ন্যাসধর্ম, গৈবিক বেশ পবিত্রাঙ্গ  
করিয়া গুরুদাস পূজেনার ইবাবতী তটস্থিত কীর্তিপুবে প্রস্থান করিলেন।

কীর্তিপুবে নানক এক ধর্মশালা স্থাপন করিলেন। এই স্থানেই  
তাঁহার উদার ধর্ম মত সাধারণের কাছে প্রচা-  
রিত হইল। নানকেব পূর্বে  
যাঁহা ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন,—এক একটা নির্দিষ্ট দেবতাকে  
অধিষ্ঠাত্রী করিয়া, তাঁহারা আব্রোপায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানক



তঁাহার শিষ্যমণ্ডলীকে বুঝাইলেন—“বাহু আড়ম্বর নিষ্ফল, কেবল একমাত্র অন্তঃসুদ্ধিই ধর্ম্মাচরণের মুখ্য সাধন ।”

রামানন্দের রামসীতা, গোরক্ষনাথের শিব, কবীরের বিষ্ণু, চৈতন্যেব বঙ্গভাচার্য্যের গোপাল—ইঁহারা সকলেই অতীন্দ্রিয়, অনাদি, অনন্ত ও অসীম ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, এই সকল সাম্প্রদায়িক মত নানকের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা বলে সুসংস্কৃত ও সংশোধিত হইয়া নব ধর্ম্মমত স্থাপিত হইল। এই ধর্ম্মমত, অতি উদার পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের অনেক লোক নানকের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ধীরবুদ্ধি নানকের হৃদয়ে, সংকীর্ণতা ছিল না,—তিনি লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ স্থূল সূক্ষ্ম সকলকেই একক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া ভ্রাতৃত্বাবে আলিঙ্গন করিলেন। তঁাহার অকপট প্রেমভক্তিতে, তঁাহার অকুণ্ঠিত সরলতায়, তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর শিরায় শিরায় অচিন্ত্যনীয় উৎসাহ শক্তি বিদ্যুৎদ্বয়ে সঞ্চারিত হইল।

কীর্ত্তিপূরের ধর্ম্মশালায়, নানক সপরিবারে বহুশিষ্যে পবিত্র হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করেন। ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে, এই স্থানেই বাবা নানকের পবিত্র নিষ্কলঙ্ক জীবন-স্রোত অচিন্ত্য অগম্য অমৃত প্রবাহে মিশিয়া যায়। তখন তঁাহার বয়স ৭০ বৎসর।

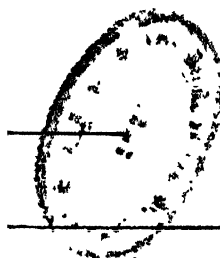
শুক নানকের অভ্যুদয় কাল—লোদীবংশের প্রাচুর্ভাবের সময় ; তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন—মোগল বংশের অভ্যুদয়ের পর। ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও ধর্ম্মচিন্তায় তঁাহার জীবিত কালের যষ্টীবর্ষ পঞ্চ মাস ও সপ্তদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। বাবা নানক হইতেই শিখজাতির উৎপত্তি এবং অভ্যুদয়। ভারতের পরাধীনতা সময়ে, নানকের সযত্ন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, বিষয় নিম্পৃহ তপস্বীর ত্রায় ধীরে ধীরে যৌগমার্গ অবলম্বন করিয়া পরিশেষে এক মহাপ্রতাপশালী মহান্ জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

নানকের ধর্ম ক্ষুদ্র সলিল বেথার মত পৃথিবীর একাংশে শোভা পাইতেছিল, আজকাল তাহাকে আবর্তময়ী মহা তরঙ্গিণীতে পরিণত করিয়াছে ! নানকের অভ্যুত্থান—জাতীয় ইতিহাসের একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য অধ্যায়। বিশ্ববরেণ্য নানকের সম্প্রদায় এক সময় ভারত-সাগরে জলবুদ্ধদের মত উৎখিত হইয়াছিল, প্রথমে লোকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বয়স্তিমিত নয়নে চাটিয়া দেখিবার অবকাশও পায় নাই। কালমাহাত্ম্যে সেই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ ওয়াটালু বিজয়ী ব্রিটিশ তেজেবও সম্মুখীন হইয়াছিল। এখনও পঞ্জাবের প্রতিগৃহে প্রভাত সন্ধ্যায় ধ্বনিত হয়।

বিনাগুরু পুরে নাহ্ উধার,  
বাবা নানক আখোয়া এহি বিচার ।

পূর্ণ গুরু ভিন্ন কাহারও উদ্ধার নাই, বাবা নানক বিচারপূর্বক একথা বলিয়াছেন !

বলা বাহুল্য, রামানন্দ, গোরক্ষনাথ ও কবীর যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, বাবা নানক আপনার অপ্রতিহত প্রভাববলে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন ! \*



\* কাহারও কাহারও মতে নানকের জন্মস্থান—ইরাবতী ও চম্রভাগার মধ্যবর্তী ভনবন্দী নামক গ্রামে। কিন্তু এ মত সর্ববাদীসম্মত নহে। ভনবন্দীতে নানকের পিতা বাস করিতেন। কানাকুপ গ্রামে মাতুলগণে নানকের জন্ম হয়।

# সাধক শ্রেষ্ঠ মহাত্মা কবীর

( ১ )

আমাদের দেশে মহাত্মা কবীরের কাহিনী কেবল “ভক্ত মালোব” গুণ্য কথায় দেখিতে পাওয়া যায়। কবীরের বাণ্য জীবনী, লোক-বিশ্বাসের আভনব গুজবের অনন্ত ভাণ্ডার! সে সকল অলৌকিক ঘটনা—বিংশ শতাব্দীর বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, কবীর যে ভাবতেন তাহাশাসে একটী পূণোজ্জ্বল অমর নাম অঙ্কিত কবীর গিয়াছেন—একথা অস্বীকার কবীরের যো নাই। আমরা “ভক্তমাল” হইতে কবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সংকলন করিলাম।

এক্ষণে কোন কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—কবীরের জন্ম যবনকুলে। কিন্তু তিনি ত্রেতাযুগের বামদেবের একজন পবন ভক্ত ছিলেন। সুকুমার শৈশবেই তাহার নিম্নলিখিত নবনাবায়ণ বামের নামে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য অনেকেই ধাবণা—কবীর হিন্দুবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। বিধিবিধানায় হয়তো তাহার পিতামাতা মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হ’ন, সেই অবধি কবীরকে যবন আখ্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। \*

কবীর যখন নিতান্ত বালক—বয়স ৫৬ বৎসর মাত্র, তখন হইতে রামের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। শিশুর অসামান্য ধর্ম্মানুবাগ দেখিয়া ভগবান রামচন্দ্র কবীরকে স্বপ্নে দেখা দিয়া রামানন্দের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের আদেশ দেন। কিন্তু যবনকুলজাত বলিয়া যদি “রামানন্দ”

---

\* ভক্তমালগ্রন্থেও কবীর যবন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

কবীবকে শিষ্যশ্রেণীতে স্থান না দেন, সেই ভয়ে কবীব “বামানন্দের সহিত  
সাক্ষাৎ কবিত্তে সাহস ববিলেন না । এইভাবে কিছুদিন কাটিল ।

দীক্ষা গ্রহণ না কবিলে শবীব বিশুদ্ধ হয় না, লোকেব তখন ইহাট  
বিশ্বাস ছিল । কবীবও বুঝলেন তাহাকে মদ্য লইতে হইবে, নতুবা  
সাধন-পথে অগ্রসব হইবাব তাঁহাব ক্ষমতা জন্মবে না । কবীব দীক্ষা  
গ্রহণেব উপায় চিন্তা কবিত্তে লাগিলেন । পতিস্তা কবিলেন—“যখন  
ঈশদেবব অনুমতি পাউয়াছি, তখন যেমন কবিয়া হউক বামানন্দের শিষ্য  
হইব” ।

বামানন্দ তখন হিন্দুব মহাতীর্থ বাবাণসী ধামে বাস করিতেন ।  
কবীব গুরুব উদ্দেশে সংসাব ত্যাগ কবিয়া কাশী যাত্রা কবিলেন ।

কাশীব “মণিকর্ণিকা” ঘাট—সাধকেব চক্ষে বড় পবিত্র স্থান ।  
এই মণিকর্ণিকায় বামানন্দ প্রত্যহ ব্রাহ্মযুহুর্ন্তে স্নান কবিত্তে আসিতেন ।  
কবীব ইহা জানিত্তে পাবিলেন । একদিন গভীব বাত্রিকালে কবীব  
পুণ্যসলিলা মণিকর্ণিকাব সোপানতটে শয়ন কবিয়া বহিলেন, অন্ধকাব  
থাকিত্তে থাকিত্তে “বামানন্দ” স্নান কবিত্তে আসিতেন । সেদিনও  
যথাকালে “বামানন্দ স্নান কবিত্তে আসিলেন, ঘাটে নাগ্নিতে নামিত্তে  
সোপানতটশাযী কবীবেব অঙ্গে তাঁাব চবণ স্পর্শ হইল । বামানন্দ  
শব্দেহ মনে কবিয়া “বাম কহ” বলিয়া সরিয়া গেলেন, কবীবেব প্রাণেব  
কামনা পূর্ণ হইল । গুরুব পদবেগুতে শুদ্ধকায় হইয়া কবীব নিৰ্জ্জনে  
কুটিব বাধিয়া দিবানিশি মহামন্ত্র “বাম” নাম জপ কবিত্তে লাগিলেন ।

( ২ )

শুভক্ষণে যবন কবীবেব শ্রবণমূলে, বামানন্দের মুখোদ্গীর্ণ “বাম কহ”  
শব্দ প্রবেশ কবিয়াছিল । সেইদিন হইতেই কবীবেব নবজীবন আরম্ভ ।  
কবীব কৌপীন, তিলক ও মালা ধাবণ কবিয়া ভক্তসমাজে প্রবেশ কবি-

লেন। অচিবেই লোকে তাঁহাকে পবন বৈষ্ণব বলিয়া আদর কবিত্তে লাগিল।

পুত্র বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন কবিয়াছে—কবীবের পিতামাতা শীঘ্রই এ সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা কাশীতে আসিয়া কবীকে গৃহে ফিবিবাব জন্ত অনুরোধ কবিলেন। কবীবের শৈশব সহচরগণ কবীকে সুন্দরী সহধর্মিণী ও নানা ঐশ্বর্য্যের ওলাভন দেখাইল। কবীর কিছুতেই ভুলিলেন না, তিনি বন্ধুগণকে স্পষ্টই বলিলেন—

নাবী কি ঝাঁই পডত্ অঁধে হোত ভুজঙ্গ ।

কবীর তিন্বে কোন গতি নিত্ নাবীকে সঙ্গ ॥

নাবীর ছায়া সর্পের দেহে পতিত হইলে, সে সর্পও অন্ধ হইয়া যায়।  
হায় ! নিত্য যে এমন নাবীর সঙ্গে বাস কবে, তা'ব কি গতি হয়—  
ভাবিয়া দেখ !

কবীর আব গৃহে ফিবিলেন না। আত্মীয়স্বজনগণ বিফলমনোবথ হইয়া কবীকে ছাড়িয়া প্রস্থান কবিলেন। কবীবের পিতামাতা ত্রিভঙ্গ কবিয়া বলিলেন—

“আপনার ঠেমান্ ছাড়ি লৈলি হিন্দুধর্ম ।

কে তোবে শিখাইল কবিত্তে হেন কর্ম ৭”

মাতৃভক্ত কবীর মাতাব নিকটে অকপটে স্বীকাব কবিলেন, “মা ! আমি রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, সাধক চূড়ামণি বামানন্দ স্বামী আমাব গুরুদেব। আমি আর গৃহে ফিবিব না, এই কাশীতে থাকিয়াই সাধনা করিব, তোমরা ফিরিয়া যাও।

( ৩ )

আশ্রমে বসিয়া স্বামী বামানন্দ শিষ্যগুলীকে নিকাম ধর্মের মর্ম বুঝাইতেছিলেন, এমন সময় এক প্রৌঢ়া রমণী বামানন্দের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সহস্র কোলাহল সঙ্কুল নগরের প্রান্তভাগে—অতি মনোবম স্থানে স্বামীজিব আশ্রম। রমণী আশ্রমের প্রাঙ্গণে এক বৃক্ষতলে বসিয়া রামানন্দের জ্যোতির্শ্ময় মুখচ্ছবি দেখিতে লাগিলেন। সহসা রমণীর প্রতি বামানন্দের দৃষ্টি পতিত হইল। বামানন্দ জনৈক শিষ্যকে রমণীব পবিচয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু শিষ্যের নিকট রমণী আত্ম পবিচয় প্রদান করিলেন না। তিনি ধীবে ধীরে বামানন্দের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

রমণী বামানন্দকে প্রণাম করিলেন না। তাঁহার এই ব্যবহারে স্বামীজির শিষ্যগণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন, একজন পক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—“তুই কে মাগী? গুরুজীকে একটা প্রণামও কবলি না?”

রমণী গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন—“কাফেরের গুরুকে আমি মুসলমানী হইয়া প্রণাম কবিব?” শিষ্য বলিল—“তুই যবনী? তবে হিন্দুব আশ্রমে আসিয়াছিস কেন? তোব এখানে কি আবশ্যক?” রমণী কহিলেন—“তোমাদের গুরু আমার ছেলেটাকে কাফেরের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন কেন?” রমণীর কথা শুনিয়া রামানন্দ বলিলেন—“আমি মুসলমানকে কখনও শিষ্যত্বে গ্রহণ করি নাই। তোমার পুত্র কে? আমি তাহাকে জানি না।”

ঠিক এই সময় মহাত্মা কবীর আসিয়া রামানন্দের চবণে প্রণাম কবিলেন।

রামানন্দ কবীরকে কখনও দেখেন নাই, স্তব্ধবাং অবাক হইয়া আগন্তুক যুবাব মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কবীরের বৈষ্ণবের বেশ দেখিয়া শিষ্যগণ সসম্মুখে তাঁহাকে আসন প্রদান কবিল। সেই সময় রমণী বলিলেন—“এই আমার পুত্র। ইহাকেই তোমরা কাফেরের মন্ত্র দিয়াছ।”

রামানন্দের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। তিনি সবিস্ময়ে কবীরকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—“বাপু! আমি এ রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

দেখিতেছি তোমার হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ ! আমি তোমাকে পূর্বে কখনও দেখি নাই, অথচ তোমার মাতা অল্পযোগ করিতেছেন আমি তোমার তোমার পিতৃধর্ম হইতে ধর্মাস্তরিত করিয়াছি।”

তখন কবীর রামানন্দের চরণে পতিত হইয়া পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কবীর মণিকর্ণিকার ঘাটে শুইয়া ছিলেন, প্রত্যাষে স্থান করিতে আসিয়া রামানন্দ কবীরের দেহে চরণ স্পর্শ করেন, তারপর অপবিত্র শব্দেহ মনে করিয়া রামানন্দ—“রাম কহ” বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া যান। সেই অবধি কবীর রাম মন্ত্র সাধনায় জীবন উৎসর্গ কবিয়াছেন। কবীর সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

সে সকল শুনিয়া রামানন্দের আর আনন্দের সীমা রহিল না। রামানন্দ উঠিয়া কবীরকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“ধন্য বৎস ! ধন্য তুমি, তুমি কখনও যবন নও। তুমি ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, আজ আমি সর্বসমক্ষে তোমায় শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। আজ বুঝিলাম—স্বয়ং ভগবান তোমায় রূপা করিয়াছেন।” রামানন্দেব স্বর কাঁপিতে লাগিল। তিনি কবীরকে ক্রোড়ে তুলিয়া শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বৎসগণ ! আজ তোমাদের সুপ্রভাত ! আজ কবীরের শুভাগমনে এ আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। তোমরা এই মহাত্মার পদধূলি লও ! ভক্তিসঙ্কেতঃ—হিন্দু যবনে প্রভেদ নাই। আমার রামচন্দ্র চণ্ডাল কন্যার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছিলেন।”

কবীরকে পাইয়া শিষ্যগণ সেদিন মহোৎসবের আয়োজন করিল।

কবীরের মাতা কবীরকে ফেলিয়া গৃহে যাইতে চাহিলেন না। রামানন্দ অনেক বুঝাইয়া কবীরকে মাতার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। রামানন্দ কবীরকে উপদেশ দিলেন—মাতাকে কখনও কষ্ট দিওনা, সংসারে

থাকিয়াও ধর্ম সাধন হয়, যাও বৎস! দেশে ফিরিয়া যাও, আবার এখানে আসিও।”

ভক্ত কবীর গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। মাতাপুত্রে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

( ৪ )

কবীরের পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কবীরের পিতা বস্ত্র বদ্বন করিয়া জী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতেন। বার্নিকোর ষষ্ঠীর গ্রাসে পিতাকে সামর্থ্যহীন দেখিয়া কবীরও তন্তুবায়ের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার উপর সংসারের ভার পড়িল।

কবীর যখন বস্ত্র বুনিতেন তখন তাহার মুখ দিয়া কেবল রাম নাম বাহিব হইত।

একদা কবীর একখানি বস্ত্র লইয়া নগরের বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। বস্ত্রখানি তাঁহার নিজের বোনা। কবীর খরিদারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একজন বৈষ্ণব আসিয়া বাঁলল, —“বাবা আমার ঐ কাপড়খানি দাও।” কবীর ভিক্ষুককে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সেই বস্ত্র খণ্ড বৈষ্ণবকে দান করিলেন।

দান করিয়া কবীর বড় বিভ্রাটে পড়িলেন। তাঁহার ভাবনা হইল—কেমন করিয়া শূন্য হস্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন? বস্ত্র-বিক্রয় লব্ধ অর্থে আহাৰ্য্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া গেলে, তবে তাহাদের সংসার চলিবে। নহিলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে উপবাসী থাকিতে হইবে। ঐ বস্ত্র খণ্ডই আজ তাঁহার ভরসা ছিল, গৃহে তণ্ডুল কণার পর্য্যন্ত অভাব,—কবীর দশদিক শূন্য দেখিলেন। গৃহে যাইতে আর তাঁহার সাহস হইল না। বাটির পার্শ্ববর্তী কোন বনে বসিয়া কবীর রামনাম জপ করিতে লাগিলেন।

কবীরের ভক্তগণ বলিয়া থাকেন—ভক্তকে এইরূপ বিপন্ন সুখিয়া,



ভক্তবৎসল রামচন্দ্র কবীবের রূপ ধারণ করিয়া নানাবিধ আহাৰ্য্য লইয়া কবীরের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কবীরের পিতা মাতা অত জিনিস কখনও চক্ষে দেখেন নাই! দূব হইতে পিতা মাতার হর্ষোচ্ছাস শুনিয়া কবীর যেমন বাটীতে প্রবেশ করিলেন, ছদ্মবেশী রামচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ভগবানের অসীম দয়া দেখিয়া—কবীরের নেত্রযুগল প্রেমাশ্রুণীরে ভরিয়া উঠিল, তিনি—“হা প্রভো! কোথায় গেলে বলিয়া উন্মাদের মত চতুর্দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

সেই দিন হইতে কবীবের গৃহে অগ্নাভাব ঘুচিয়া গেল। কবীর নিশ্চিন্ত মনে ইষ্ট আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

( ৫ )

পূর্বেই বলিয়াছি কবীরের জীবনী অলৌকিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কবীর কোন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া সভাক্ষেত্রে সেচন করিতে লাগিলেন, রাজা কবীরকে উন্মত্ত মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ওরে পাগল! শুধু শুধু জল ছড়াইতেছিস কেন?” কবীর বলিলেন—“মহারাজ, ভগবানের শ্রীমন্দিরে আগুণ লাগিয়াছে, সেই আগুণ আমি নিভাইয়া দিতেছি, নহিলে সমস্ত পুড়িয়া যাইবে।” রাজা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কবীরকে সভা হইতে দূর করিয়া দিলেন।

অল্পদিন পরে রাজার কাছে সংবাদ আসিল, কবীরের কথাই সত্য। কবীর যে সময় রাজ সভায় সলিল সেচন করেন, ঠিক সেই সময়ে শ্রীমন্দিরে অগ্নি সংযোগ হইয়াছিল। মন্দিরের অর্দ্ধাংশ ভগ্নশেষ হইবামাত্র—দেবতার রূপায় প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, তাহাতেই ভগবানের বিগ্রহ ও লোকজনাদি রক্ষা পাইয়াছে।

তখন রাজার চৈতন্য হইল, তিনি সন্মতিক ভিখারী কবীরের শরণাগত

হইলেন । রাজাশ্বৰ বজ্রকিরীট—দরিদ্রের চরণে লুপ্তিত হইল । কবীর বাজা ও বাণীকে বামমস্ত্রে দীক্ষিত কবিলেন ।

ক্রম অনেকেই কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিল । হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কবীরকে পূজা কাৰ্য্যে লাগিল । কোন কোন দৃষ্ট প্রকৃতিব লোক কবীরের সাধুতা ও ইন্দ্রিয় সংযম পবীক্ষা কবিবার জন্য কবীরকে বেষ্ঠাও কুহকে ভ্লাইবাব চেষ্টা কৰিগাছিল, কিন্তু জ্ঞান গরিষ্ঠ কবীর সকল অগ্নি পবীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ।

( ৬ )

কবীর যখন জাতিভেদ ভুলিয়া হিন্দুমুসলমান উভয় ভ্রাতাকে স্নেহেব ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান কবিলেন, তাঁহাব মুখে “বাম নাম” শুনিয়া দেশ যখন সাম্যমস্ত্রে দীক্ষিত হইল, তখন ক্রুব কষ্টা কতিপয় ব্রাহ্মণ কবীরের উচ্ছদ কামনায় দিল্লীব বাদসাহেব শবণাগত হইলেন । এই বাদসাহ হিরণ্যকশ্বিপুব জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন, তাহাব উপব কোন কোন মুসলমানও কবীরের বিরুদ্ধে বাদসাহেব কাণ ভাবি করিয়া দিলেন ।

ব্রাহ্মণের অভিযোগ—“কবীর নীচ হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচাব করিতেছে—ইহাতে ধর্ম্মের মর্যাদা নষ্ট হইতে বসিয়াছে । মুসলমানেব আবেদন, “কবীর মুসলমান হইয়া কাফেরের ধর্ম্ম প্রচাব কবিতেছে, একপ ধর্ম্মদ্রোহীব প্রাণদণ্ড কবাই উচিত ।”

সম্রাটের দূত গিয়া কবীরকে ধরিয়া আনিল । কবীর প্রশ্নমুখে সম্রাটকে আশীর্বাদ কবিলেন । সম্রাট বলিলেন—“তুমি জাতিতে মুসলমান, তবে কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ কবিয়াছ কেন ?” মহাত্মা কবীর উত্তর দিলেন—“ধর্ম্মে জাতিভেদ আন কেন বাবা ! সব ধর্ম্মই এক ।” বাদসাহ কবীরকে “রামনাম” পবিত্যাগ কবিবার আদেশ কবিলেন । কবীর সম্মত হইলেন না । বাদসাহ নির্ভীক কবীরের কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ।

ভক্ত প্রফুল্লাদেব মত কবীবের নির্যাতন আরম্ভ হইল। তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সম্রাটের অনুচরগণ পৈশাচিক অট্টহাস্তে গগণ কম্পিত করিল,—কবীও ঐমুখে অগ্নিভিত্ত হইতে উঠিয়া আসিলেন। অগাধ সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও—কবীকে মৃত্যু হইল না। শত্রুবা পরাজয় স্বীকার করিল।

নিয়তিব অপ্রতিবিধেয় বিধান বলে, কবীবের অন্তিমকাল নিকটবর্তী হইল। কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর শিষ্যবর্গকে আপনাব আসন্ন মৃত্যুব কথা জানাইয়া সময়োচিত উপদেশ দিলেন। শিষ্যগণ কাঁদিতে লাগিল।

কবীর একখানি বস্ত্রে শবীর আবৃত কবির মৃত্যুকায় শয়ন করিলেন, আর কেহ তাঁহাকে উঠিতে দেখিল না। বামপদ ধ্যান করিতে কবিতে রামময় প্রাণ কবীর শান্তিধামে চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুব পূর্বে কবীবের শবদেহ লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধিল। হিন্দু বা শবকে দগ্ধ কবিবাব উদ্যোগ করিলেন, মুসলমানেরা কবীরের দেহ কববস্থ করিবাব আয়োজন কবিতে লাগিলেন। কেহ কাঠাবও কথা শুনিলা না, যুক্তি তর্ক, অনুন্নয় বিনয়—সমস্তই বৃথা হইল। কবীরের শবদেহের উভয় পার্শ্বে হিংসার জীবন্ত প্রতিকৃতিব ন্যায় বিলোল জিহ্বা শাণিত ছুঁকায়—স্বর্ধাকিবণ প্রতিফলিত হইয়া উঠিল! হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে—আক্রমণ কবিবার উদ্যোগ করিল

তখন গ্রামের প্রধান শান্তিবক্ষক সেই বিবাদস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—“হিন্দু, ক্ষান্ত হও, মুসলমান ক্ষান্ত হও, কবীর তোমাদের উভয় পক্ষের গুরু, সে সম্বন্ধে তোমরা পরস্পর ভ্রাতা, ভ্রাতৃত্বদ্রোহী হইয়া এমন পবিত্রস্থান কলঙ্কিত করিও না। এসো—সাধুর পবিত্র দেহ—নদী সলিলে ভাসাইয়া দিই।”

একথায় কোন পক্ষ আপত্তি করিল না। কিন্তু দেহাবরণ উন্মোচন করিয়া সকলেই দেখিল—কবীরের শব দেহ যেন যাতুমন্ত্রবলে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানেও তাহা আর পাওয়া গেল না। শেষে সেই শবাবরণ বস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করিয়, তাহার একাংশ হিন্দুরা চিতানলে দগ্ধ করিলেন, অপবাংশ লইয়া মুসলমানগণ মহাসমারোহের সহিত কবরস্থ করিলেন।

হায়! ধাম্বিক চুড়ামণি কবীর অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন, আছে তাঁহার “কবীরপন্থী” ধম্ম, আছে—তাঁহার অপূর্ব উপদেশপূর্ণ দোহাবলী, আছে—ভক্ত হৃদয়ে—তাঁহার অক্ষয় মধুব পবিত্র স্মৃতি।



# বৈদান্তিক রামানুজাচার্য

( ১ )

দাক্ষিণাত্যের চোলপত জেলায় শ্রীপবনন্দব বড় বিখ্যাত জনপদ । ইহা মাদ্রাজ সহবেব ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । এই নগবে—কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় আপস্তম্বীয় শাখাধ্যায়ী হাবীত গোত্রজ ব্রাহ্মণ কেশব ত্রিপাটী বাস কবিতেন । তাঁহাব পত্নীব নাম কান্তিমতী দেবী ।

এই কেশব ত্রিপাটীব ঔরসে, সাক্ষী কান্তিমতীব গর্ভে, ১০১৭ খৃষ্টাব্দে চৈত্র মাসেব শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবাবে, মধ্যাহ্নে, কৰ্কট লগ্নে—এক দেব শিশুব জন্ম হয় । সেই শিশুই ভাবত বিখ্যাত পণ্ডিতাগ্রগণ্য—শ্রীমৎ রামানুজ আচার্য ।

গর্ভাষ্টমে রামানুজেব উপনয়ন সংস্কাব হয় । উপনয়নেব পব তিনি পিতাব কাছে বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন কবেন । পাবলৌকিক পিণ্ডেব প্রলোভনে কান্তীমতী দশম বর্ষীয় বালক পুত্রেব বিবাহ দেন । রামানুজেব বয়স যখন ১৫ বৎসব—তখন কেশব ত্রিপাটীব মৃত্যু হয় । পিতৃভক্ত রামানুজ পিতাব শোকে, প্রথম বোঁবনে পত্নীকে ছাড়িয়া বিবাগী হইলেন । সংসাবে তাঁহাব আব আসক্তি বহিল না ।

( ২ )

তৎকালে কাকীপুবে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস কবিতেন—তাঁহাব নাম যাদব প্রকাশ মিশ্র । ব্রহ্মসূত্রেব টীকা বচনা করিয়া যাদব মিশ্র পণ্ডিত সমাজে বড় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন । সংসাব ত্যাগী রামানুজ

নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই যাদব মিশ্রের গৃহে অতিথি হন।  
রাত্রে—শাস্ত্র ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ের মধ্যে তর্ক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে রামানুজ  
পরাস্ত হইয়া মিশ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদী  
গুরুর সঙ্গে—রামানুজের বড় বেশী দিন বনিল না; রামানুজ—বৈষ্ণব  
ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য জানিবার জন্য—যাদব মিশ্রকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা  
করেন, মিশ্র তাহার সন্তুস্তর দিতে পারেন নাই। এই স্ত্রে গুরু শিষ্যে  
একটা গুরুতর মনোবিবাদ হয়—রামানুজ কাঞ্চীপুর পরিত্যাগ করিয়া  
মধুরন্তক গ্রামে উপস্থিত হ'ন।

মধুরন্তক গ্রামে বিষ্ণুভক্ত যামুনাচার্য্যের প্রধান শিষ্য—মহাপূর্ণ,  
আপনার অপূর্ণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ করিয়া অব্যবস্থিত চিত্ত রামানুজকে বিষ্ণুমন্ত্রে  
দীক্ষিত করেন, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য রামানুজকে  
কাঞ্চীপুরে পুনঃ প্রেরণ করেন।

(৩)

কাঞ্চীপুরে আসিয়া অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক রামানুজ যখন নবোৎসাহে—  
বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম সাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন, তখন অনেকে পূর্বা-  
চার্যাদিগের মত বিরুদ্ধ শাস্ত্র ব্যাখ্যা মনে করিয়া রামানুজকে অপদস্থ করি-  
বার চেষ্টা করেন। কিন্তু যাহারা মন দিয়া রামানুজের কথা শুনিল—  
তাহারা একে একে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন কাঞ্চীপুরে থাকিয়া রামানুজ সন্তাসী বেশে বহু শিষ্য সঙ্গে  
লইয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ঘোর সমুদ্র --মহীশূররাজ বল্লালের রাজধানী। বল্লাল জৈনপন্থী  
ছিলেন। রামানুজ শিষ্যে ঘোর সমুদ্রে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ  
প্রচার করিতে লাগিলেন। জৈনপন্থী পণ্ডিতগণ রামানুজের যথেষ্ট  
বিপক্ষতা করিল, কিন্তু তাহার অপূর্ণ বাগ্মিতায় শেষে সকলেই পরাজিত

হইল । রাজা স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলেন । রামানুজের উপদেশে—  
“বিষ্ণু বর্ধন” নামে রাজার নামকরণ হইল । রামানুজ যোর সমুদ্রে  
বিষ্ণুর চিত্রই প্রতিষ্ঠা রাখিয়া বৈষ্ণবগণকে প্রভুর সেবার ভার দিয়া—  
বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রের অধীশ্বর কুমিকর্ঠ চোল বৈষ্ণবধর্মকে বড় ঘৃণা করিতেন ।  
রামানুজ এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু এখানে ধর্ম প্রচারের  
তত সুবিধা হইল না । কুমিকর্ঠ চোলের এক রূপসী কন্যা ছিল,—রাজ  
কন্যা উন্মাদ বোগে বহুদিন ভুগিতেছিলেন, কোন চিকিৎসক তাঁহাকে  
আরোগ্য করিতে পারেন নাই । রামানুজের মুখে “হরিনাম” শুনিয়া রাজকন্যা  
প্রকৃতিস্থ হন । সাধুব এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া রাজা বৈষ্ণবধর্মের  
মহিমায় মুগ্ধ হন । সুযোগ পাইয়া রামানুজ—এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে “শ্রীরঙ্গ-  
নাথ” নামে এক বিষ্ণুর বিগ্রহ স্থাপন করেন ।

রামানুজ—প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, হরিদ্বার, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম  
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে—বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, যাহারা  
শঙ্করাচার্য্যের অদৈত মতাবলম্বী ছিল—তাহারাও দলে দলে রামানুজের  
বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ সমর্থন করিল । জৈনপন্থীগণও তাহার শিষ্য হইতে  
লাগিল, গয়াধামের বৌদ্ধগণও রামানুজকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল ।

কান্মীরের “সারদামঠ” ভারতীদেবীর বিলাস কুঞ্জ—সাধু সন্ন্যাসীগণ  
“সারদা মঠকে” পবিত্র ভাবে পূজা করিয়া থাকেন । একদিন রামানুজ  
সশিষ্যে সারদামঠে উপস্থিত হইলেন । রামানুজ স্বরচিত—“শ্রীভাষ্য”  
“বেদান্তসংগ্রহ” এবং “গীতাভাষ্য” নামক গ্রন্থত্রয় সারদামঠের অধ্যক্ষকে  
উপহার প্রদান করিলেন । কিন্তু মঠাধ্যক্ষ এই তিনখানি গ্রন্থ মঠে  
রাখিতে চাহিলেন না । তিনি রামানুজকে স্পষ্টই বলিলেন—“আপনার  
গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, অতএব—এ  
সকল গ্রন্থ এমতে আমরা রাখিতে পারিব না ।” তখন রামানুজ—

সারদামঠের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতমণ্ডলীকে—নিজ গ্রন্থের ভ্রম প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সূত্রে উভয় পক্ষে—তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিল, পরিণামে—রামানুজ স্বামীই জয়ী হইলেন। এইবার রামানুজের অপূর্ব গ্রন্থ সারদা মঠে গ্রন্থাগারে সম্মানে স্থান পাইল। সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ রামানুজের মহান্ প্রভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার শিষ্য সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইল যে—এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম প্রবর্তকের ভাগ্যে এত শিষ্য লাভ ঘটে নাই। এই সকল শিষ্যগণ “শ্রীসম্প্রদায়ী” নামে বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

(৫)

সমগ্র ভারতবর্ষে—বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া রামানুজ—“শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে” উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটা তাঁহার বড় প্রিয় স্থান ছিল। জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। এই শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে—তাঁহার মুখে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য—এক সময় ৭০০ সন্ন্যাসী, ১২ হাজার গৃহস্থ, ৫ শত কঙ্গী এবং বহু সংখ্যক বৈরাগী একত্র সমবেত হইয়াছিলেন।

রামানুজের “শ্রীসম্প্রদায়ী” মধ্যে মঠাধ্যক্ষ বা মোহান্ত নাই। মোহান্ত পদের পরিবর্তে—রামানুজ পীঠাধিপতি” পদের সৃষ্টি করেন। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্যের মধ্যে—কেবল ৭৪ জন মাত্র, এই গোরবময় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানযুগে, রামানুজের “শ্রীসম্প্রদায়” দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার একটা দলের নাম—“বেদকলাই”, অপব দলের নাম “তেন কলাই”। “বেদকলাইগণ” সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী, “তেন কলাইগণ” তামিলী সাহিত্যে শ্রদ্ধাবান্।

রামানুজ রচিত ৭ খানি দর্শন গ্রন্থ—ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।



তঁাহার গ্রন্থের নাম “রামানুজ-দর্শন” । তঁাহার অপূর্ণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া লোকে তঁাহাকে বৈদান্তিক শেষনাগের অবতার বলিত । রামানুজের ধর্মমত—জীব, ঈশ্বর, উপায় (ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ), পুরুষার্থ ও বিরোধী (ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক) এই অর্থ পঞ্চকের উপর প্রতিষ্ঠিত ।

রামানুজের মতে—জীব ৫ প্রকার, ১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। কেবল, ৪। মুমুক্শু ; ৫। বদ্ধ। ঈশ্বরের স্বরূপ ৩৫ প্রকার—১। পর, ২। বাহ, ৩। বিভব, ৪। অস্তর্য্যামী, ৫। অর্চা। উপায় ৫ প্রকার,— ১। কর্ম যোগ, ২। জ্ঞানযোগ, ৩। ভক্তিযোগ, ৪। প্রপত্তি যোগ, ৫। আচার্য্যাভিমানযোগ । পুরুষার্থ ৫ প্রকার—১ ধর্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম ৪। কৈবল্য, ৫। মোক্ষ ।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে, “শ্রীরঙ্গনাথের” পবিত্র মন্দিরে, ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে—লোকাচার্য্য রামানুজস্বামী দেহত্যাগ করেন । মৃত্যুকালে তঁাহার বয়স—১২০ বৎসর হইরাছিল ।



## দাছুপত্নী নিশ্চল দাস

দিল্লী হঠাতে অষ্টাদশ ক্রোশ পশ্চিমে “কিহডৌলী” নামক একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে তাকজী দাস নামে একজন দরিদ্র গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীব নাম লছমী। তাকজীর ঔরসে লছমীর গর্ভে—দাছুপত্নী নিশ্চল দাস জন্মগ্রহণ করেন।

এই মহাত্মার বালাজীবন সম্বন্ধে কোন কথাই জানিবার উপায় নাই। অতাবধি তাঁহার জন্ম সময়ও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে এইটুকু জানা যায় যে—নিশ্চল দাস মহাত্মা তুলসী দাসের সম সাময়িক ছিলেন।

দাছুপত্নীর শ্রীবামচন্দ্রের উপাসক। শৈশব হঠাতেই নিশ্চল দাসের হৃদয়ে রামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিন বালক নিশ্চল দাসকে তদীয় জননী কিছু মরিচ কিনিতে কোনও দোকানে পাঠাইয়াছিলেন। পথে কোনও সন্ন্যাসী বালককে লক্ষণাক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া ভুলাইয়া লইয়া যান! এদিকে বাটিতে হলস্থূল পড়িয়া যায়, বালকের অদর্শনে তাহার পিতা মাতা বড়ই উদ্ভিগ্ন হন। ৭ দিন পরে এক বনের মধ্যে নিশ্চল দাসকে দেখিতে পাওয়া যায়। বালক একমনে বৃক্ষ মূলে বসিয়া রামনাম করিতেছে—একজন গ্রামবাসী প্রথমেই ইহা দেখিতে পান। তারপর এ সংবাদ তাকজীকে জানান হয়। তাকজী আসিয়া বালককে ক্রোড়ে করিয়া বাটিতে লইয়া যান।

সেই অবধি তাকজী নিশ্চলকে আর কোথাও ছাড়িয়া দিতেন না। গ্রামে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাহারই নিকট নিশ্চল দাস বিদ্যাশিক্ষা করেন। শোক-দুঃখ-সঙ্কুল সংসারে—জীবের অশেষ দুর্গতি দেখিয়া নিশ্চল দাস ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কিন্তু

কিছুতেই তাহার জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হইল না । শেষে নিশ্চল দাসের মনে উদিত হয়—‘জীবের সুখপ্রাপ্তির উপায় আত্মজ্ঞানলাভ ।’

নিশ্চল দাসের বয়স যখন এয়োদশ বর্ষ, তখন তাঁহার বিবাহ হয় । পঞ্চদশ বৎসব বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সেই শোকে তাঁহার জননীও লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে । ষোড়শ বৎসর বয়সে—প্রাপ্তযৌবনা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চলদাস সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন ।

কিছুদিন কাশীবাস করিয়া “কিহডোলিতে” ফিরিয়া আসেন । সেখানে একটা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়—ঐ মঠের নাম “গুরুদ্বার । “গুরুদ্বারে” এখনও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী বর্তমান আছেন ।

নিশ্চল দাস কোন ধর্মের নিন্দা করিতেন না । শিষ্যগণকে আত্ম-তত্ত্ব শিখাইবার জন্ত তিনি “বিচার সঞ্চার” নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । এই গ্রন্থ প্রকৃতই বিচার সাগর,—বিচার সাগর আত্মজ্ঞানোপ-যোগী লহরীমালায় তরঙ্গিত । ইহার একপাৰ্বে “সংসার-সৈকত”, অপর পাৰ্বে—“মোক্ষ উপকূল” । মধ্যে সুগভীর বেদসিদ্ধান্ত সলিলরাশি বিস্তীর্ণ ! শাস্তির রূপ কাণ্ডারীর রূপায়—এই সাগর পার হইতে হয় । বাস্তবিক অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এমন সুন্দর গ্রন্থ আর আছে কিনা সন্দেহ । এই গ্রন্থের ভাষা সরল, রচনাও মধুর ।

নিশ্চল দাস যেমন ঈশ্বর ভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, তেমনি অদ্বিতীয় পণ্ডিতও ছিলেন । শাস্ত্র, পাতঞ্জল, কাব্য ও ব্যাকরণ, গ্রাম, জ্যোতিষ, সকল শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল, তিনি কথকতা করিয়া, সাধারণের কাছে বেদান্ত মত প্রচার করিতেন । “বৃত্তি প্রভাকর” গ্রন্থে তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ।

সংস্কৃত ভাষায় আত্মজ্ঞান বোধক গ্রন্থের বড় অভাব নাই, কিন্তু সংস্কৃতের ভাষায় আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থের একান্ত অভাব । এই অভাব

দুবীকরণের জন্ত নিশ্চল দাস—হিন্দী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।  
“বিচার সাগর” গ্রন্থে—এ কথা তিনি স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন—

সাংখ্য ত্রায় মৈ শ্রম ক্রিয়ো, পড়ি ব্যাকরণ অশেষ ।

পড়ে গ্রন্থ অদ্বৈতকে, বহো ন একছ শেষ ।

কঠিন জু ওর নিবন্ধ হৈ, জিন মৈ মত কে ভেদ ।

শ্রম তৈ অবগাহন কিয়ে নিশ্চল দাস সবেদ ॥

তিন ইহ ভাষা গ্রন্থ কিয়া রঞ্জন উপজী লাজ ।

তামে ইহ এক হেতু হৈ, দয়া ধর্ম শিব তাজ ।

বিন ব্যাকরণ ন পড়ি সকৈ, গ্রন্থ সংস্কৃত মন্দ,

পঠে যাহি, অনায়াসহি, ল হৈ স্ত পরমানন্দ ।

নিশ্চল দাস “কঠোপনিষদেব” একখানি টীকাও প্রণয়ন করেন ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বামসিংহ নামক একজন পবন ধার্মিক রাজা ছিলেন । এই রাজা ও তদীয় মহিষী—নিশ্চল দাসের শিষ্য ছিলেন । ধর্ম প্রাণা রাজ্ঞীকে বেদান্তের মর্ম বুঝাইবার জন্ত—“বিচার সঞ্চার” রচিত হইয়াছিল ।

মহাত্মা নিশ্চল দাস—প্রকৃত নিরভিমানী, ধর্মপ্রাণ জিতেজ্জিয় এবং পরোপকারী ছিলেন । তিনি একাসনে দ্বাদশবর্ষ কাল ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন । এইকণ জনশ্রুতি আছে—ঐ দ্বাদশবর্ষের মধ্যে কেহ তাঁহাকে আহ্বার করিতে কিম্বা নিদ্রা যাইতে দেখে নাই ।

সন্থ ১৯২০ সালে, দিল্লী সহবে নিশ্চল দাসের দেহত্যাগ হয় ।

# মহাত্মা তুলসী দাস

( ১ )

ভক্তমাল রচয়িতা নাভাজীর তিরোভাব উপলক্ষে, এক বৃহৎ ভাণ্ডারার আয়োজন হইল। যেখানে যত সাধু সন্ন্যাসী মোহান্ত আছেন,—মঠাধ্যক্ষ সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন, কেবল কাশীবাসী জনৈক সাধুকে নিমন্ত্রণ করা হইল না। এই অনিমন্ত্রিত সাধু একজন যজ্ঞোপবীত ধারী গোস্বামী, পাছে তিনি “ভাণ্ডারার” সম্মিলিত সাধুমণ্ডলীর সহিত পংক্তি ভোজনে আপত্তি করেন, এই সন্দেহে গোসাইজীর নাম নিমন্ত্রণ তালিকায় বাদ পড়িয়াছিল।

নির্দিষ্ট দিবসে, দেশদেশান্তর হইতে সাধুগণ আসিয়া সম্মিলনীতে যোগদান করিলেন। মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সকলের জ্ঞাত আহারের স্থান করা হইল। সাধুগণ পংক্তি ভোজনে বসিলেন, প্রথমে পাতা দেওয়া হইল, তাহার পর রুটী দেওয়া হইল, একজন দাল আনিয়া দিল। সাধুরা “লক্ষ্মী নারায়ণ” নাম উচ্চারণ করিয়া ভোজন গ্রাস মুখে তুলিলেন।

এমন সময় কাশী হইতে সেই অনিমন্ত্রিত গোস্বামী সেখানে উপস্থিত হইলেন। গোস্বামীকে কেহ চিনিত না, স্তবরাং তাঁহাব অভ্যর্থনাও হইল না। যেখানে সাধুদিগের পাত্ৰকাদি রক্ষিত ছিল, আগন্তুক সেই স্থানে দাঁড়াইলেন—কারণ মঠ প্রাঙ্গণে আর এক ব্যক্তির জ্ঞাতও বসিবার স্থান ছিল না, সকল আসনই অধিকৃত হইয়াছিল।

যিনি রুটী পরিবেশন করিতেছিলেন,—তিনি পংক্তির প্রান্তভাগে—যেদিকে আগন্তুক দাঁড়াইয়াছিলেন—সেইদিকে আসিলে, আগন্তুক হাত

পাতিয়া কটী চাহিয়া লইলেন । পৰিবেশনকৰ্ত্তা তখন বড় ব্যস্ত এবং অগ্ৰমনস্ক ছিলেন, স্তববাং কে যে কটী চাহিল সে দিকে দৃষ্টি করিলেন না ; কটী দিয়াই অস্ত্র দিকে চলিয়া গেলেন । ইহাব পৰ আর এক ব্যক্তি ডাল পৰিবেশন কৰিতে আসিলে, আগন্তুক ডাল চাহিলেন । পৰিবেশনকাৰী বলিল—“কিসে ডাল লইবে ?”—আগন্তুক ভূপৃষ্ঠে রক্ষিত জনৈক সাধু একপাটী জুতা কুড়াইয়া লইয়া তাহাতেই ডাল দিতে বলিলেন ।

আগন্তুকে এইরূপ ব্যবহাবে—ডাল পৰিবেশনকাৰী বড়ই বিস্মিত হইল । সে দেখিল যিনি ডাল চাহিতেছেন, তাহাব প্রশস্ত জ্যোতিষ্ময় ললাটে—শ্বেতচন্দনেব তিলক, কণ্ঠে তুলসী-মালা ; বক্ষে যজ্ঞোপবীত দোহলামান । পৰিবেশনকাৰী আগন্তুককে বলিল—“একি ! আপনি ব্রাহ্মণ, অস্পৃশ্য জুতার উপৰ ডাল চাহিতেছেন কেন ?” তখন গম্ভীৰস্বরে আগন্তুক বলিলেন—

“তুলসী থাকে মূখনতে কি ধোখো আয়ত রাম ।

ভাকে পদকী পানহী, কে মেবে তনকা চাম ॥”

অর্থাৎ “বাঁহাৰ মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে রাম নাম বাহির হইয়াছে, তাঁহাব জুতার চামড়াকে তুলসী দাস আপনাব গায়ের চামড়ার চেয়েও পবিত্র মনে কবে ।”

আগন্তুকেব কথায়, তাঁহাব উপর সকল সাধুর দৃষ্টি পতিত হইল । সেই অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য্যেব অপূৰ্ব পৰিণতি দেখিরা, লকলের হৃদয় সম্মুখে পাবপূৰ্ণ হইয়া উঠিল । তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—এই বিনয়নম্র মহাক্ষোজ্জল মূৰ্ত্তি—মহাত্মা তুলসী দাসের ! তুলসীদাস স্বীয় উদারতার গুণে, বিনা আহ্বানেহ স্বেদেব কাশীধাম হইতে, এই সাধুসম্মিলনীর ভাণ্ডাবা সার্থক কৰিতে আসিয়াছেন ! তখন চারিদিক হইতে সহস্রকণ্ঠে ক্ষয়ধ্বনি উঠিত হইল ! মঠাধ্যক্ষ তুলসী দাসকে আলিঙ্গন করিয়া, পংক্তিব মাঝখানে বসাইয়া দিলেন ! ভাণ্ডারাব মহোৎসব মহানন্দে সম্পন্ন হইল

( ২ )

মহাত্মা তুলসী দাস, সন্থঃ ১৬০০ শতাব্দিতে, যমুনাতীরবর্তি রাজা পুৰগ্রামে এক পুণ্য প্রথিত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। প্রতিবেশীগণ একটা সুন্দরী বালিকার সঙ্গে তুলসী দাসের বিবাহ দেন, তাঁহার বয়স তখন পঞ্চদশ বৎসর।

পদার্পিত মাত্র যৌবনা প্রেমময়ী পত্নীকে লইয়া অপর মানবহীন কক্ষে—তুলসী দাস সংসার পাতিলেন। তিনি পত্নীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার তুষিত নয়নের সাগ্রহ দৃষ্টি—পত্নীর ‘প্রত্যেক, গতি-বিধির অনুসরণ করিত। একদণ্ড স্ত্রীকে দেখিতে না পাইলে, সে দৃষ্টি চারিদিক খুঁজিয়া বেড়াইত। যুবতীও স্বামীর ভক্তিভরা ভালবাসার অর্চনার যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিত। কিন্তু ভালবাসায় এই আতশযা সমাজের নিকট তুলসী দাসকে “জৈন” বলিয়া পরিচিত করিয়া দিল।

প্রথম বিকশিত যৌবনে, কোন্ যুবক না কোনও যুবতীকে ভাল বাসিয়াছে? তুলসী দাস তবে পত্নীকে ভাল বাসিয়া অপবাধী কেন? তুলসী দাস একদণ্ড স্ত্রীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না বলিয়া, পত্নী যখন রন্ধন করিত, তুলসী দাস পাকশালার দ্বারে বসিয়া সেই শিশিরসিক্ত মুখখানি লুকা নয়নের সঙ্কোচহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেন। ভালবাসার এতটা বাড়াবাড়ি পত্নীরও ভাল লাগিত না। সে স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিত—“তোমার কি আর কোনও কাজ নেই?—যাও না একবার বাইরে বেড়াইয়া এসো না।” তথাপি তুলসীদাস সেস্থান ছাড়িতে পারিতেন না। বুঝি সৌন্দর্য সাধনায় অনন্ত জড়তায় তাঁহার চরণযুগল আবদ্ধ হইয়া পড়িত।

কোনও বিশেষ কার্যোপলক্ষে তুলসীদাসকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। এই স্রযোগে তুলসীদাসের পত্নী পিত্রালয়ে গমন করিল। অনেক দিন

রমণী পিতামাতার মুখ দেখে নাই। পাছে স্বামী ছাড়িয়া না দেন, এই ভয়ে তাঁহার অজ্ঞাতসাবেই বমণী বাপের বাড়ীতে চলিয়া গেল। তাহার বাপের বাড়ী বড় বেশী দূরে ছিল না।

বাটীতে আসিয়া শৃগ কক্ষ দেখিয়া তুলসীদাসের মাথা ঘুবিয়া গেল। তান উন্নত বৎসবে পত্নীর নাম বিয়া ডাকিলেন। উত্তরে তাহারি বিক্লান্ত বৎসবের প্রতিধ্বনি আসিল। তুলসীদাস আর অপেক্ষা না করিয়া একেবাবেই স্বপ্নবাবাডী অভিমুখে ছুটিলেন। পত্নীর ক্ষণবিবহ সহ্য করিবাবও তাহার ক্ষমতা ছিল না।

স্বপ্নবাবাটর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া তুলসীদাস দেখিলেন—তাবকামণ্ডল মন্যবত্তিনা বোতলীর ত্রায় সঙ্গিনীগণ পবিত্রতা হইয়া তাহার দ্বী প্রফুল্লমুখে গল্প কাঁতেছে। তুলসীদাসকে দেখিয়া সঙ্গিনীগণ লজ্জায় দূরে দাড়াইল, তুলসীদাসের স্ত্রী স্বামীর নিকটে আসিল। স্বামী উন্মাদেব মত স্ত্রীর হাৎ চাপিয়া ধরিলেন। স্ত্রী বলিল—“কি আশ্চর্য্য! আমি দুই দণ্ডেব জন্ত মা বাপকে দেখিতে আসিয়াছি, ইহাও তোমার প্রাণে সহিল না? বাটীতে আমার চ’খে চ’খে বাখিয়াও কি তোমার আকাজ্জক মিতে নাই? আবাব এখান পর্য্যন্ত আমার জালাইতে আসিয়াছ? ছিছি। আমার এই সামান্য দেহে তোমার যেকপ আসক্তি দেখিতেছি, এইরূপ আসক্তি যদি ভগবান্ বামচন্দ্রেব উপর থাকিত, তাহা হইলে তোমার ভব-যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইত।”

( ৩ )

মহিমাময়ী বমণীর একটীমাত্র কথায় তুলসীদাসের স্তম্ভ হৃদয়ের লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব তীব্র কশাঘাতে এক মুহূর্ত্তেব মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—তুচ্ছ বমণীপ্রেমে আত্মসম্মান বলি দিয়া এতকাল তিনি মনুষ্যত্বেব অবমাননা করিয়া আসিতেছেন! পত্নীর



তিবক্ষাব বাক্যে তিনি আজ অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য দেখিতে পাইলেন ।  
হৃৎথে অন্ততাপে, মর্মান্তিক বেদনায় তাহার শব্দ বিদীর্ণপ্রায় হইল ।

তুলসীদাস আব সেখানে দাঁড়াইলেন না । আজ মুক্ত হইয়া  
প্রথম নিশ্বাসে তাহার মুখ দিয়া রাম নাম উচ্চারিত হইল । হৃদয়ে  
কৃত্রিমতা—জীবনের জটিল মোহ আবরণ ছিন্ন করিয়া, তুলসীদাস—রজনীব  
অঙ্ককারে মিশিয়া গেলেন !

একথণ্ড ক্ষুদ্র উপলে সময় সময় যেমন নিবাব নীরবে গতির পরিবর্তন  
হয়, তেমনি একটা সামান্য ঘটনায় তুলসী দাসের জীবন স্রোত ভিন্নপথে  
প্রবাহিত হইল । তুলসী দাস যুবতী পত্নীকে পাবত্যাগ কাব্য, শতশ্রুত  
জড়িত সাধের গৃহ ভুলিয়া—পবদিন কাশী যাত্রা করিলেন । তাঁহাব  
হৃদয়ে—পত্নীর প্রীত্যর্থ আর একদিনু প্রেমও সঞ্চিত ছিল না ।

( ৪ )

কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিবেব নিকট—এক চত্ববে বসিয়া, একজন  
ব্রাহ্মণ প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ করিতেন । তুলসী দাস প্রত্যহ সেখানে  
গিয়া বামায়ণ শুনিতেন । ব্রাহ্মণেব দেবতুল্য রূপ, ঘন কুঞ্চিত কেশবাশি,  
আয়ত অথচ কোমলোজ্জল-নয়নদ্বয়, জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি—দোখতে  
দেখিতে তুলসী দাসেব মনের তন্ত্রা জড়তা ঘুচিয়া বাইত ।

শীঘ্রই তুলসী দাসেব পরিপুষ্ট যৌবন দীপ্ত মঙ্গল শ্রীতে ভারিয়া উঠিল ।  
তিনি সন্ন্যাসী সাজিলেন । সহসা এক আশ্চর্য ঘটনায়—তুলসী দাসেব  
সৌভাগ্য রবি অরুণ আভায় আত্মপ্রকাশ করিল ।

তুলসী দাস যে কুটিবে বাস করিতেন, তাহাব অনতিদূবে একটা  
বদরী বৃক্ষ ছিল । প্রতিদিন শৌচান্তে যে জলটুকু কমণ্ডলুতে অবশিষ্ট  
থাকিত, তুলসী দাস তাহা ঐ বদরী তলে ঢালিয়া ফেলিতেন । একদিন  
গভীর রাত্রে—নিদ্রামগ্ন তুলসী দাস স্বপ্ন দেখিলেন—কমণ্ডলু জল সিক্ত

বদনী রক্ষমূলে—যেন একপ্রেরিতমূর্তি বসিয়া আছে। ভয়ে তুলসী দাসেব শবাব শহবিয়া উঠিল। কিন্তু ঐ প্রেরিতমূর্তি—ধীরে ধীরে তাঁহাব নিকটে অগ্রসব হইল। তা'ব পব তুলসী দাসকে সম্বোধন কাঁবয়া বলিল—  
“বৎস! তোমাব প্রদত্ত জলে আমাব পিপাসাব শাস্তি হইয়াছে, সেইজন্তু আঁি তোমাব কিছু উপকাব করিব। তুমি প্রত্যাহ যে ব্রাহ্মণেব কাছে বামাগ্ন গুনিতে যাও—তিনি সামান্ত মানব নহেন—তিনি ছদ্মবেশধাবা গবন কুমার। তুমি তাঁহাকে গুরুত্বে ববণ কবিণে, ভগবান্ রামচন্দ্র তোমাব উপব প্রসন্ন হইবেন।” এই কথা বলিয়া প্রেরিতমূর্তি—অদৃশ্য হইল। তুলসী দাসেবও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

স্বপ্নরত্নান্ত স্ববণ করিয়া পবদিন প্রভাতে তুলসী দাস সেই ব্রাহ্মণেব নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন—বীণানিন্দিত কণ্ঠে রামেব মহিমা গান কবিতেছিলেন। সেখানে আব দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। তুলসী দাস ব্রাহ্মণেব চবণ ধাবণ কবিয়া মনোবাসনা ব্যক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণেব দয়া হইল, তিনি তুলসী দাসকে বামনামে দীক্ষিত করিলেন।

সেইদিন হইতে সেই ব্রাহ্মণকে আর কেহ কাশীতে দেখিতে পাইল না। তুলসী দাস নির্জনে বসিয়া জপ আরম্ভ কবিলেন। তাঁহার অমৃত নির্ঝঝি বসনায় রামনামের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। বাবাগ্নসীব ভূতাগ ও আকাশ মণ্ডল পবিত্র হইয়া গেল। সম্বাবধিপতি অমর সিংহ প্রমুখ হিন্দু নৃপাতবৃন্দ—তুলসী দাসকে ভক্তির চ'ক্ষে দেখিলেন।

তা'ব পব তুলসী দাস নানা তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। যখন তিনি চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে সূর্যাগ্রহণ উপলক্ষে বহু লোকের জনতা হঠিয়াছিল। বহুল সম্প্রদায়েব সাধুগণকে একস্থানে একত্রিত দেখিয়া তুলসী দাসেব আর আনন্দেব সীমা রহিল না। তিনি সাধু সহ-বাসেব মহিমায় মুগ্ধ হইয়া চিত্রকূটেই বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃস্নানে পবিত্র হইয়া তুলসী দাস—ইষ্ট পূজার জন্ত চন্দন ঘর্ষণ করিতেছেন. এমন সময় একটি সুন্দর বালক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বালকের সন্ন্যাসীর বেশ, নবহরীদল শ্রাম কান্তি, মস্তকে অপূর্ব জটা শোভিত। বালক তুলসী দাসের নিকটে অগ্রসব হইয়া স্বাধা মধুব স্ববে বলিলেন—“তাই! আমার চন্দন পরাইয়া দিতে পাব?” বালকের দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়া তুলসী দাসের মনে হইল—এ বালক সামান্য নহে। তুলসী দাস করযোড়ে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বালক! শুনছ বিনয় মম এছ,

তুম শ্রীরামচন্দ্র, কি কেছ?

সন্ন্যাসী বালক উত্তর দিলেন—

“মাধু সকল শ্রীরাম অবতারা!”

বালকের কথায় তুলসীদাস সর্বাঙ্গে অশ্রুপুলক, স্বেদকম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি সহসা মুচ্ছিত হইলেন।

মূর্ছাভঙ্গে তুলসীদাস চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার স্বহস্ত ঘষিত সেই চন্দন, আর সেই নয়নানন্দ অপরূপ বালক, তথায় নাই। তখন তুলসীদাস সেই বালকের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল—এ বালক আর কেহ নহে—স্বয়ং নর নারায়ণ রামচন্দ্র!

তুলসীদাস—উন্মাদ, বাহুজ্ঞানশূন্য, যাহাকে পথে দেখেন, তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া বলেন—

চিত্রকূট কি ঘাটপর ভই সন্তন কি ভিড়,

তুলসীদাস তাহা চন্দন ঘরষতঃ তিলক দেত রঘুবীর।

এইভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইল; তুলসীদাস স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। তুলসীদাসের প্রতি স্বপ্নেই প্রত্যাশা হইল—“বৎস!

আমি তোমাব উপব প্রসন্ন হইয়াছি । তুমি একখানি রামায়ণ রচনা কব—বামলীলা প্রকাশেব তুমিই যোগ্য পাত্র ।”

“বামায়ণ” বচনা কবিবাব জন্য তুলসীদাস বামচন্দ্রেব জন্মভূমি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন । ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বামায়ণের বচনা আবস্ত হয় । বালকাণ্ড লেখা সম্পূর্ণ হইলে, বৈষ্ণবদলেব সঙ্গে তাঁহাব বিলক্ষণ বিবাদ হয় । তুলসীদাস সাধের অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া আবাব কাশীবাসী হ’ন । কাশীধামে বসিয়া তুলসীদাস রামায়ণ সম্পূর্ণ কবেন । তাঁহাব রামায়ণ বড় উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা তাবুকের পক্ষে ঐশী নিৰ্ম্মাল্যেব মত পবিত্র । যেখানে বসিয়া তুলসীদাস বামায়ণ লিখিয়াছিলেন—সেস্থান বাবাণসাব নদীতাবে অবস্থিত ছিল । এখনও লোকে সেই পবিত্র স্থানকে “তুলসী ঘাট” নামে অভিহিত কবে ।

( ৫ )

সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ কবিয়া, তুলসীদাস একবকম “ভবঘূৰ্বে” হইয়া পৰিখাছিলেন । পাছে কোনও স্থানে ২৪ দিন থাকিলে সেস্থানেব উপব মমতা জন্মে—এই ভয়ে তিনি একপথে থাকিতে চাহিতেন না ।

তাঁহাব সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঝুলি থাকিত, ঐ ঝুলিতে মোটা কম্বল হইতে আবস্ত কবিয়া, পূজার ফুলচন্দন—এমনকি বন্ধনের মসলা পর্য্যন্ত বিবাজ কবিত । তুলসীদাস আজ এদেশ, কাল ওদেশ কবিয়া বেড়াই-তেন । পথ চলিতে চলিতে যেস্থানে ক্রান্ত হইয়া পড়িতেন সেদিনকাব মত সেই স্থানেই তাঁহাব বাসস্থান নির্দিষ্ট হইত । তিনি স্থানীয় কোন ব্রাহ্মবাটীতে গিয়া মুষ্টিমেয় তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিতেন, কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া সেই অন্ন পাক করিতেন । বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া তুলসীদাস কাহাবও স্পৃষ্ট অন্ন স্পর্শ কবিতেন না, স্বহস্তেই পাক সমাধা করিতেন ।

একদিন তুলসীদাস লোকমুখে শুনিতে পাইলেন—কাশীর বিবিধ দূবে কোনও গ্রামে একজন সাধু আসিয়াছেন। তুলসীদাস যেন সাধু দর্শনে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সাধুকে দেখিয়া তাহাব তৃপ্তি হইল না, সাধুব গৈবিক বেশ ভণ্ডামীর রূপান্তর বুঝিতে পারিয়া তখন তিন সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

যখন তুলসীদাস কাশীতে যি বয়া আসিতেছিলেন, তখন মাথায় উপব অনলবর্ষী দীপ্ত দিবাকর। পথশ্রান্ত তুলসীদাস আব অধিক দূর অগম্য হইতে পারিলেন না। পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। সে বাটীতে এক বর্ষীয়সী বমণী ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ছিল না। বমণী তুলসীদাসের বন্ধনের উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

অন্নপাক হইলে বমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যঞ্জনব জন্ত—বিদ্রা ও লবণ আনিব কি?” তুলসীদাস বলিলেন—“না, লবণ ও হিঙ্গা আমার ঝুলিতেই আছে।” বমণী আবাব জিজ্ঞাসা করিলেন—“বে লঙ্কা আনিয়া দিব কি?” সেবাবও তুলসীদাস বলিল—“উহাও আমার ঝুলিতে আছে।” এইরূপে বমণী ঘাটা ঘাটা আনিয়া দিতে চাহিলেন, তুলসীদাস নিজের ঝুলিমাধ্য য়ে সমস্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিলেন।

তখন বমণী বলিলেন—“ঝুলিতে যখন লঙ্কা চবিদ্রা হইতে আবন্ত করিয়া লবণ পর্যন্ত সমস্ত দ্রব্য স্থান পাইয়াছে, তখন তাঁহাব পত্নীকে পবিত্যাগ করা ভাল হয় নাহি।” বমণীর কথায় তুলসীদাস সবিস্ময়ে তদীয় সূক্ষ্মাপবায়ণার মুখেব দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আব তাঁহাব বুঝিতে বাকী রহিল না। এ বমণী অন্য কেহ নহেন, ইনি তাঁহাবই পবিত্যক্তা পত্নী—কাত্যায়নী দেবী।

এইবাব তুলসীদাস বিপদে পড়িলেন, তিনি পূর্বে বমণীকে চিনিতে পাবেন নাই। কিন্তু—পত্নীর সতর্ক দৃষ্টিব কাছ বহু পূর্বেই তাহাব

সন্ন্যাসীবেশ ধৰা পড়িয়া ছল । বমণী আর স্বামীকে একা ছাড়িয়া দিলেন না, তিনি ধম্মে স্বামীর “সহধম্মিণী” হইলেন ।

( )

তুলসীদাস গৃহত্যাগী হইলে, তাঁহার পত্নীবও চৈতন্য জন্মিয়াছিল । দাম্পত্য স্বামীর অদর্শনে অধাব হইয়া, সংসার ত্যাগ কবিয়া—ব্রহ্মদান পূর্বে কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন । বিধাতার ককণায়—জীবনের শেষভাগ স্বামী স্ত্রীতে আবার মিলন হইল । দম্পত্যের মধ্যে এমন যে ভালবাসা হৃদয়চ্ছিন্ন, তাহাতে লালসার নামগন্ধ ছিল না, সে ভালবাসা ভক্তিতে প্রদ্বায়, স্নেহে আদবে—প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল ।

১৪২৪ খৃষ্টাব্দে—কাশীধামে পুণ্যতোয়া জাহ্নবী কুলে, তুলসীদাসের নানবলীলা শেষ হয় । পত্নীও স্বামীর শব বক্ষে ধাবয়া জলন্ত চিতায় সহর্ষে আরোহণ করেন ।

তুলসীদাস বিশিষ্টাধৈর্যবাদী ছিলেন । তাঁহার আধ্যাত্মিক বামাগ্নে যিনি “বাম” নামে উক্ত হইয়াছেন, তিনি শঙ্করাচার্য্যের সেই ব্রহ্ম । এই গ্রন্থ ছাড়া তুলসীদাস অনেকগুলি দোহা বচনা কবিয়াছিলেন, তাঁহার দোহাবলী ভক্তি ও নী ততে স্নিগ্ধ ও মধুর ।

গুণজ্ঞ ডাউজ সাহেব তুলসীদাসের বামাগ্ন—ইংবাজি ভাষায় ভাষান্তবিত কবিয়াছেন । \*

\* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তুলসীদাসের জন্ম মূল্য নক্ষত্রে । এইজন্য অতি শৈশবেই তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হইয়াছিল । এই অন্তঃকণে জাত অনাথ শিশুকে কোন প্রতিবেশী আশ্রয় দেন নাই । একজন সন্ন্যাসী তুলসীদাসকে প্রতিপালন করেন । তাঁহারই চেষ্টায় দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলীর সঙ্গে তুলসীদাসের বিবাহ হইয়াছিল । দীনবন্ধু উক্ত সন্ন্যাসীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন ।

# যোগীবর পণ্ডহারী বাব।

[ ১ ]

জোনপুৰ জেলাৰ প্ৰেমাৰ পুৰে অযোধ্যানাথ তেওয়ারী নামে একজন নিষ্ঠাবান্ ধাৰ্মিক গৃহস্থ বাস কৰিতেন। অযোধ্যাৰ সাংসাৰিক অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না।

লছমী নারায়ণ নামে—অযোধ্যাৰ এক জ্যেষ্ঠ সহোদৰ ছিলেন, প্ৰথম যৌবনেই তিনি সন্ন্যাসধৰ্ম অবলম্বন কৰেন। লক্ষ্মী নারায়ণ গৃহত্যাগী হইয়া গাজীপুৰ জেলাৰ কুৰ্ণা গ্ৰামে—পুণ্যস্ৰোতা জাহ্নবাব তাৰে কুটিৰ বাঁধিয়া বাস কৰিতেন, বাটীতে একেবাবেই আসিতেন না। তৰে মধ্যো মধ্যো ভাতাকে পত্ৰ লিখিয়া সংবাদ লইতেন। তিনি বিবাহ কৰেন নাট। স্মৰোগ ও স্মবিধা পাইলে অযোধ্যানাথ মধ্যো মধ্যো গিয়া ভাতাকে দেখিয়া আসিতেন।

অযোধ্যানাথ তাঁহাৰ কোন প্ৰতিবাসীৰ এক কন্যাকে বিবাহ কৰিয়াছিলেন। এই পত্নীৰ গৰ্ভে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যানাথেৰ এক পুত্ৰ জন্মগ্ৰহণ কৰে। এই সময় লছমী নারায়ণ নবজাত ভাতৃপুত্ৰকে দেখিবাৰ জন্ত একবাব বাটীতে আসেন। নব কুমাৰকে সৰ্ব্ব সুলক্ষণাক্ৰান্ত দেখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ অত্যন্ত প্ৰীত হন এবং গাজীপুৰ যাইবাৰ সময় ভাতাকে অন্তৰ্বোধ কৰিয়া যান—“বালকেৰ নাম যেন “ৰাম ভজন” রাখা হয়।”

[ ২ ]

তিনি বৎসৰ বয়সে “ৰাম ভজন” কঠিন পীড়াগ্ৰস্ত হইলেন। বোগ—সাংঘাতিক বসন্ত। ৪০ দিন ধৰিয়া যমে মানুহে ভীষণ যুদ্ধ হইল। স্বামী

স্ট্রীতে মিলিয়া অনাথায়ে অনিদ্রায়—অনবরত পরিশ্রম করিয়া যমদূত  
গুলাকে তাড়াইয়া দিলেন । যাইবার সময় যমদূতেরা—বালকের সর্কাসে  
তাহাদের অস্ত্রচিহ্ন রাখিয়া গেল এবং প্রভুকে লুণ্ঠন দ্রব্য উপহার দিবার  
জ্ঞা—বালকের একটি চক্ষু হরণ করিয়া লইয়া গেল । অতিকষ্টে বালক  
রক্ষা পাইল ।

এক চক্ষুহীন বালক রামভজনকে পিতামাতা আদর করিয়া  
“শুক্ৰাচার্য্য” বলিয়া ডাকিতেন ।

পঞ্চম বৎসর বয়সে বালকের উপনয়ন হইল । অযোধ্যানাথ পুত্রের  
শিক্ষাব্যবস্থা করিলেন । কিন্তু অত্যধিক আদরে—শিশুর শিক্ষা তত  
অগ্রসর হইতে পারিল না ।

[ ৩ ]

এই সময় সংবাদ আসিল—লছমী নারায়ণ অত্যন্ত পীড়িত । ভ্রাতৃ-  
বৎসল অযোধ্যানাথ গাজীপুর যাত্রা করিলেন । তাঁহার সূক্ষ্মবাণে  
লছমী নারায়ণ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন । কিন্তু একেবারে আরোগ্য হইতে  
পারিলেন না, মধ্যে মধ্যে পীড়ার প্রকোপ হইত, আবার সারিয়া যাইত ।  
অযোধ্যানাথ অগ্রজকে গৃহে লইয়া যাইবার জ্ঞা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন—  
লছমী নারায়ণ সম্মত হইলেন না । কাজেই অযোধ্যানাথ ক্ষুব্ধ মনে বাটী  
কিয়িয়া আসিলেন ।

ক্রমাগত রোগ ভোগ করিয়া, লছমী নারায়ণের চক্ষু দুইটী নষ্ট হইয়া  
গেল, তিনি অন্ধ হইয়া গাজীপুরে পড়িয়া রহিলেন । অযোধ্যানাথ  
অগ্রজকে বিপন্ন দেখিয়া অগ্রজের সেবার জ্ঞা—পুত্র রামভজনকে  
অগ্রজের কাছে পাঠাইয়া দিলেন । বালকের বয়স তখন ১০ বৎসর  
মাত্র ।



কুখী গ্রামে—সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য বহুপণ্ডিত বাস করিতেন। বালক রাম ভজন—অন্ধ জ্যেষ্ঠতাতের কাছে থাকিয়া, এই সকল পণ্ডিত-দের কাছে শিক্ষা করিতেন। ক্রমে বেদান্ত দর্শনে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিল। লছমী নারায়ণের সাহায্যে থাকিয়া বালক সংসারকে ত্যাগ করিতে শিখিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লছমী নারায়ণ লোকান্তরে গমন কবেন। জ্যেষ্ঠ-তাত বিয়োগে রামভজন বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। দেশভ্রমণে যদি মনে শান্তি আসে—ইহা ভাবিয়া রামভজন বহুতীর্থে ভ্রমণ করিলেন। বদরিকাশ্রম হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত—ভাবতের সমস্ত তীর্থ তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিলেন। কিন্তু কোথাও শান্তি পাইলেন না। রামভজন লছমী নারায়ণের নিকট কিছু কিছু যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়াছিলেন,—তীর্থ পর্য্যটন শেষ করিয়া বাবাণসী ধামে ফিরিয়া যাইয়া তিনি নির্জনে যোগাভ্যাস আবস্ত করিলেন।

[ ৪ ]

পিতামাতা—বালককে আর সংসারে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। রামভজন কালীতেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়া—লোকে চমৎকৃত হইল। এই ঘটনার কিছু পূর্বে হইতে রামভজন অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কোন দিন সামান্য ছন্দ পান করিতেন, কোন দিন বা বিল্বপত্র বা অশ্বথ পত্রের রস পান করিতেন।

এই সকল দেখিয়া লোকে তাঁহাকে “পরম আহারী বাবা” বলিয়া ডাকিত। ত্রই নামই লোক রসনায় সংক্ষিপ্ত হইয়া “পওহারী বাবা”য় পরিণত হয়।

কিছুদিন পরে, পওহারী বাবা—ব্রহ্মপত্রের রসপানও ছাড়িয়া দিলেন,

তিনি কেবল ৫০টা লক্ষা বাটীনা বস্ত্রখণ্ডে চাকিয়া তাহাব বস পান কবিত্তে লাগিলেন ।

সাধুব থাকিবাব জন্ত — কোন কোন ভক্ত চাঁদা তুলিয়া একটি গৃহ নিম্মাণ কবাহয়া দিয়াছিলেন, পণ্ডহারী বাবা—এই গৃহে দ্বাবন্ধ কবিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন । এ অবস্থায় তিনি কিছুই খাইতেন না । যোগ সাধনাব পব যখন তিনি গৃহে বাহিবে থাকতেন,—তখন তাঁহাব দেহ হইতে এক পবিত্র জ্যোতিঃ বিচ্ছু বহু হইত । সে সুভোজ্জল জ্যোতিব দিকে—লোকে সাহস কবিয়া চাহিতে পারিত না ।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে—তিনি তিন দিন মাত্র গৃহে দ্বাব খুলিয়া বাহিব হইয়াছিলেন । সেই সময় অনেক লোক তাঁহাকে দৌখিবাব জন্ত উপস্থিত হইয়াছিল ।

ইহাব পব ১৫ বৎসর কাল—আর তিনি দ্বাব খোলেন নাই ।—১৫ বৎসব কেহ তাঁহাকে দৌখিতে পায় নাই । ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, সহসা তিনি একদিন দ্বাব খুলিয়া বাহিবে আসেন । তাবপর এক মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান করেন । এই যজ্ঞে ভারতেব সকল তীর্থেব সন্ন্যাসীগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । সাধুগণকে ভোজন কবাইয়া পণ্ডহারী বাবা আবাব দ্বাবন্ধ কবিয়াছিলেন ; সে দ্বাব আব খোলেন নাই ।

## [ ৫ ]

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে—যোগগৃহেব দ্বার সহসা খুলিয়া গেল । লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—পণ্ডহারী বাবা সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ মাখিতেছেন, তাঁহাব সম্মুখে শত শিখায় যজ্ঞাগ্নি জলিতেছে ! দর্শকদিগেব সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল ।

যোগী কাহারও সহিত কথা কহিলেন না, তিনি স্নাতক দেহে—অগ্নিদেহে প্রবেশ করিলেন । অগ্নিদেব সহস্র শিখায় সে পবিত্র দেহ

দেখেন কবিল । দেখিতে দেখিতে সাধুব নথব দেহ দন্ধ হইয়া গেল ।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দেব মে মাসে—যোগীবব অনন্তধামে প্রস্থান করেন ।

পবদিন প্রভাতে—ভক্তগণ সাধুব ভাস্মাবশিষ্ট পবিত্র অস্থি সযত্নে তুলিয়া আনিয়া পূতসলিলা জাহুবীব জলে নিক্ষেপ কবিলেন ।

যেখানে পণ্ডহাবী বাবা দেহত্যাগ কবিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহাব নিকরান শ্রুতিবক্ষাব জন্ত, সম্প্রতি এক সন্নাধিমন্দিব নিৰ্ম্মিত হইয়াছে ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ পণ্ডহাবী বাবাব দর্শন লাভ কবিয়াছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ বাবাকে সংসাবে আসিয়া ধম্মপ্রচাব কবিতে অনুবোধ কবিলে, বাবা হান্তমুখে উত্তব দিয়াছিলেন—  
“ধম্মপ্রচাব করিতে গিয়া আমি কি নাককাটা সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি ক'বব ?”

# কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন

( ১ )

সে আজ প্রায় দুই শতাব্দীর কথা—সাহিত্যোতিহাসের কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে, সাধক চূড়ামণি রামপ্রসাদ ললিতমধুব পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন,—সাহিত্য সাগরে সে বিশাল তবঙ্গের কম্পন এখনও অনুভূত হয়।

অনুমান ১৬৪২ শকে \* হালি সহরেব অগুর্গত কুমারহট্টগ্রামে, কোন বিখ্যাত বৈद्यবংশে—শক্তি ভক্ত রামপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাম রাম সেন। তদ্রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষাংশে তিনি যৎকিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

ধনহেতু মহাকুল,                      পূর্বাঙ্গর শুদ্ধ মূল,

কুতিবাস তুল্য কীর্তি কই।

দানশীল দয়াবন্ত,                      শিষ্ট শাস্ত গুণানন্ত,

প্রসন্ন কালিকা - কুণামট।

সেই বংশ সমুদ্ভূত—                      ধীব সর্ব গুণযুত,

ছিল কত কত মহাশয়।

অনাচর দিনান্তর,                      জন্মিলেন “রামেশ্বর”,

দেবীপুত্র সরল হৃদয়।

তদ্বজ্ঞ “রামরাম”                      মহাকবি গুণধাম,

সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।

প্রসাদ তনয় তাঁর                      কহে পদে কালিকার,

কুণাময়ি, যিনি—করু দয়া ॥

---

\* কাহারও মতে ১১২৭ বঙ্গাব্দে—রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহাতে বেশ বুঝা যায়—রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষগণ নির্ধন ছিলেন না । এই বংশের আদ পুরুষের নাম—কীৰ্ত্তিবাস সেন । কীৰ্ত্তিবাসের সুবিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল । “রাম রাম সেন” পর্য্যন্ত—সেই জমিদারীর উপন্যস্ত ভোগ কবিয়াছিলেন ।

( ২ )

রামপ্রসাদের বিশ্বস্ত জীবনচবিত্র একখানিও নাই । সুতরাং তাঁহার জীবনের সঙ্গে অনেক গিচ্ছদগ্ধা লিপ্ত হইয়া বহিয়াছে । “নব্য ভাবতের” কায়স্থ লেখক রামপ্রসাদের জাতী মা'বন্যব চেষ্টা কবিয়াছেন ; সে ঘটনা ১৩০২ সালের । এই লেখকের নাম—বাসকচন্দ্র বসু । ইনি রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়া পাবনা কা'বন্যব প্রয়াস পাঠিয়া'ছিলেন, কিন্তু বঙ্গের প্রধান সমালোচক দাশেন্দ্র সেন মহাশয় বর্ত্তক প্রযুক্ত “মধ্যম নারায়ণের” ব্যবস্থায়—বাসকচন্দ্রের “বসিকতা” ঠাণ্ডা হইয়া যায় ।

রামপ্রসাদের বাল্যকাল ক্ষিপে ব্যয়িত হইয়াছিল—তাঁহা জানিবার উপায় নাই । তবে এ টুটু জানা যায়—অল্প বালকের মত তাঁহার প্রকৃতি চঞ্চল ছিল না, তিনি ধরাখেলা খেলিতে খ'লিতেই—কালিকার প্রতি ভাক্তমান হইয়া উঠিয়া ছিল । অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত, পাঁচগী ও বঙ্গ এই তিন ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ।

রাম রাম সেন বড় বেশী দিন জীবিত ছিলেন না । পুত্র রামপ্রসাদের কোমল স্বক্কে সংসারের গুরুত্ব অর্পণ করিয়া, তিনি লোকান্তরিত হইলেন । রামপ্রসাদের একটি ভগ্নী এবং দুইটা কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল । এই ভগ্নীর নাম “অম্বিকা”—পিতা থাকিতেই অম্বিকাব বিবাহ হইয়া গিয়াছিল । বালিকা—স্বস্তব বাটিতেই থাকিত । রামপ্রসাদের সচৌদরদ্বয়—নিধিরাম ও বিশ্বনাথ—রামপ্রসাদের কাছেই থাকিতেন ।

পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই রামপ্রসাদ মাতৃহীন হ'ন । এই সময় প্রসাদকে অপ্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়া, তাঁহার কোন প্রবল জ্ঞাতি ষড়যন্ত্র করিয়া,

রামবামের জমিদারীটুকু আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া বিপন্ন প্রসাদ ঘোর দারিদ্রের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না।

এই বিপদের সময়—ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস—বামপ্রসাদকে আশ্রয় দান করেন। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ দরিদ্র ছিলেন, এইজন্য রাম-প্রসাদকে তিনি চাকুবী কবিবাব পবামর্শ দেন।

(১৩)

লক্ষ্মীনারায়ণ কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি চেষ্টা করিয়া ভূকৈলাসেব দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বাটাতে রামপ্রসাদকে জমিদারী সেরেস্তায় মুহূবীর পদে—চাকুরী করিয়া দেন। তখন রামপ্রসাদেব বয়স ১৭।১৮ বৎসব। \*

রামপ্রসাদকে মণিবের হিসাবপত্র সব বাখিতে হইত। কিন্তু চাকুরীতে তাঁহার একেবারে অনুরাগ ছিল না। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ শক্তির ভক্ত ছিলেন,—কিশোর বয়সেই রামপ্রসাদের জীবনে শক্তি ভক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। জগন্মাতা কালিকার দাশছাড়া, গোকুল ঘোষালের মুহূবীরগিরিকে তিনি “ভূতের বেগার” মনে করিতেন।

অল্পদিন চাকুরী করিবার পর, একদিন রামপ্রসাদের উদ্বীতন কর্মচারী হিসাব নিকাশের খাতা পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন—খাতায় যেখানে একটু স্থান আছে, রামপ্রসাদ সেইখানেই একটী গান রচনা করিয়াছেন। উদ্বীতন কর্মচারী রামপ্রসাদেব উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, অর্ধাচীন মুহূবীর হাতে পড়িয়া জমিদারের পাকা খাতা একেবারেই মাটি হইয়া গিয়াছে,—কর্মচারী তৎক্ষণাৎ সেই খাতাখানি ও তৎসঙ্গে অপরাধী রামপ্রসাদকে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রভু সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া স্বয়ং খাতা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। কর্মচারী খাতাখানি

\* কেহ কেহ বলেন—নবরঙ্গ কলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্র রামপ্রসাদের প্রভু ছিলেন।

প্রভু হস্তে অর্পণ করিলেন । প্রভু খাতা খুলিয়াই দেখিলেন—নবীন মুহুরীর হৃদয় হস্তাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

“আমায় দেও মা তবিলদাবী, আমি নেমকহারাম নই শঙ্কবী !

প্রসাদের প্রভু হৃদয়হীন ছিলেন না । তিনি গানটা ২৩ বাব পড়িলেন,—তঁাহাব নেত্রকোণে ভাবুকতা অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল । তিনি বুঝিতে পারিলেন—“প্রসাদ একজন প্রকৃত ভক্ত, তিনি শ্রামাগায়ের তবিলদাবী চাহেন । তাই, আপনার অবস্থা আপনার সত্তা ভুলিয়া গিয়া, সরলহৃদয় প্রসাদ তঁাহাব আবেগময় হৃদয়ের মর্ম্ম কথা হিসাবে খাতায় লিখিয়া ফেলিয়াছেন ।

সেইদিন হইতেই প্রসাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইল । সেইদিন হইতেই মানুষ্যেব দাসত্ব হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন । শুধু মুক্তি নয়—প্রভু প্রসাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্ত মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । প্রসাদের চাকুরী জনিত মানসিক নির্বেদ—একেবারেই ঘুচিয়া গেল । তখন পিঞ্জবমুক্ত বিহঙ্গের মত রামপ্রসাদ কুমাবহটে ফিবিয়া আসিয়া মুক্তকণ্ঠে শ্রামানামের তান ধরিলেন ! সেই অপূর্ব সঙ্গীতের সুধাধারায় আজিও বঙ্গদেশ প্লাবিত !

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে ভাজনঘাট নিবাসী লোকনাথ দাসগুপ্তের কন্যা যশোদাদেবীর সহিত রামপ্রসাদের বিবাহ হয় । তাঁহার শ্বশুর-কুলের পরিচয় এতদধিক আর কিছুই জানা যায় না ।

( ৪ )

রামপ্রসাদ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন । স্বহস্তে মাটি কাটিয়া কুঠির নির্মাণ করিলেন । গুণবতী পত্নীকেও শ্বশুরালয় হইতে লইয়া আসিলেন ।

ঘোর নিশীথে, তিনি জাহ্নবীতীরে বাসিয়া কালিকা নাম জপ করিতেন, জগদম্বার করুণ অম্রি দৃষ্টি সিঞ্চে এই সময় হইতে তাঁহার কবিত্বশক্তি বিকশিত হয় । এই সময় হইতেই তিনি সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ

করেন। তাঁহার সঙ্গীত—সাদা কথার অপূর্ব ভাবময়, যেন জলদ-জালাচ্ছন্ন সুখোৎকৃষ্ট কবিতা, সে সঙ্গীত যে একবার শুনিত, সে আব ভুলিতে পারিত না।

বামপ্রসাদের পত্নী অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন, স্বামীকে আদর্শে তাঁহার চিত্রিত গঠিত হইয়াছিল। একদিন এই মহিষী মহিলা স্বপ্ন দেখিলেন—যেন জগদম্বা বাল্যেই—“তোমার স্বামীকে বামকৃষ্ণমণ্ডপের সিদ্ধপীঠে সাধন কবিত্ত বল, তাহা হইলেই আমি তাহাকে দেখা দিব।” নিশিথেষ্ট স্বপ্ন বিফল হয় না, এই বিশ্বাসে পতিব্রতা প্রভাত হইবামাত্র পতিকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলেন। পত্নীকে প্রতি মায়েব প্রত্যাদেশ হইয়াছে, উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার হৃদয় যেমন আনন্দিত হইল, তেমনি শ্রীমামা’র প্রতি একটু অভিমানবও উদয় হইল। বামপ্রসাদ নিজমুখেই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

“ধন্য দাবা, স্বপ্নে তাবা প্রত্যাদেশ যারে।

আমি কি অধম এত বিমুখ আমাবে ॥”

বামপ্রসাদ পত্নীকে আপনাব চেয়েও ভাগ্যবতী বলিয়া জানিতেন। পত্নীকে কথায় তিনি “সিদ্ধপীঠে” সাধনা কবিত্ত উত্তোগ করিলেন।

হালি সহবেব শিবের গলিতে একটু পাতত জমী ছিল, লোকে তাহাকে বামকৃষ্ণ মণ্ডপ বলিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এইস্থানে লক্ষবার বলি, কোটী বাব হোম এবং কোটীবাব মহাবিষ্ণু জপ হইয়াছিল। বামপ্রসাদ এষ্ট “সিদ্ধপীঠে” পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করিয়া সাধনা আবম্ভ করিলেন। সাধনায় সিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইল। দেবী প্রসন্ন হইয়া ভক্তকে দর্শন দিলেন। \*

\* হালি সহবেব শিবের গলিতে—বামপ্রসাদের সাধনায় স্থান এখনও বর্তমান আছে। যেখানে তিনি পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করেন, সেখানে একটী বটবৃক্ষ দোপাতে পাওয়া যায়। হালি সহর নিবাসী কতিপয় ভক্তসন্তান চাঁদা তুলিয়া এই স্থানে দুইটি গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।



( ৫ )

প্রসাদেব জন্মভূমি কুমারহাট গ্রাম—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র কখনও কখনও কুমারহাটে আসিতেন। এই স্থানে প্রসাদেব সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদের মহত্ত্ব বুদ্ধিতে পারিয়া প্রসাদকে বড় ভক্তি কবিতেন। রাজা ভক্তকবিকে আপনাদের নিকটে রাখিবাব জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন,—কিন্তু স্বাধীনহৃদয় বামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। অযাচিত বাজ-প্রসাদকে প্রসাদ বীরেব মত উপেক্ষা কবিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের প্রতিজ্ঞা—“ক্ষিপ্ত যেই স্বধর্ম খোয়ায় খোসামোদে।” তাই দীনহীন হইয়াও প্রসাদ রাজাব অন্ত্রবোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। প্রসাদের তেজস্বীতায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিবর্ত্ত হইলেন না, বরং প্রসাদের প্রতি তাঁহার ভক্তি শতগুণে বাড়িয়া গেল। রাজা প্রসাদকে ১০০/ বিবা নিষ্কর ভূমি দান করিলেন। সেই ভূমির দানপত্রে লেখা আছে—“পর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ।” গলাশী ক্ষেত্রে মুসলমানের মসনদ যখন ইংরাজের বীরচরণে লুপ্তি হইয়া, তাহার ১ বৎসর পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদকে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

অনেকের ধারণা প্রসাদ ভারতচন্দ্রের মত কৃষ্ণচন্দ্রের একজন সভাসদ ছিলেন। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তবে বামপ্রসাদের মোহিনী কবিতায় মুগ্ধ হইয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বামপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন” উপাধি দান কবেন। প্রসাদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িকও ছিলেন।

প্রসাদ পবন শাস্ত ছিলেন, কিন্তু বলিদান প্রথার অনুমোদন কবিতেন না। পূজাপ্রাঙ্গণে, বজ্রনিদাদী ঢোল ঢকার বাদা—কোলাহল ভেদ কবিয়া, যখন সেই উৎসর্গীকৃত নীরীহ পশুর মর্ম্মভেদী করুণ কাতর আর্তনাদ শ্রবিত হইয়া উঠিত, তখন প্রসাদেব মনে হইত—শেই হর্ষগ

অসহায় জীব বুঝি মানবেব অশ্রুচাবেব বিকল্পে ধর্মসাক্ষী কবিয়া প্রাণ  
বিসজ্জন দিগেছ। তিনি গুরু সাধক ছিলেন না—তেমন একনিষ্ঠ  
মাতৃ-ভক্ত, যেমন নিম্পৃথ পোমক জগতে খুব কম দেখা যায়। প্রসাদেব  
বিশ্বাস ছিল জীবজন্মকে মতি গড়িয়া পূজা কাবলে, সাধকেব মনে  
অহঙ্কাবেব উদ্দেক হয়। তিনি সাধক, তাঁন উপাশ্রু দেবতাব মোময়  
মূর্তি বল্লনা কাববা বিনা আডম্বাবে পূজা কবিবেন।

( ৬ )

বামপ্রসাদ ভক্ত নয়—জগদম্বাব আত্মবে ছেলে। আত্মরে ছেলে  
যেমন জননীৰ স্নেহাঞ্জন ধাবয়া আবদাব কবে, প্রসাদ তেমন শ্রামামা'ব  
কাছে আবদাব কবিভেন। কথায় কথায় মায়েব উপব তাঁহাব অভিমান  
হইত। তাণার অসীম নিভব কলুষহাবিণী কালিকার অভয়চরণ দুখানিই  
তাই তিনি স্বভাবসুন্দব সবল শিশুব মত মাতৃচরণে প্রাণভবিয়া কাঁদিয়া  
গিয়াছেন। সেই অমৃতময় অভিমানভবা কাতব ক্রন্দন, সেই বাশকেব  
মত জোনেব আবদার আজ আমবা “প্রসাদ পদাবলী”রূপে প্রাপ্ত  
হইয়া'ছ। সে পদাবলীৰ অক্ষবে অক্ষবে অকপট ভক্তেব পূত্ৰাশ্রিসক্ত  
ককণ নিবেদন। সেই নিভয় মিষ্ট স্ককণ নীতিমালা অত্যধিক হৃদয়াবেগে  
চিবপবিত্র, বাঙ্গালীৰ অমূল্য বস্তু ॥

বামপ্রসাদেব বচিত ৪ খানি গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়। ১। বিদ্যা-  
সুন্দব, ২। কালীকোর্ন ৩। কৃষ্ণকীর্তন, ৪। পদাবলী,—এই অমূল্য  
পদাবলীৰ জন্ত বামপ্রসাদ বাঙ্গালীৰ হৃদয়ে চিবপবিচিত। এই অমূল্য  
পদাবলীই তাহাকে কালের মুখে চিব অমব কাবয়া বাখিয়াছে। বর্ণনা-  
কৌশলে, শব্দচরণ চাঃঃ্যে প্রসাদেব পদাবলী বঙ্গজননীৰ কণ্ঠেব বস্তুমালা।  
প্রসাদ পদাবলীৰ ভক্তিবল—ভাবশুদ্ধেব মণ্ডপ আপনা হইতেই অবনত  
হইয়াপড়ে। আজও ভিণাবীগণ বামপ্রসাদেব পদাবলী গাহিবা দ্বারে দ্বারে  
কিরিয়া বঙ্গবাসীৰ হৃদয়ে শক্তির প্রতি ভক্তিব উদ্বেগ করিয়া দেয়।

বৈষ্ণব কবি চিবমধুব “পূর্ববাগ”, “মান” “মাথুব” “বিবহ” ছাডিয়া এগনও লোকে পসাদী সূ ব তন্ময় হুয়া যায়।

কবিতা য কাক বর্ণনা—অনাগত শক্তির কাজ বামপ্রসাদেব এ শক্তি যোগেছি ছিল। এ শক্তির কাজে নিপুণ কবি ভাবতচ্ছন্দও পবাজিত। প্রসাদের গ্রামাসঙ্গাথে যে দাশানক তৎবেব আভাষ পাওয়া যায় জগতে তাহা অতুলনীয়—সবল ভাষায় জটিল বিজ্ঞান—বোধ হয় প্রসাদ ছাড়া আব কোনও কবি বুঝাতে পাবেন নাহ।

বাঙ্গালীর খ্যাতি কবি ঈশ্বরগুপ্ত প্রমাণ কবিরাজেন—প্রসাদ লক্ষ পদাবলী বচনা কবিরাজিলেন। বিদ্যাসুন্দর বচনাব পূর্বে বামপ্রসাদ আবও ৭টি মঙ্গল বচনা কবেন,—গাহাতে বিদ্যাসুন্দরবেব অন্তর্নিহিত মানসের ও হাবা তাই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছিল। এই সপ্ত মঙ্গল এখন লোপ পাইয়াছে কেবল বিদ্যাসুন্দরবেব শেষে অষ্টম মঙ্গল আলোচনা কবিরাজ তাহাব আভাষ পাওয়া যায়। বামপ্রসাদ “অষ্ট মঙ্গলার” বিদ্যাসুন্দরবেব শেষ কবিরাজিলেন।

বৈষ্ণবশায় কবি স্বর্গীয় বাধাজীবন বায় ও তদীয় স্নহদ হুগলী ও পাটনা কল্লেজেব ভূতপূর অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে এম, এ অনেক অনুসন্ধান কবিরাজ হালি সহবেব কোন ব্রাহ্মণগৃহ হইতে প্রসাদবচিত তিনটি মঙ্গলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাধাজীবনেব আকাজক্ষা অকালমৃত্যুতে সেই তিনটি মঙ্গল সার্থক। জগতে প্রচাবিত হইবার অবকাশ পায় নাহ। তাহাব পাণ্ডুলিপি হাবাইয়া গিয়াছে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকেবই দুর্ভাগ্য। অধুনা লুপ্ত “বহুদশী” পণিকাব কোন প্রবন্ধে সশীলবাবু এই তিন মঙ্গলের পবিচয় দিয়াছিলেন।

১১৫৭।৫৮ সালে বিদ্যাসুন্দরবেব বচনা আবিস্কৃত হয়। ১৬৬৪ শকে কালীকৌতন সমাপ্ত হয়। বামপ্রসাদেব জন্মগ্রহণের পূর্বে বাঙ্গালার বৈষ্ণবমাজ আপনাদগকে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী

করিতেন। সেই সামাজিক আন্দোলনের তরঙ্গে পড়িয়া রামপ্রসাদও আপনার কোন কোন গীতের ভিত্তিতে, আপনাকে “দ্বিজ রামপ্রসাদ” বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

( ৭ )

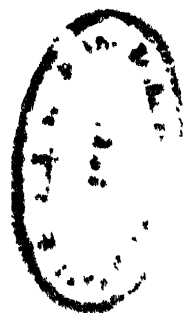
রামপ্রসাদ বীবাচারি শাক্ত ছিলেন, কিন্তু মদ্যপান করিতেন না। তথ্যাপি লোকে তাকে “মাতাল” বলিত। একজ্ঞ তিনি দুঃখ কবিতা বলিতেন—“আমায় মদমাতালে মাতাল বলে।” শাক্ত হইলেও তিনি বৈষ্ণবধর্মী ছিলেন না,—শ্যাম শ্যামা- তাঁহাব চক্ষে অভেদ ছিল। জগৎ জননীকে সকল সমর্পণ করিয়া তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া ছিলেন। শিববাক্য, ষট্চক্রভেদে, তাঁহাব অগাধ ভক্তি ছিল। সাংখ্য বেদান্তেও তাঁহাব ব্যুৎপত্তি ছিল। শুচি অশুচিজ্ঞান তাঁহাব ছিল না। ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি—ব্রহ্মেই তাহার লয়—ইহাই তাঁহার ধর্মমত ছিল।

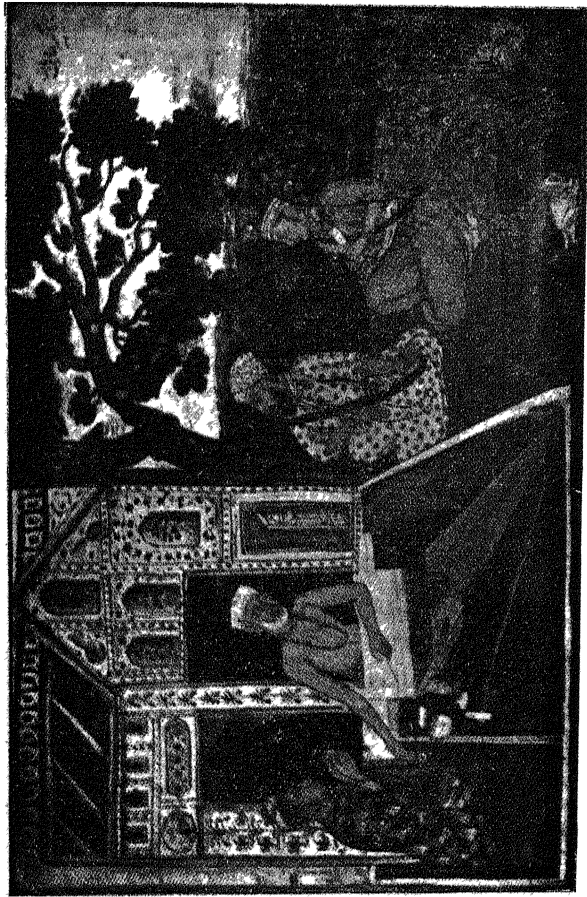
রামপ্রসাদের সমকালে কুমারহট্টে “আজু গোঁসাই” নামে তাঁহার এক প্রাতিবাসী ছিলেন। আজু গোঁসাই গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। কাজেই গোঁস্বামী প্রভুর সঙ্গে প্রসাদের মতভেদ হইত। তান্ত্রিক রামপ্রসাদকে বিদ্রূপ কবিতা গোঁস্বামী অনেকগুলি গান বাঁধিয়াছিলেন। সেই সকল গানে প্রসাদেরচিত সঙ্কীর্তের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

বাক্যিকো—রামপ্রসাদের পত্নীবিয়োগ ঘটে। পত্নীবিয়োগে তিনি সন্ন্যাসী হ'ন।

রামপ্রসাদের মৃত্যু—অলৌকিক ঘটনাসংঘটন। কথিত আছে তিনি আপনার আসন্নমৃত্যু জানিতে পারিয়া কালীপূজার আয়োজন করেন। সেই প্রতিমা বিসর্জন কবিত্তে গিয়া, আর তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠেন নাই। কালী নাম গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদৌর্গ হইয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

রামপ্রসাদেব প্রপৌত্র গোপালকৃষ্ণ সেন। গোপালকৃষ্ণেব পুত্র—  
কালীপদ সেন—উড়িস্যাব অন্তর্গত ভজুল নামক স্থানে ইঞ্জিনিয়ারেব  
কার্য্য কবিত্তেছেন। কালীপদ বাবুব চারিটি পুত্রেব মধ্যে তিনজন  
বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাধিধাবী।





শিখ্যাবেষ্টিত তুকারাম

# সাধু তুকারাম

( ১ )

বহুশতাব্দীর পরাধীনতায় অবগত মহারাষ্ট্র—স্বজাতির করুণ কণ্ঠের  
তাঁহাকারে বিচলিত হইয়া, যখন দাস্তিক ও বিলাসী যবনের কঠিন হস্ত  
হইতে, স্বাধীনতা প্রত্যাহরণের জ্ঞাত, ধুমায়িত বহির হ্রাস, ধীরে ধীরে  
আপনার ভেজঃ সঞ্চয় করিতে ছিল—ঠিক সেই সময়ে পুনানগরীর  
অনতি দূরে অবস্থিত দেহক গ্রামে সাধু শিরোমণি তুকারামের  
জন্ম হয়।

দেহক গ্রামে, ‘বাহেলাজী’ নামে একজন ভদ্রলোক-বাস করিতেন।  
বাহেলাজী জাতিতে শূদ্র হইয়াও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের  
জ্ঞাত বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সরলতা ও সাধুতায়  
মুগ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্যের সকল লোকেই তাঁহাকে সম্রমের চক্ষে নিরীক্ষণ  
করিত। এই ভগবদ্ভক্ত বাহেলাজীর ঔরসে, ১৫১০ শকাব্দে [ ১৫৮৮  
খৃঃ ] “কঙ্কালই” নাম্নী মহিষসৌ মহিলার গর্ভে, তুকারাম জন্মগ্রহণ  
করেন।

তুকারামের এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম সাওজী।  
সাওজীর ধর্ম প্রবৃত্তি বড় প্রবল ছিল। অগ্রজের পুত্র আদর্শে তুকারামের  
বাল্যজীবন গঠিত হইয়াছিল। শিশু “তুকারাম” কুলদেবতা “বিঠোবার”  
পূজা না করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেন না।

একদিন এক জটাবক্লধারী সন্ন্যাসী বাহেলাজীর ভবনে আতিথ্য গ্রহণ  
করেন। বলাবাহুল্য, এই ধার্মিক পরিবারে অতিথির সেবায়ত্নের কোন



ক্রটি হয় নাই। এই সন্ন্যাসীব সঙ্গে, পিতামাতা পত্নী ও ভ্রাতার অজ্ঞাতসারে, গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া সাওজী পলায়ন করেন। অনেক অল্পসন্ধানেও আব তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

এই ঘটনায় বৃদ্ধ বাহেলাজীর শরীর একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের শোকে, অক্লান্ত যন্ত্রণায় বাহেলাজী একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন। কাজেই বালক তুকারামের কোমল স্বঙ্গে সংসারের সমস্ত ভার পতিত হইল। তুকারাম পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তাহার বয়স তখন ১৩ বৎসর মাত্র।

সংসারে তুকারামের আসক্তি ছিল না। তিনি ধর্ম কর্ম পূজা অর্চা লইয়াই থাকিতেন; ইন্দ্ৰায়ণী নদী তীরস্থ “বিঠোবার” মন্দিরে তুকারাম দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ব্যবসায় করিয়া তুকারাম যাহা উপার্জন করিতেন, তাহা দরিদ্র সেবায় ব্যয়িত হইত। সংসারের প্রতি পুত্রের এইরূপ ঔদাসীন্দ্ৰ দেখিয়া, বাহেলাজী তুকারামের বিবাহ দিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে, ‘রঘুমাই’ নামী এক বালিকার সঙ্গে তুকারামের বিবাহ হয়। “রঘুমাই”—একে দরিদ্রের কন্ডা, তাহাতে আবার চিরকুণ্ডা, স্ততরাং বিবাহ করিয়া তুকারাম স্তম্ভী হইলেন না। তাঁহার মন একেবারেই দমিয়া গেল, সংসারের প্রতি ঘৃণা জন্মিল; প্রথম যৌবনে—একটা অনন্ত ভৃষার আবেগে—তিনি আপনাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় বিবেচনা করিলেন। ব্যবসায়েও আর তাঁহার মন রহিল না। ক্রমে, কমলার কুদৃষ্টিতে তুকারামের আয় একেবারেই কমিয়া গেল। তুকারাম ধন করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। শেষে এমন অবস্থা হইল যে, আর কেহ তাঁহাকে ধার দিতে চাহেন না—বৃদ্ধ পিতামাতাও কুণ্ডা পত্নীকে লইয়া তুকারাম বড় বিপদে পড়িলেন। কেমন করিয়া এতগুলি প্রাণীর অন্নের সংস্থান হয়? তুকারাম কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

( ২ )

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ছুৰ্ভিক্ষ দেখা দিল । দেহুক গ্রামেও কালের ভেড়ী শ্রবণ ভৈরব ববে বাজিয়া উঠিল । অনাহাবে, মনস্তাপে বৃদ্ধ বাহেলাজী সাংঘাতিক পীড়িত হইলেন । সংসার অচল হইয়া পড়িল । তুকাবামের পত্নী—জীজাই, তাহাব দ্বাবা গৃহকর্ণের কোন সাহায্যই হইত না । সকল দিক্ ভাবিয়া, আত্মীয়গণের পরামর্শে, তুকারাম ‘জীজাই’ নাম্নী এক ধনীর ছুহিতাকে আবাব বিবাহ কবিলেন । এই বিবাহে—  
তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ ঘটিল । সেই অর্থ লইয়া তুকাবাম ব্যবসায়ের উন্নতির জন্ত চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । কিন্তু বিছুতেই কিছু হইল না, সোভাগ্যলক্ষ্মী তুকাবামের প্রতি প্রসন্ন হইলেন না, সংসারের অভাবরাশি দিন দিন বাড়িতে লাগিল । তুকাবামের চক্ষে অন্ধকাব লাগিল ।

জীজাই ধনীর কন্যা এবং সুন্দরী ছিলেন । তাঁহার স্বভাবটা বড় কর্কশ ছিল । একে সংসারের কষ্ট, তাহাব উপব স্বামীব বৈরাগ্য ভাব—  
এই উভয় কারণে জীজাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন । বর্ণিতাব ভৎসনা—  
তুকারামের গাত্র অলঙ্কার হইল । জীজাই সর্বদাই স্বামীব ক্রটি বাহির কবিয়া কলহ কবিতেন, কিন্তু উদাব স্বভাব তুকারাম আশ্চর্য্য সঙ্কীর্ণতা বলে—পত্নী কর্তৃক প্রযুক্ত সমস্ত অশাস্ত্রীয় বিশেষণ গুলি অগ্নান বদনে পরিণাক কবিয়া ফেলিতেন । কাজেই বিপ্লব আব অধিক দূব অগ্রসর হইত না । ইহাতে কিন্তু জীজাই আবও কুপিতা হইয়া তুকাবামকে গালি দিয়া গায়েব ঝাল মিটাইতেন । তুকারাম, অনুবাগ-স্নিগ্ধ-সান্ত্বনা বাক্যে উত্তেজিত সিংহীকে শাস্ত কবিবাব চেষ্টা কবিতেন । স্বামী অপবাধ স্বীকাব করিলে, দম্পতীর মধ্যে ক্ষণস্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হইত ।

অর্থের চেষ্টায় তুকারাম একদিন স্থানান্তরে গমন কবেন । সেখানে তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার দেন ।

তুকারাম সেই ইক্ষু বোঝা মাথায় লইয়া বাটা ফিবিতে ছিলেন। পথিমধ্যে—বালকগণ তুকারামের কাছে ইক্ষু প্রার্থনা করিল, তুকারাম প্রত্যেক কেই একগাছি করিয়া ইক্ষু দান করিলেন। শেষে আর এক গাছি মাত্র রহিল—তাহা লইয়া তুকারাম বাটাতে প্রবেশ করিলেন।

স্বামী—সমস্ত ইক্ষু পথে আসিতে আসিতে বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন—দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী পূর্বেই লোক মুখে এসংবাদ পাইয়াছিলেন।

ক্রোধ ও ঈর্ষায় রমণীর প্রত্যেক শিরা উপশিরায় দাবানলেব সৃষ্টি হইল! আগ্নেয় গিরির প্রচ্ছন্ন অগ্নি কণা স্ফুলিঙ্গ উলগারের আয়োজন করিল! সুন্দরী বেপমান বক্ষে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অপরিত্যজ্য চিন্তাকে সঙ্গিনী করিয়া তুকারাম একখণ্ড ইক্ষু হস্তে বাটাতে প্রবেশ করিলেন! বাজ্বিতের বাহুপাশ বিমুক্তা অভিসাবিকার ছায় উষা সুন্দরী তখন পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, তখনও প্রভাত হয় নাই। সেই স্পষ্ট আলোকেই—তুকারাম দেখিতে পাইলেন, গৃহিনীব মুখ কাল মেঘের মত হইয়াছে! তুকারাম কম্পিত পদক্ষেপে স্পন্দিত হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া ইক্ষুদণ্ড গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। সর্বাঙ্গীন পরিশ্রমে তাঁহার দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পাড়তেছিল, তিনি বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছেন, সহসা গৃহিণী সেই ইক্ষুদণ্ড তুলিয়া লইয়া, অগ্নি শলাকাবৎ স্থির কটাক্ষ স্বামীর মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিয়া—স্বামীকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। প্রহাবের চোটে ইক্ষুদণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

পত্নীর কোমল কর পল্লবের অমৃত স্পর্শে শান্তিলাভ করিয়া, তুকারাম সেই ভূপতিত দুইখণ্ড ইক্ষু তুলিয়া লইলেন। তা'র পর করুণা বিকম্পিত কণ্ঠে পত্নীকে সঘোষন করিয়া কহিলেন—“প্রিয়তমে! আজ জানিলাম—তুমি আমার যথার্থই ভালবাস। এই আধ গাছটি একা থাইতে ভাল লাগিবেনা বলিয়া, তুমি দুই খণ্ডে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ!” তুকারামের

প্রসন্ন মুখে বিষাদের কোনও নিদর্শন ছিল না। পত্নীর প্রহারে শরীর জর্জরিত, তবুও তাঁহার বদনে সেই স্বভাব শান্ত দিব্য হাস—তেমনি উজ্জল, তেমনি মধুর, তেমনি অকৃত্রিম ! কিন্তু তুকারামের দ্বিতীয় পত্নীর চক্ষুদ্বয় তখনও জলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতে ছিল !

( ৩ )

পূর্বেই বলিয়াছি দাক্ষিণাত্যে সেবার ছুভিক্ষের বিপুল বিকাশ ! অনাহারে শীর্ণ দেহ নরনারী দলে দলে মৃত্যুর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতেছিল। অচিরে, তুকারামের বাটীতেও চির বিদায়ের শোক রাগিনী বাজিয়া উঠিল ! তুকারামের বৃদ্ধ পিতা মাতা, ভ্রাতৃজায়া, প্রথমপত্নী এবং দুইটি সন্তান—একেবারে শমনের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বাহারা অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ডে তুকারামের সহায় বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা সকলেই চলিয়া গেল ! তুকারামের উৎক্লিষ্ট মন—অবলম্বন শূন্য হইয়া পড়িল ! যখন সকল বন্ধনই ছিন্ন হইল—তখন তুকারাম সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া আত্ম নিষাসে অগ্রসর হইলেন।

একদিন গভীর রাত্রে, স্থপ্তি স্নুখে মগ্না দ্বিতীয় পত্নীকে ধূলিমুষ্টির মত পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষত হৃদয়ের স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্ত তুকারাম সংসার আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যুবতী জীজাইয়ের অবশুষ্ঠনের অন্তরালে অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিল। অহুতাপ বিদ্বা রমণী শীঘ্রই বুঝিতে পারিল—তাহার স্বামী “বিঠোবার” চরণে কিশোর জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ! স্বামাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার শক্তি আর তাহার নাই।

বিংশতি বর্ষ বয়সে—তুকারাম সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিলেন। কুল দেবতা “বিঠোবার” মন্দিরে, সংসারাশ্রম হইতে অপমৃত তুকারাম পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—গার্হস্থ্য

ধর্মের কর্মতালিকার মধ্যে এমন আর কিছু নাই, যাহা তাঁহার দ্বারা অনুসরণ হইতে পারে। তুকারাম বিঠোবার চরণে লুপ্তিত হইয়া বলিলেন—

“যাহা ভাল বাসিতাম, ছেড়েছি সকল।

তুমি মোরে ছাড়িও না, দয়াল বিঠল!”

হে দেব! অপর কিছু নাহি অভিলাষ।

তব পদে বাঁধা যেন থাকে তব দাস॥”

মাঘ মাসের শুক্লা দশমীর কৌমুদী ফুল রজনীতে, একজন সাধু তুকারামকে ‘বিষ্ণুমন্ত্রে’ দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

“ভজন পূজন কীৰ্ত্তনে”—তুকারামের দিন বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। তিনি বিঠোবার একনিষ্ঠ সাধক, কিন্তু তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাসের কোনও বাহ্য বিকাশ ছিল না।

দেহক গ্রামের ক্রোশ ত্রয় পশ্চিমে “ভাণ্ডারী” পাহাড়; স্থানটি বড় সুন্দর। সহস্র কোলাহল সঙ্কুল নগরের প্রান্ত ভাগে—বনস্পতির শ্রাম শীতল ছায়া বেষ্টিত টিনার রক্ততধারা বিধৌত, বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠ মুখরিত এই শান্তিময় পর্বতে, তুকারাম সমস্ত দিবস ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকিতেন, রাত্রে—বিঠোবা মন্দিবে ফিরিয়া আসিতেন।

একদিন কুসুম রাগ রঞ্জিত অরুণ প্রভাতে, তুকারাম নদীতে স্নান করিতেছেন, এমন সময় একজন কৃষক আসিয়া উপস্থিত। কৃষক তুকারামকে বলিল—“শেঠজী! আমি বড় মুকিলে পড়িয়াছি। আমার শস্য ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে—এমন একটা লোক পাইতেছি না। যদি তুমি আমার ক্ষেত্রে বসিয়া ভজনাদি কর—আমার বড় উপকার হয়। আমার ক্ষেত্রটিও আশুলান হয়, তোমারও কিছু লাভ হয়। আমি তোমায় আধমণ করিয়া ছোলা দিব।” যদিও তুকারাম পত্নী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীর স্মরণ পোষণের দারিদ্র্য অস্বীকার করিতে

পারেন নাই। সুতরাং কৃষকের কথার তুকারাম সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন,—“বেশ, আমি তোমার ক্ষেত্রে বসিয়া হরিনাম কবির, আমার পারিশ্রমিক “দানা” তুমি আমার জীব কাছে পাঠাইয়া দিও।”

( ৪ )

পরদিন তুকারামের উপর ক্ষেত্র রক্ষার কৰ্মভার অর্পিত হইল। ক্ষেত্র মধ্যে একটা কাঠনির্মিত মঞ্চ ছিল,—তুকারাম তাহার উপর বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে নাম জপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শস্য লোভে দলে দলে পক্ষীকুল ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিল তুকারাম দেখিলেন—ক্ষুধার্ত পক্ষীকুল শস্য ভক্ষণ করিতেছে, ক্ষুধার্ত প্রাণীকে তাড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য নহে। তুকারাম পক্ষীগণকে বাধা দিলেন না, তাহার অকুতোভয়ে শস্য নষ্ট করিতে লাগিল। ক্ষেত্রের রক্ষাকর্তা—মঞ্চোপরি ধ্যান মগ্ন।

এইরূপে একমাস গত হইল। মাসান্তে ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিল। শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র—পক্ষীকুলের বাসস্থান হইয়াছে, দেখিয়া কৃষকের দেহ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। কৃষক তুকারামকে অনবধানতার জন্য যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া গ্রামেব কতকগুলি মাতব্বর ব্যক্তিকে ডাকিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিল। গ্রামবাসীরা কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমার ক্ষেত্রে কত মন শস্য উৎপন্ন হয়?” কৃষক বলিল—“দুই খণ্ডী”। তখন সকলের বিচারে স্থির হইল—“তুকারামকে কৃষকের ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে, দুই খণ্ডী শস্যের মূল্য দিতে হইবে।

সাধু প্রথমতে দণ্ডিত হইলেন। ঘণ্টের বিরুদ্ধে তাঁহার বলিবার কিছু ছিল না। বাঁহারা মধ্যস্থ হইয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে একজনের

একটু বিবেক শক্তি ছিল। তিনি সকলকে বলিলেন—“বিচার তো শেষ হইল, কিন্তু কৃষকের ক্ষেত্রের অবস্থাতো আমরা কেহই দেখি নাই। বিচার কেবল এক পক্ষের কথা শুনিয়া হইয়াছে। তুকারাম আত্ম পক্ষ সমর্থনের জন্য একটা কথাও বলেন নাই। অতএব চল—স্বক্ষে কৃষকের ক্ষেত্রের অবস্থাটা দেখিয়া আসা যাউক।” একথা সঙ্গত মনে করিয়া সকলেই কৃষকের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ক্ষেত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের বিশ্বাসের সীমা রহিল না। সেই শ্রামোজল শস্যালোক শোভন ক্ষেত্রে পক্ষীকুলের অত্যাচারের চিহ্নমাত্রও নাট,—স্বর্ণ শিষ্য শস্য বৃক্ষগুলি মন্দ মন্দ অনিলে কম্পিত হইতেছে! বাপাব দেখিয়া কৃষকও অবাচ হইয়া গেল! শেষে সকলে মিলিয়া শস্য গুলি একত্র করিয়া মাপিয়া দেখিলেন—যে ক্ষেত্রে মাত্র দুই খণ্ডী শস্য উৎপন্ন হইত, সেই ক্ষেত্রে ১৭ খণ্ডী শস্য উৎপন্ন হইয়াছে !!

সেই কোতুলাক্রান্ত লোকাবণ্যের মাঝখানে, তুকারাম নীরব শান্ত, উর্দ্ধ দৃষ্টিতে নিভৌকচিত্তে দাঁড়াইয়া ইষ্টদেব বিঠোবাব এই অপূৰ্ব করুণার লীলা দেখিতেছিলেন, কৃষক অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণতলে নৃত্তিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন তুকারামের প্রতি অনেকেরই ভক্তি বাড়িয়া গেল।

যাঁহারা তুকারামের অপরাধের বিচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার বিচার কবিলেন। ক্ষেত্রাধিকারী কৃষককে হুচখণ্ডী শস্য দিয়া অবশিষ্ট শস্য তুকারামকে গ্রহণ কবিত্তে বলিলেন। তুকারাম শস্য গ্রহণে সন্মত হইলেন না, সেই উদ্বৃত্ত শস্য একজন ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত রহিল।

কেহ কেহ বলেন—এই শস্য বিক্রয়বাত অর্থে “বিঠোবাব” ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার করা হইয়াছিল।

( ৫ )

খীত্রট তুকাবাম দৈব অন্তগ্রহ লাভ কবিলেন । তাণ্ডাব ভাগ্যে কবি পতিষ্ঠা লাভেব মাহেন্দ্র সুযোগ উপস্থিত হইল । “গৃহলক্ষ্মীব” পৰিবৰ্ত্তে— “কলালক্ষ্মী” তাহাব উপব প্রসঙ্গ হইলেন ।

বিঠোণাব প্রেমে বিভোব হইয়া তুকারাম কবিতা বচনা কবিত্তে লাগিলেন । এই সকল কবিতা “অভঙ্গ” নামে পৰিচিত । তুকাবামেব “অভঙ্গ” মহাবাহুবাসী বৈষ্ণবগণেব কাছে—বেদেব মত সম্মানাই । জনসাধারণও সেগুলিকে পবিত্র ভাবিয়া আদৰ কবিতা থাকেন । ব্রাহ্মণ গৃহ, কথক শ্রাবক—সকলেব গৃথেই তুকারামেব “অভঙ্গ” । তুকাবাম ধর্মোপদেষ্টা,—তাঁহাব জীবনে জীবন্ত ধর্ম প্রতিভাত ছিল, পক্ষান্তবে তি ন একজন স্বভাব কবি—নীতি ও ভক্তিপূর্ণ বলিয়া তাঁহার কবিতা আবাল বৃদ্ধ বনিতাব হৃদয়গ্রাহিনী হইয়াছিল । এখনও প্রাতবর্ষেব আষাঢ় ও কার্তিক মাসে বিটোবা মন্দিবে লক্ষ লোক সমবেত হইয়া তুকাবামেব “অভঙ্গ” গান কবিতা থাকে । এই উপলক্ষে পণ্ডরীপবে একটা বড় মেলাও বসিতা থাকে ।

তুকাবাম ভক্তিমার্গকে মোক্ষলাভেব শ্রেষ্ঠ সোপান মনে কবিতেন । ধর্মসাধনে বাহ্যাদম্বকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা কবিতেন । স্বরচিত কোন একটা অভঙ্গে তিনি সন্ন্যাসীব লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল ।

কথা অতি মিষ্ট, আব মন ভাল যা'ব,  
নাট বা বহিল বঠে ফুল মালা তাব ।  
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভ ক'বেছে যেজন—  
নাট বা সে শিবে জটা করিল ধারণ ।



আসক্তি নাহিক যার পবনারী প্রতি,  
ভস্ম যদি না মাথে সে, কিবা তাহে ক্ষতি ?  
নিন্দায় যে মুক, যেবা অন্ধ পরধনে—  
তুকা বলে সন্ন্যাসী জানিও সেই জনে ”

ঈশ্বরে তুকারামের ঐক্য বিশ্বাস ছিল । সেই বিশ্বাসের বলে—তিনি ধর্ম প্রচাৰেব আসন গ্রহণ করিলেন । অনেকেই তাঁহাব শিষ্য হইল, মহারাষ্ট্র দেশ তাঁহাকে জাতীয় কবি বলিয়া গ্রহণ করিল । অনেকেই বলিতে লাগিল “তুকারাম অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন—দেবতাব অবতাব ।”

তুকারামকে ধর্ম প্রচার কবিত্তে দেখিয়া, মহারাষ্ট্র প্রদেশের কতকগুলি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কুপিত হইলেন । চিঞ্চবাদ গ্রামের চিন্তামণি দেব—তুকারামের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । দেহু গ্রামের ময়াজী গোসাই—সর্ব সাধারণকে বলিতে লাগিলেন—“তুকারাম একজন ভণ্ড, রাত্রে তাহার আশ্রমে—একজন বেণ্ডার গাতবিধি হয় ।” যাহারা ময়াজীব কথা বিশ্বাস করিলেন না, ময়াজী তাঁহাদিগকে প্রতক্ষ্য প্রমাণ দেখাইতে স্বীকৃত হইলেন ।

একদিন ভাণ্ডারী পৰ্ব্বতের উপকণ্ঠে—তুকারাম ভজন গাহিতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহার নয়ন সম্মুখে এক নারী মূর্তির আবির্ভাব হইল । রমণী অসামান্য সুন্দরী, জ্যোৎস্নালোকের মত তাহার অতীন্দ্রিয় রূপ,—প্রসাধনে পবিমার্জিত হইয়া তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল । নির্জন প্রদেশে মূর্তিমতী দৃশ্যবৃত্তির মত রমণীর আগমনে, তুকারাম রমণীর দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন, সেই হাস্যকে আপনার কামনার অনুকূল করিয়া বিনয় মধুর বচনে নাবী আপনার প্রার্থনা জানাইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । কিন্তু তুকারাম কোন কথা কহিলেন না । তিনি ধ্যান মগ্ন হইলেন ।

রজনী শেষ যামে উপনীতা—তথাপি সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল না। মন্থের ইচ্ছিতানুবর্তিনী অভিসারিকা আর কতকক্ষণ অপেক্ষা করিবে? নিজের অযাচিত সাধুরা সেই বিজন আধারের হৃদয়ে হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া, —রমণী ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষকে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিল। কিন্তু সাধু দেহ স্পর্শ মাত্র—হতভাগিনী অরুন্তদ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া চীৎকার কবিতা উঠিল! তুকারাম আর একবার মাত্র সেই শৈশবগীর প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন,—সে দৃষ্টিতে কি নীবব তীর তীরধার! সে দৃষ্টিতে কামিনী মন্মথের উপর নিদারুণ আঘাত পাটল। তাহার সেই লালসা মাথা ওষ্ঠাধরের গোলাপ ফুল্লতা শুখা—চ’থে মুখে হতাশাস ফুটিয়া উঠিল। রমণী ছিন্ন মূল লতিকার ছায়া মাটিতে পাড়িয়া গেল। তুকারাম অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

আশ্রম সন্নিক্ত বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়া কতকগুলি গ্রামবাসী—তুকারাম ও রমণীর ব্যবহার দেখিতেছিল। বলা বাহুল্য—মহাজী ঠেহাদিগকে সাধুব নষ্ট চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য ডাকিয়া আনিয়াছিল। তুকারামের প্রস্থানেব পর গ্রামবাসীরা রমণীর নিকটে আসিল। জনসমাগমে রমণীও উঠিয়া বসিল। তাহার মূর্তি—নিশ্চল রক্তহীন—যেন ভাস্কর প্রেরসা মন্মথ মূর্তি! সেই অরবিন্দ সুন্দর মুখ খানিতে পাণ্ডুরতার ছায়া ভাসিতেছে। প্রাণদগ্ধে দগ্ধিত ব্যক্তি যেমন নিমেষ মধ্যে আপনাত অতীত ও বর্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া লয়, তারপর বধমঞ্চ দেগিয়া শিহরিয়া উঠে—রমণীর অবস্থা তখন ঠিক সেই প্রকার! অনুতাপে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, অভাগিনীর পাষণ্ড প্রাণে—বিশ্বপ্রেমের প্রাণন আসিয়াছিল। অভিসারিকার অন্তরাত্মা তাহাকে সহস্র ধিকার দিতেছিল।

রমণী সঙ্কোচে—সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল—তাহার এই নির্লজ্জ ব্যর্থ উদ্বল, মহাজীর অর্থলোভে!! মহাজীর অনুরোধেই সে

—সাধুবকে কলুষিত কবিত্তে আসিয়াছিল। কিন্তু সে হাতে হাতে  
পাপের প্রতিকূল পাইয়াছে, সাধু অঙ্গ স্পর্শ কবিয়া তাহার দেহ তপ্ত  
লৌহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে ।

গ্রামবাসীবা এ ঘটনার প্রথম হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাবা  
তুকারামেব জিতেন্দ্রিয়তার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিল। বমণীব বথায় তখন  
তাহাবা ষড়িতে পারিল—পাপিনী, মম্বাজী কর্তৃক প্রেরিতা, একজন  
নিষ্কলঙ্ক সাধুব মহান্ চবিত্তে—একটা প্রতাবকেব কথায় তাহাবা সন্দেহ  
করিয়াছিল বালয়া সকলেহ লজ্জিত হইল। সাধাবণেব কাছে এই ঘটিত  
ষড়যন্ত্ৰ প্রকাশ হওয়ায়—মম্বাজীবও লাজ্জনাব আব সীমা বহিল না।

এই ঘটনায়, অগ্নি পবীক্ষিত কাঞ্চনেব জ্বায় তুকাবামেব সাধুতা,  
সরলতা, মহিষ্ণুতা ও নিস্পৃহতা—আবও অধিকতব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।  
লোকে তাঁহাকে আরও শ্রদ্ধা করিতে শিখিল।

তুকাবামেব মৃতসঞ্জীবনী একটী মাত্র দৃষ্টিতে বমণীব পাপ কামনা  
নিভিয়া গিয়াছিল। সে আপনাব যথাসৰ্ব্বদ্ব দবিদ্রগণকে বিলাইয়া দিয়া  
—সন্ন্যাসিনী সাজিয়া, তুকারামের পদযুগল অশ্রু ধৌত কবিল। তুকা-  
বাম—সেই মানব সমাজেব অস্পৃশ্যা পতিতা অবলাকে নিষ্কুমন্ত্ৰে দৌলিত  
করিলেন। সাধু হৃদয়েব আশীৰ্ব্বাদ ও দেব প্রসাদ লাভ কবিয়া বমণী  
সিদ্ধ যোগিনী হইল। লোকে বুঝিল—তুকাবামেব আশ্রম—তাপিত  
মানবাত্মাব শাস্তিময়ী বিশ্রাম ভূমি।

—তুকাবাম কামকে জয় কবিয়াছিলেন ॥

( ৭ )

তুকাবামেব প্রতিপত্তি অনেকেবই নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

বিঠোবা মন্দিবেব পার্শ্বে, সাহজী নামক এক ব্রাহ্মণের এতটী মগ্গান  
ছিল, বাগানেব চারিদিকে কণ্টক বৃক্ষের বেড়া। একদিন ঐ ষড়িতে

বিঠোবা মন্দিরে প্রতিবৎসর একটা উৎসব হইত । একদা এই উৎসব উপলক্ষে—মন্দিরে লোকে লোকারণ্য হইল । তুকারাম দেখিলেন—সাহজীব উদ্ভানের একদিকের বেড়া না কাটিয়া দিলে, সাধারণের দব দর্শনে ব্যাঘাত জন্মিতেছে । তুকারাম স্বহস্তে সেই সকল কণ্টক রক্ষের শ্রেণী উৎপাটন করিয়া দিলেন, অনেক লোক বাগানে প্রবেশ করিয়া দেবমূর্তি দর্শনের সুযোগ পাইল ।

উৎসবান্তে তুকারাম—সাহজীব বাগানে বেড়া বাঁধিয়া দিতেছেন, এমন সময় সাহজী আসিয়া উপস্থিত । ভগ্ন বেড়া দেখিয়া সাহজীব আপাদ মস্তক ক্রোধে জলিয়া উঠিল । তুকারাম সাহজীকে বলিলেন—“লোকে ঠাকুর দেখিবার জন্ত দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছিল না, তাই আমি তোমার বাগানের বেড়া কাটিয়া দিয়াছিলাম । আজ সেই বেড়া আবার বাঁধিয়া দিতেছি । ভাই ! তুমি রাগ করিও না, ইহাতে তোমার কিছুই ক্ষতি হয় নাই । পাছে এই ভাঙ্গা বেড়া দিয়া কোনও পশু প্রবেশ করিয়া তোমার গাছ পালাব ক্ষতি করে—সেইজন্ত আমি কাল সমস্ত রাত তোমার উদ্ভানেব রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলাম ।”

তুকারামের সরল কথায় সাহজীব ক্রোধ শান্ত হইল না । সহসা তাহার মুখমণ্ডলে বিদ্ৰাতের মত কি একটা জলিয়া উঠিল । সেই মুহূর্তেই মাথায় কঠিন আঘাত অনুভব করিয়া তুকারাম মুচ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন ।

শৃঙ্গ সাহজী করধৃত দণ্ডদ্বারা সাধুকে প্রহার করিয়াছিল ।

( ৮ )

শিষ্যগণের সদয় স্মরণার্থে গুণে শীঘ্রই তুকারামের চেতনা ফিরিয়া আসিল । একজন শিষ্য সাহজীকে প্রতিফল দিতে চাহিল, তুকারাম নিষেধ করিলেন, বলিলেন—“ধামায় তো বেগী লাগে নাই, কেন তোমরা

ব্রাহ্মণের উপর প্রতিশোধ লইবে ? আমিই তো বেড়া কাটিয়া দিয়া তাহার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম।”

পরদিন তুকারাম সাহুজীব বাটীতে গিয়া মার্জনা ভিক্ষা করিলেন !!

শীঘ্রই সাহুজীব এক পুত্র সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইল। রোগ সংক্রামক, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া তুকারাম বালকের স্নানভাষার ভাব লইলেন। তুকারামের যত্নেই সে যাত্রা বালক যমের মুখ হইতে ফিবিয়া আসিল। অন্ততঃ সাহুজীব তুকারামের চরণে লুপ্তিত হইল ! তুকারাম তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন !

তুকারামের কীর্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের বিষদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়াছিল। বাথোলী গ্রামের রামেশ্বর ভট্ট—তুকারামের বিরুদ্ধে এক অমূলক অভিযোগ উপস্থিত করিল। দেহর পাটেলের নিকট হইতে রামেশ্বর এক অনুজ্ঞাপত্র বাহির করিল—ঐ অনুজ্ঞাপত্রে তুকারামকে দেহ গ্রাম হইতে নির্বাসিত করিবার আদেশ ছিল।

তুকারাম বড়ই বিপদে পড়িলেন। গ্রাম পরিত্যাগ করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি আশৈশবের আরাধ্য “বিঠোবা” প্রভুকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেও সম্মত ছিলেন না। তুকারাম মন্দিরে অনশনে অনিদ্রায় ত্রয়োদশ দিন পড়িয়া রহিলেন। রামেশ্বর, তুকারাম বচিত অভঙ্গগুলি ইন্দ্রায়নীর জলে নিক্ষেপ দাবল। তুকারাম কবিতার শোকে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, শত্রুদের আর উল্লাসেব সীমা রহিল না। তাহার সগর্বে প্রচার কবিয়া বেড়াইতে লাগিল—“শূদ্র তুকারামের মুখে আর আমাদের ধর্মোপদেশ শুনিতে হইবে না, তাহার কবিতার খাতাপত্র সমস্তই জলমগ্ন হইয়াছে।”

কিন্তু তিন দিন পরে লোকে দেখিল—তুকারামের খাতাপত্র ইন্দ্রায়নীর জলে ভাসিতেছে। একজন শিষ্য গিয়া সেগুলি কুড়াইয়া আনিল,

তুকারামের মুখে হর্ষের উজ্জ্বল প্রভা ফুটিয়া উঠিল। তুকারামকে ঐশী শক্তিশালী জানিয়া, কর্তৃপক্ষ নির্বাসন দণ্ড রহিত করিয়া দিলেন :

( ৯ )

পুনায় অনঘড়্ নামক এক ফকীর বাস করিতেন। এই ফকীর সাধারণেব উপকারার্থে একটা কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। এই কূপের জল বড় স্নিগ্ধ ও স্বাদু ছিল,—অনেকেই ইহার জলে স্নান করিতেন, প্রত্যেক গৃহেই এই জল পেয়রূপে ব্যবহৃত হইত।

কোন কার্যোপলক্ষে রামেশ্বর একদিন পুণায় গিয়াছিল। মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড ময়ূখমালার সন্তাপে ক্লান্ত হইয়া বামেশ্বর ফকীরের কূপ হইতে জল তুলিয়া স্নান করিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্নান করিয়া তাহার দেহ স্নিগ্ধ হইল না। বরং অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরেই রামেশ্বরের শরীবে একবকম ফোটক বাহর্গত হইল, এই সকল ফোটকের যন্ত্রণায় হতভাগ্য মৃতকল্প হইয়া পড়িল। কোন ঔষধেই ব্যাধির প্রতীকার হইল না; তুকারাম লোকমুখে এ সংবাদ শুনিতে পাইলেন।

পুনা নগরী প্রান্ত সীমায়—এক জীর্ণ পর্ণকূটীরে, আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত রামেশ্বর মৃত্যুব প্রতীক্ষা করিতেছিল, তুকারাম দেবদূতের মত সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বর—সাধুব জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে সাহস করিয়া চাহিতে পারিল না, সে কাঁদিতে লাগিল। তুকারাম স্নেহে তাহাকে নিজেব ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন, তাহাষ সর্বাস্থে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোগী দোখল—সে স্পর্শ কি কোমল, কি উন্মাদন, কি অভাব্য, কি অনির্বচনীয় আনন্দপ্রদ। রামেশ্বরের অর্দ্ধেক যন্ত্রণা সেই মুহূর্ত্তে উপশম হইল। তুকারামের যত্নে অল্পদিনের মধ্যে—তাহার শরীরে ব্যাধির আর চিহ্নমাত্র রহিল না।

মহাপুরুষের উদার করুণায় মুগ্ধ হইয়া রামেশ্বর তুকারামের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। বিদেব—অনুতাপে পরিণত হইল।

( ১০ )

লোহগ্রামের একজন কাংশ্যকার তুকারামের মুখে ধর্ম্যকথা শুনিয়া সংসারে অনাসক্ত হইয়া পড়িল। সে কাজকর্ম কিছুই কবিত না, দিনরাত বিঠোবা মন্দিরে পড়িয়া থাকিত। কাংশ্যকার-পত্নী, স্বামীব এইরূপ বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া তুকারামের উপর রুষ্ট হইল। রমণী সঙ্কল্প করিল—সাধুকে একদিন জব্দ করিবে।

একদিন রমণী তুকারামকে স্বগৃহে পান ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। তুকারাম শিষ্যপত্নীর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। যথাসময়ে—সাধুজী কাংশ্যকারগৃহে উপস্থিত হইলেন।

প্রথমেই তুকারাম স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, রমণী গৃহান্তরে গিয়া থানিকটা জল গরম করিল, তা'রপর সেই উষ্ণজল—তুকারামের মাথায় ঢালিয়া দিল। জল এত গরম ছিল যে, সাধুর সর্বাস্ত্র একেবারেই পুড়িয়া গেল। জ্বালা নিবারণের জন্ত—তুকারাম বিঠোবার স্তব করিতে লাগিলেন।

এই অগ্নি পরীক্ষা কালে তুকারামের অসামান্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া,—কাংশ্যকার পত্নীর কঠিন হৃদয় গলিয়া গেল। সে সাধুব চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তুকারাম—তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সেই অবধি রমণী পতির অনুবর্তিনী হইয়া সাধুসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল।

—তুকারাম ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন।

অকৃত্রিম দেবভক্তির জন্ত পুণ্যাশ্রা তুকারামের নাম মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। আর কেহ তাহাকে শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতে

সাহস হইল না। যাহারা তুকারামের শত্রু ছিল, মস্তবলে রুদ্ধ বীৰ্য্য ভুজঙ্গের মত তাহারা সকলেই সেই অপাপবদ্ধ মহাপুরুষের পবিত্র চরণে নতশিরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই সময় মহারাষ্ট্রকেশরী ধার্মিক চুড়ামণি ছত্রপতি শিবজী সাধু তুকারামকে আমন্ত্রণ করিলেন। সাধুজীকে আনিবার জন্ত যথারীতি রথ, অশ্ব, পত্র ও রাজদূত প্রেরিত হইল। কিন্তু তুকারাম রাজ-আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না, তিনি দূতের হস্তে শিবজীকে একখানি ছন্দোময়ী লিপি প্রেরণ করিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই লিপিপাঠে বুঝা যায় তুকারাম লোভকে জয় করিয়াছিলেন।

বিশাল সংসারে আমি নিতান্ত একাকী ।  
লোকাচার হ'তে সদা দূরে দূরে থাকি ।  
যসন, ভূষণ, ধম, রত্ন সিংহাসন,  
কিছুতে আমার আর নাহি প্রয়োজন ;  
আমি বনবাসী দীন—আসক্তিবহীন—  
অগ্ন্যভাবে তনুক্ষীণ—কোটিতে কোপীন ;  
যশঃ মান, কীর্ত্তি—নাহি কোন আকিঞ্চন,  
তবে কেন ডাকিয়াছ—আমারে রাজন !  
রূপ নাই, গুণ নাই দশা অতি মন্দ,  
আমায় দেখিলে তুমি পাবে না আনন্দ ।  
তোমার নিকটে গিয়ে আমার কি লাভ ?  
ভিক্ষা ক'রে খাব, হ'লে অন্নের অভাব ।  
ছিন্ন বস্ত্র কত থাকে পথেতে পড়িয়া,  
লজ্জা নিবারণে তাহা লব কুড়াইয়া ।  
বৃক্ষতল শয়া হবে এলে বিভাবরী,  
কিসের প্রত্যাশা রাজা ! তবে আমি করি ?



রাজগৃহে শুধু মহতের অধিকার,  
 ক্ষুদ্র আমি,—কখনই বোগ্য নহি তা'র ।  
 অতি পুণ্যবান, তুমি—হে পাণ্ডুর-নাথ !  
 চেয়েছ আমার সঙ্গে কবিত্তে সাক্ষাৎ ।  
 সংসার কামনা আমি ছেড়েছি সকল,  
 আমার আরাধ্য ধন—ঠাকুব বিষ্ঠাল ।  
 গিঠোবারে হেবি আমি বিধে সব ঠাঁই ।  
 তোমাব মধ্যেও তাঁরে দেখিবাবে পাই ।

মানবেব ভাগ্য সূত্র আছে তব হাতে,  
 “শিব” এই পুণ্যনাম সার্থক তোমাতে ।  
 নিয়ত প্রসন্ন রাজা ! তোমায় শ্রীহরি !  
 তোমার নিকটে আমি এই ভিক্ষা করি,  
 রাখিতে নারিছু কথা করিও না রোষ,  
 পুত্রসম প্রজা ‘পালো’ পাইবে সন্তোষ ।  
 নরমাঝে নরাধিপ ! “নারায়ণ” তুমি,  
 পবিএ—তোমার জন্মে—মহারাত্রি ভূমি ।

তুকারামের পত্র পাঠে শিবজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, আপনিই তুকারামের আশ্রমে উপস্থিত হ'ন। তুকারামের জ্ঞানগর্ভ উপদেশে—শিবজী সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন। শিবজীর মাতা পুত্রের এইরূপ রাজ্যে অনাসক্তি দেখিয়া ব্যাকুলভাবে তুকারামকে জানাইলেন—“শিবজী আমার একমাত্র পুত্র, সে সংসারে না ফিরিলে—মহারাত্রি দেশের উদ্ধারের আশা নাই—আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার উপায় ব'কুন।”

তুকারাম জিজ্ঞা বায়ের অমুরোধ রক্ষা করিলেন। অবসর বুঝিয়া তিনি শিবজীকে বলিলেন—“বাহার যে ধর্ম, সে ধর্মপালন না করিলে

প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় । তুমি ক্ষত্রিয়—প্রজা পালন তোমার ধর্ম, সে ধর্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করা তোমার কর্তব্য নহে ।” সাধুর পবিত্র উপদেশে—রাজধর্মের প্রাত শিজীব মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল ।

স্বাধীন রাজা হইয়াও শিবজী তুকারামকে ভুলিতে পারেন নাই । এক বার পুনায় তুকারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শিবজী বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন । শিবজী যখন সাধুদর্শনে গিয়াছিলেন, চাকনচুর্গের রক্ষক একজন মুসলমান সর্দার সন্ধান পাইয়া, শিবজীকে ধরিবার জন্ত পাঠান-সৈন্ত প্রেরণ করেন । তখন তুকারাম ভজন গাথিতোছিলেন, অনন্ত লোক আগ্রহভরে তাহা শুনিতোছিল । অতলোকে মনোকে শিবজী মুসলমান সৈন্তগণ তাহা শ্রবণ করিতে পারে নাট । এই অবসরে তুকারামের ইজিতে শিবজী তথা হইতে সরিয়া পড়েন ।

মহারাত্রীবাসীগণের বিশ্বাস—তুকারামের প্রার্থনাবলে ভগবান্ বিঠোবাই সে যাত্রা শিবজীকে রক্ষা করিয়াছিলেন ।

# দয়ানন্দ সরস্বতী

( ১ )

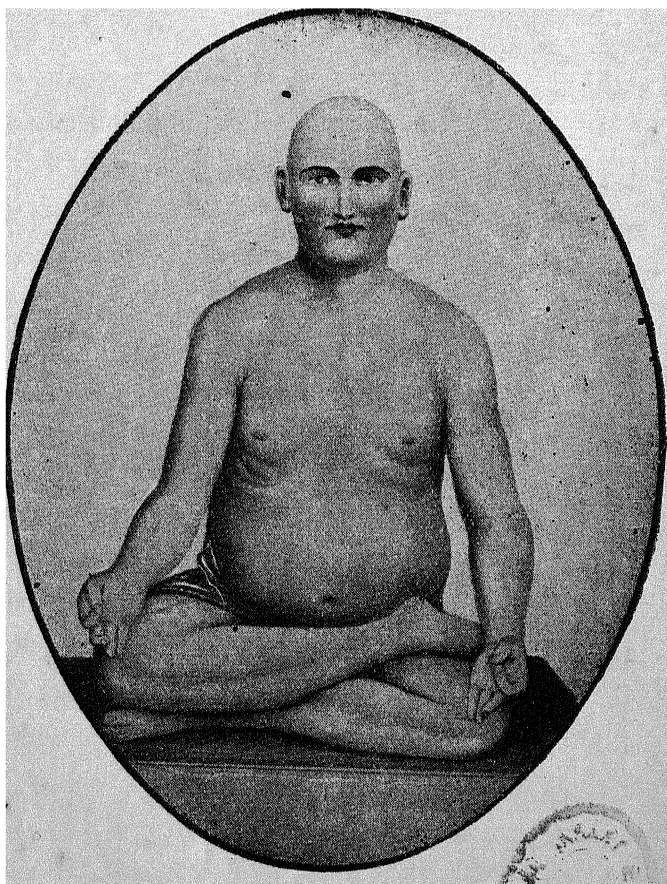
সে বড় বেগীদিনের কথা নয়। তখন প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজেব সহিত অন্তসার শূন্য মহারাষ্ট্র শক্তির সংঘর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল। বর্গীর নৃশংস অত্যাচাবে—বিশৃঙ্খল দেশে অশান্তি ও অরাজকতার আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতে তখন হায় ও নীতির শাসন শিথিল—স্বার্থপর পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্ত—জলন্ত চিঠায় জ্যোতিষ্ময় শিখায়—শত শত অবলা জীবন্ত দগ্ধ হইতেছিল, সেই পুত ভস্মরাশি অঙ্গে মাথিয়া বাত্ব বাদনে পল্লী সচকিত করিয়া,—বলদপী পিশাচগণ—আনন্দে নৃত্য করিতেছিল! ভারতেব বর্ষজ্যোতিঃ নির্বানোন্মুখ হইয়াছিল! এই অপধর্মের মলিনতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকাবে—সর্বলোক লোচনের সমক্ষে—বীবের মত দাঁড়াইয়া, কেবল একজন মহাপুরুষ—প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন—তঁাহার নাম রাম মোহন রায়।

এই সমাজ বিপ্লবের সময়—১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, গুজরাটের অন্তর্গত কাটিবারের মর্তি নগরে—উদীচ্য ভরুণ কূলে স্বামী দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

দয়ানন্দের পিতা শিবের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। পিতার ধর্মনিষ্ঠা—পুত্রের জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময়—দয়ানন্দের বর্ণজ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পিতার চেষ্টায়—এই মুকুলিত জীবনেই বেদযন্ত্র ও বেদভাষ্যের বহুস্থান—দয়ানন্দের অভ্যাস হইয়াছিল। অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি ব্রহ্মচিহ্ন





দয়ানন্দ সরস্বতী



যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন । চতুর্দশ বৎসরে—তিনি বেদবিৎ  
বিপ্র বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন ।

( ২ )

দয়ানন্দেব পিতা প্রত্যচ শিবপূজা করিতেন । একদিন শিবের নৈবে-  
দ্যেব উপব কতকগুলি মুষিক বিহাব কবিতেছিল, দয়ানন্দ ইহা দেখিতে  
পান । এই ঘটনা হইতেই তাঁহাব জীবনের শ্রোত পবিত্রীত হইল । দয়ানন্দ  
ভাবিলেন—এই ত্রিগুণধাবী শিব স্বচক্ষুে স্বীয় নৈবেদ্য মুষিক কর্তৃক  
উচ্ছিষ্ট হইতে দেখিয়াও—স্থির হইয়া রহিয়াছেন । যিনি—কৈলাস নাথ,  
সংহারময়ী শক্তি ষাঁহাব সহচরী—তাঁহার দেহে কি মুষিক তাড়াইবারও  
শক্তি নাই ! তবে তো এ দেবমূর্তি প্রাণশূন্য জড পদার্থ মাত্র ।

শিবের প্রতি দয়ানন্দের আব ভক্তি বহিল না । মূর্তি পূজার উপর  
তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মিল । কিন্তু পিতার ভয়ে—তিনি মনোভাব গোপন  
করিলেন ।

দয়ানন্দের এক ভগ্নীছিল—এই বালিকার বয়স চতুর্দশ বৎসর ।  
তাঁহার কিশোর দেহে অপূর্ণ সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস ছিল । এই রূপবতী  
বালিকা সহসা একদিন জরাক্রান্ত হইল । সেই জর ক্রমে ভীষণ মূর্তি  
ধারণ করিল । বালিকার সেই প্রদোৎ প্রভাময়ী বিজলীব মত রূপ—  
রোগের যন্ত্রণায় মসি-মলিন হইয়া উঠিল । পিতামাতা বহু চেষ্টা কবিয়াও  
—হৃদয়েব স্নেহ আকর্ষণে, বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু ধরিয়া রাখিতে  
পারিলেন না । সহসা একদিন আত্মীয় স্বজনের হাহাকারের মধ্যে  
বালিকা নীরবে প্রাণ ত্যাগ করিল ।

দয়ানন্দ ঐ কয় দিন আহাৰ নিভ্রা ত্যাগ করিয়া ভগ্নীর স্মৃতিয়া  
ছিলেন । মরণাহতা বালিকার অব্যক্ত মৃত্যু যন্ত্রণা স্বচক্ষুে দেখিয়া—  
তাঁহার শোকমথিত বেদনা প্লুত বন্ধ বিচলিত হইয়া উঠিল ! মৃত্যুর  
ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখিয়া তাঁহার মনে মুক্তি সিপাসা প্রবল হইল । মানব

জীবন এত ক্ষণস্থায়ী ? সংসার স্নেহ এত নশ্বর ?—দয়ানন্দ স্থির চিন্তে—মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন ।

সংসারে দয়ানন্দের আর আস্থা বহিল না । পিতা—পুত্রের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন ;—তিনি দয়ানন্দেব বিবাহ দিবার উত্তোগ করিলেন । দয়ানন্দ বিবাহে অসন্মতি প্রকাশ করিলেন; পিতা কোন কথা শুনিলেন না । কাজেই নিকপায় হইয়া সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়া, দয়ানন্দ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে—সকলেব অজ্ঞাত সাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ।

( ৩ )

পিতা নিরুদ্ভিষ্ট পুত্রকে, অনেক অনুসন্ধানের পর—এক সন্ন্যাসীর মাঠে ধরিয়া ফেলিলেন । দয়ানন্দ আর পলায়ন কবিতে পারিলেন না ; পিতার সঙ্গে তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে হইল । পিতাও এবার পুত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাণিলেন । প্রহরী বেষ্টিত গৃহে—দয়ানন্দকে অপরাধীর মত বন্দী থাকিতে হইল ।

কিন্তু বড় বেশী দিন তাহার বন্দীদশা থাকিল না । একদিন প্রহরী গণকে নিদ্রিত দেখিয়া—দয়ানন্দ পলায়ন করিলেন । এবার আর নিকটস্থ দেওয়ান সাহেব না গিয়া তিনি একেবারে—সুদূর ববদারাজো গমন করিলেন । সেখানে তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতের বহু প্রসিদ্ধ স্থান ভ্রমণ করিয়া, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হইলেন । হরিদ্বারের কুস্তক-মাগম হয় । দয়ানন্দ সেই সকল সর্বশ্রেণীর পুস্তকাদি বিক্রেতা দিতে লাগিলেন ।

দেশ যাইতেন, তখন সেই দেশের অধিবাসীগণ তাঁহার সৌম্যশাস্ত সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইত । তিনি সকলকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতেন—

কেবল মূর্তি পূজার নিন্দা কবিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইল। প্রচলিত “মূর্তি পূজার” বিরুদ্ধে আন্দোলন করার—অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি কেহ কেহ দয়ানন্দের প্রাণ সংহাব করিবার জন্তও সুযোগ অব্বেষণ করিতে লাগিল। যড়যন্ত্র কাবীদের আলায়—তিনি একস্থানে স্থির থাকিতে পারিতেন না।

( ৪ )

এই ভাবে ঘোব অশান্তিতে কিছু কাল অতিবাহিত হইল। দয়ানন্দ পবমানন্দ পরমহংসকে আগ্রাব বিপন্ন অবস্থায় কথা খুলিয়া বলিলেন। পরম হংস তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—“মূর্তি পূজা সম্বন্ধে তুমি কোন কথা বলিও না।” কিন্তু দয়ানন্দের সন্ন্যাসাশ্রমের দীক্ষাগুরু পূর্ণানন্দ পনম হংস—তাঁহাকে আন্দোলন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। এই সময়—বাসাশ্রমের যোগানন্দ, বাবাগসীর সাচদানন্দ, কদ্য গঙ্গাগিরি, শিবানন্দ এবং জোয়ালাহন্দ প্রভৃতি যোগীরা দয়ানন্দের পরিচয় হয়। এই সকল মহাত্মার উপদেশে—দয়ানন্দ শিষ্কা আরম্ভ করেন।

আর্য্যাবর্তের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিরজানন্দ তখন মথুরায় অবস্থিত করিতেছিলেন, দয়ানন্দ বিরজানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সেই ৮১ বৎসরের বৃদ্ধের তর্কশক্তি দেখিয়া একেবারে দম্বিত হইল এবং বিরজানন্দের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। দয়ানন্দের বয়স তখন ৩৫ বৎসর।

ইহার অল্পদিন পবে, তাহাকে কোন কার্য্য উপলক্ষে ফরক্কাবাদে যাইতে হয়। এই ফরক্কাবাদে দয়ানন্দ একটি বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময় তাঁহার যত্নে—পঞ্জাবের নানা স্থানে “আর্য্য সমাজ” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সংবাদ পত্রের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত, লাজপত রায় এবং ভারতী সম্পাদিকা সুলেখিকা শ্রীমতী সরলাদেবীর



স্বামী—শ্রীযুক্ত রামভূজদত্ত চৌধুরী মহোদয়—দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত “আর্য্য সমাজের” সভ্য হইয়াছিলেন। লাজপত মাংসাশী দলের, এবং রামভূজ নিবামিষ ভোজী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তা’রপব দয়ানন্দ কাশীতে উপস্থিত হইয়া আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করেন। পূর্বেই বলিয়াছি তিনি—মূর্ত্তি পূজাব ঘোর বিদ্বৈষী ছিলেন। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মে—তাঁহার মোটেই আস্রা ছিল না। এ হেন দয়ানন্দেব আবির্ভাবে, কাশীতে একটা হলস্থূল পড়িয়া গেল। কাশীবাসীরা দয়ানন্দের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসে ( কার্তিক, শুক্লা দ্বাদশীর দিন ) কাশীস্থ পণ্ডিতগণ মিলিয়া—এক মহা সভা আহ্বান কবিলেন। সভার উদ্দেশ্য—মূর্ত্তি পূজার সমর্থন করা। সভাপতি হইলেন—স্বয়ং কাশীর মহারাজ। এই সভায় দয়ানন্দও উপস্থিত ছিলেন। দয়ানন্দের সহিত পণ্ডিত মণ্ডলীর যথেষ্ট বাদ বিতণ্ডা হয়। কিন্তু পরিণামে—দয়ানন্দই জয়ী হইলেন। পণ্ডিতগণের অনেকেই—দয়ানন্দেব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। পণ্ডিতগণ—বিচাবনীতির অপমান করিয়া দয়ানন্দেরই অমূলক পরাজয় বার্তা সাধারণেব কাছে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

দয়ানন্দ যত দিন কাশীতে ছিলেন, তিনি প্রায়ই পণ্ডিতগণকে ভর্কক্ষেত্রে আহ্বান কবিতেন, কিন্তু কোন পণ্ডিতই তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতেন না।

( ৫ )

তঁহার পর দয়ানন্দ কলিকাতায় আসেন। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ব্রাহ্ম সভায় দয়ানন্দ—একে’র বাদ পক্ষে এবং জাতিভেদ ও বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে, দয়ানন্দ “ঈশ্বর ও ধর্ম্ম” বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে: জানুয়ারী মাসে—মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র জায়রাম প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ—দয়ানন্দকে প্রতিকূলভাবে পরিবার জন্তু—সেনেট হলে এক বিবৃতি সভায় অধিবেশন করেন। তখন দয়ানন্দ কলিকাতায় বর্তমান ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়—দয়ানন্দ হিন্দু ধর্মের পক্ষে—তাঁহার সকল সিদ্ধান্তই শাস্ত্র বিকৃত।

উভ্যক্ত হইয়া দয়ানন্দ সাহাপুর, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সেখানে, তদদেশীয় নৃপতিগণ দয়ানন্দকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যোধপুরে—দয়ানন্দ পীড়িত হন এবং বোগ বহুণায় কাতর হইয়া ১৫ই অক্টোবর প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ—দগ্ধ করা হয়।

বেদোক্ত ধর্মই শ্রেষ্ঠ—ইহাই দয়ানন্দেব ধর্মমত ছিল।

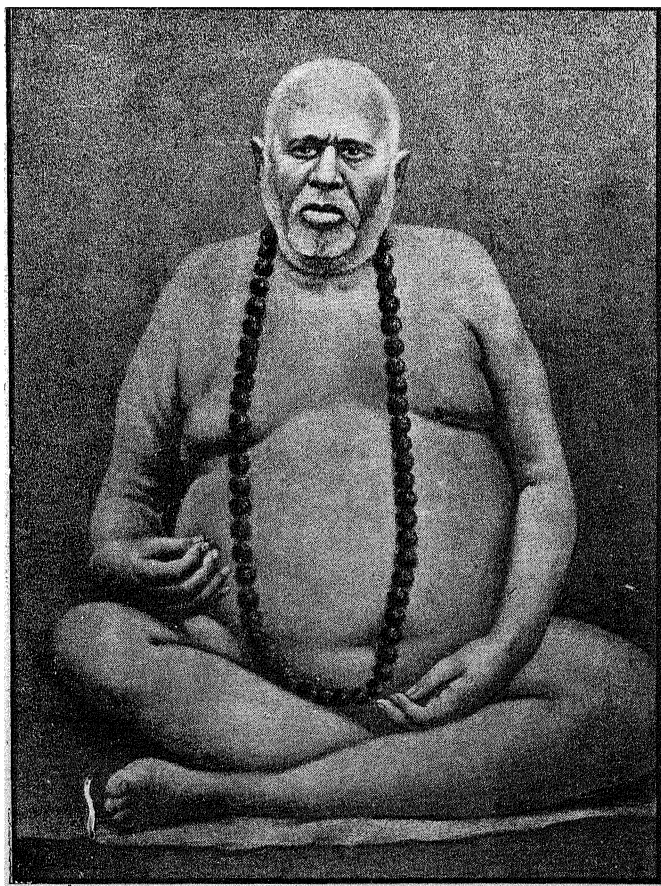
# যোগীবর ত্রৈলোক্য স্বামী

( ১ )

দাক্ষিণাত্যেব বিজানাগ্রাম জেলায়, হেলিয়া নামক নগর আছে।  
ঐ গ্রামে নৃসিং ধর শর্মা নামে এক ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।  
তাঁহার দুই পত্নী ছিল। নৃসিং দেবের বিপুল বিভবের উত্তরাধিকারী  
৩০শা, ১৫২৯ খৃষ্টাব্দেব পৌষ মাসে, তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নীর পুণ্যার্গে যে  
শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারই নাম ভাবতবিখ্যাত ত্রৈলোক্য  
স্বামী। \*

বড়মানুষের ঘরের আদর্শে ছেলে হইয়াও ত্রৈলোক্য ধরের স্মৃতিময়  
শৈশব—কেবল ধলাখেলায় পর্য্যবসিত হয় নাই। বিদ্যাচর্চায় তাঁহার  
যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, অল্প বয়সেই তিনি নানা শাস্ত্রে পাবদর্শী হইয়া  
উঠিয়াছিলেন। স্মৃতিসম্পদেব গোবর্ষে তাঁহার জীবনের প্রভাত আকাশ  
লোচিত লালসায় বঞ্জিত হয় নাই। তাঁহার জীবন মধ্যাহ্নেও আকাজ্জক  
তপনের কোটি জ্বালা চৌদিকে বিকীর্ণ করিয়া বহুময় হইয়া উঠে নাই।  
সুখেব কোলে লালিত হইয়াও, তিনি সংসারের ভোগবিলাসকে ঘৃণা  
করিতে শিখিয়াছিলেন। নৃসিং ধর অনেক চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে  
দাবপরিগ্রহে সন্মত করিতে পারেন নাই। ত্রৈলোক্য ধর কেবল ধর্মকর্ম  
লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, সত্যসাধনায়, ব্রহ্মচর্য্যপালনে এবং পবোপকা-  
রিতে যুবকের আত্মগৌরব তৃপ্ত হইত।

\* ইহার শুকদত্ত নাম—গণপতি স্বামী। কিন্তু সে নামের পরিবর্তে সকলেই  
তাঁহাকে “ত্রৈলোক্য স্বামী” নামে অভিহিত করিয়া থাকে।



যোগীবর ত্রৈলোক্য স্বামী



সর্ববন্ধনচ্ছেদী কালের আহ্বানে—নৃসিং ধর যখন ইহসংসার হইতে চির অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন ত্রৈলোক্য ধরের বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। ত্রৈলোক্য ধর তদীয় বৈমান ভ্রাতা শ্রীধরকে পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত অর্পণ করিয়া, আপনি কঠোর বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পাছে জননীর প্রাণে আঘাত লাগে এই ভয়ে সংসার পারিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

শ্রীধর নৃসিং ধরের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। তিনি তাহার ক বিষয় কন্ম পবিদর্শন করিবার জ্ঞাত অনেক অমুনয় করিলেন, তাঁহার দ্বারা এত বড় সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করা একেবারেই অসম্ভব—একথা বারংবার বুঝাইলেন, তথাপি ত্রৈলোক্যধর দৃঢ়সংকল্প হইতে বিচলিত হইলেন না।

নৃসিং ধরের মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে, তদীয় স্ত্রী লোকান্তর গামিনী হইলেন। মাতৃশোক ত্রৈলোক্যধরকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ৫২ বৎসর বয়সে তিনি মাতার জ্ঞাত বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া, শবদেহ শ্মশানে লইয়া গেল। মাতার অগ্নি-সংস্কার করিতে ত্রৈলোক্য ধরকেও সাজ যাইতে হইল। কিন্তু তিনি আর গৃহে ফিরিলেন না, মাতার ভস্মাবশেষ সর্বদা মাথিয়া, সেই শ্মশানেই বাস করিতে লাগিলেন।

( ২ )

ভ্রাতৃবৎসল শ্রীধর অনেক চেষ্টা করিয়াও অগ্রজকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না; অগত্যা সেই শ্মশানের উপরেই ভ্রাতার বাসবাগ্য একখানি গৃহ নির্মাণ করাইলেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যধর সে গৃহে পদার্পণও করিলেন না। তিনি কোপীনধারী, ফলমূলাহারী, সন্ন্যাসী সাজিয়া, এক বৃক্ষতলে বাস করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহার বিশবর্ষ কাল সেই ভীষণ শ্মশানেই অতিবাহিত হইল।

এই সময় ভগীরথ স্বামী নামে একজন যোগী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আগমন করেন। ইনি শ্রুণানে ও চৈত্য বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে ভাল বাসিতেন, লোকালয়ে যাইতে চাহিতেন না। একদিন স্নান করিবার সময়, ভগীরথের সহিত ত্রৈলজ্ঞ স্বামীর অল্প পরিচয় হয়। এই আলাপে উভয়ে উভয়কেই চিনিতে পারেন। ভগীরথ ত্রৈলজ্ঞ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করেন।

পুষ্কবে অবস্থান কালে ত্রৈলজ্ঞ স্বামী ভগীরথের নিকট যোগের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া যোগাভ্যাসে রত হন।

ভগীরথ স্বামীর অনেক বয়স হইয়াছিল। পুষ্কর তীর্থেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। গুরুর লোকান্তর গমনে ত্রৈলজ্ঞ স্বামীর আর পুষ্করতীর্থে থাকিতে ভাল লাগিল না। স্বামী-জী তীর্থভ্রমণে বাতির হইলেন।

রামেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে সূদামাপুর্বী, এই সূদামা পূর্বীর কোনও ব্রাহ্মণের বাটিতে ত্রৈলজ্ঞ স্বামী একদিন অতিথি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি সজ্ঞীক স্বামীজীর সাধ্যমত পরিচর্যা করেন। ব্রাহ্মণ দম্পতীর ভক্তিতে প্রীত হইয়া ত্রৈলজ্ঞ স্বামী তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করেন।

ব্রাহ্মণ-দম্পতী নিঃস্ব ও নিঃসন্তান ছিলেন। স্বামীজীর বরে—অচিরেই তাঁহারা গুপ্তধন প্রাপ্ত হইলেন। চিরদরিদ্রের গৃহে কমলার পদার্পণ ঘটিল। ব্রাহ্মণের পুণ্য ভবন শীঘ্রই শিশুর কলহান্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিল।

স্বামীজীর এই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, অনেক লোক তাঁহার শরণাগত হইল। কেহ ধনের আশায়, কেহ পুত্রের আশঙ্কায়, কেহ বা রোগমুক্তির আশায়, স্বামীজীর চরণে কামনা করিতে লাগিল। এইরূপ বিপুল জনতার বিরুদ্ধে হইয়া স্বামীজী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া

দেবতাত্মা হিমালয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । কিন্তু এখানেও তিনি বৈশ্বাদান থাকিতে পারিলেন না, লোকে স্বার্থসিদ্ধির কামনায় তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল ।

( ৩ )

এইবার স্বামী-জী নন্দদাত্তের মার্কণ্ডেব আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । এখানে অনেক যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় । মার্কণ্ডেব আশ্রমে— একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহার নাম “থাকী বাবা” । থাকী বাবা একদিন গভীর বাত্রে শৌচার্থে নন্দদাত্তের গমন করেন । সেই সময় এত আশ্চর্য ঘটনা তাঁহার নয়ন-সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়া উঠিল । থাকী বাবা দেখিলেন - নন্দদাত্ত সমস্ত জল ছুঁড়ে পবিত্র হইয়াছে, সেই ছুঁড় ত্রৈলোক্য স্বামী অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতেছেন । কিন্তু থাকী বাবা নিকটস্থ হইবামাত্র—নন্দদাত্ত তৎক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া জলকপ ধারণ করিল । তখন থাকী বাবা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া একথা সকলের কাছে প্রকাশ করিলেন । সুতরাং এখানেও আব স্বামীজীব থাকা হইল না । তিনি গুপ্তভাবে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন ।

কাশীধামে আসিয়া স্বামী-জী তুলসী দাসের বাগানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । এই বাগানে একজন কুষ্ঠরোগী বাস করিত, স্বামী-জী তাহাকে সমাজের পাণ্ডু স্তূপ হইতে কোলে তুলিয়া লইলেন । তাঁহার নির্বেদ নিরাপত্তা আলিঙ্গনে—পানী রোগমুক্ত হইয়া স্বামী-জীরই সেবা করিতে লাগিল ।

কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত হইতে দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া গেল । এই দৃষ্টান্তে সকলেই স্বামীজীর “ঋষি” ও “দেব” চিনিতে পারিল । স্বামীজীর ঋষি—কুষ্ঠরোগীর সহবাসে বলীমান বিসর্জনের প্রতিষ্ঠা ! তাঁহার দেব—পানঘণা, কিন্তু পানী ঘণা নহে !!



মহুর্জের মধ্যে এ সংবাদ বারানসীর চতুঃসীমায় এক জাগ্রত কৌতু-  
হলের মহাপ্রাবন উপস্থিত করিল। সাধনার বিঘ্ন হইবার আশঙ্কায়  
স্বামীজী বেদব্যাসের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে এক  
ভূবনমোহিনী মারহাট্টা যুবতী, তাঁহার স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতীকার  
আশায় ত্রৈলোক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু স্বামীজীর  
উলঙ্গ ভৈরবমূর্তি দেখিয়া যুবতী লজ্জিতা হইয়া প্রস্থান করিল। শেষে  
যুবতী স্থির করিল—স্বামীর ব্যাধিমুক্তির জন্ত সে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে  
হত্যা দিবে।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া যুবতী দেখিল—অনাদিলিঙ্গ  
মহাদেবের রত্নসিংহাসনে সেই উলঙ্গ ত্রৈলোক্য স্বামীর বিরাটমূর্তি শোভা  
পাইতেছে! এতক্ষণে যুবতী আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। অনেক  
স্তব স্তুতিতে স্বামীজীকে প্রসন্ন করিয়া, যুবতী পতির প্রাণরক্ষা করিল।

কানীবাসী সকলেরই মনে বিশ্বাস হইল—স্বামীজী বিশ্বেশ্বরেরই  
অবতার। তাহার স্বামীজীকে দেবতার মত ভক্তি করিত। স্বামীজী  
বড় একটা কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেন না। তিনি সর্বদাই ধ্যানমগ্ন  
থাকিতেন। সেই স্থানুর মত নির্মল মূর্তির পাদমূলে কত রাজ্যেশ্বরের  
রত্নভূষিত শির সম্মুখে নত হইত। স্বামীজী পৌষের দারুণ হিমালীতে  
গঙ্গার শীতল জলে অঙ্গ ডুবাইয়া থাকিতেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে  
তাঁহাকে অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। শীতাতপ সঙ্কু  
স্বামীজী কখনও কাহারও কাছে আহাৰ্য্য চাহিতেন না, যাত্রিগণ স্বত-  
প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার মুখে খাদ্য তুলিয়া দিত। আহারকালে  
স্বামীজীব মনে জাতিবিচার সম্বন্ধীর শাস্ত্রের অনুশাসন স্থান পাইত না।  
হাতে তুলিয়া যে বাহ্য দিত, স্বামীজী তাহাই ভক্ষণ করিতেন।

স্বামীজীকে জঙ্গ করিবার জন্ত একদা এক দুর্ভৃত্ত খানিকটা চূণ  
তাঁহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, স্বামীজী অগ্নানবদনে তাহা খাইয়া

ফেলিয়া, তাহারি সম্মুখে বিষ্ঠাভাগ করেন। সেই বিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত চূণ বাহির হইয়াছিল। এই অলৌকিক ঘটনায় লোকটা ভীত হইয়া স্বামীজীর চরণ ধারণ পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে। রিপুজয়ী স্বামীজী দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া তাহাকে অভয় দান করেন।

( ৪ )

ত্রৈলোক্য স্বামীব সবলতা ঠিক শিশুব মত ছিল। তিনি বস্ত্র পরিধান কবিতেন না, সৰ্বদাই উলঙ্গ থাকিতেন। কাশীর ম্যাজিষ্ট্রে সাহেব—  
স্বামীজীব উলঙ্গমূর্তিকে স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতার হানিকারক ভাবিয়া স্বামীজীকে বস্ত্র পরিধান করিবার আদেশ দেন এবং বস্ত্র পরিধান না করিলে তিনি স্বামীজীকে নিজের খানা খাওয়াইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখান। স্বামীজী সাহেবকে বলেন—“তুমি আমাব খানা খাইতে পার ? তাহা হইলে আমিও তোমার খানা খাইব।” সাহেব তখন স্বামীজীর খানা কি রকম, তাহা জানিতে চাহিলেন। স্বামীজী সাহেবের সন্মুখে তৎক্ষণাৎ মলভাগ করিলেন এবং সাহেবের কোতূহল উদ্ভুক্ত করিয়া সেই বিষ্ঠা প্রফুল্ল বদনে খাইয়া ফেলিলেন।

স্বামীজীর নিকট চন্দন ও বিষ্ঠার পার্থক্য ছিল না। এই অমানুষিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, সাহেব আর স্বামীজীকে বস্ত্র পরিধান করিবার অনুমতি দিতে সাহস করিলেন না।

একদিন এক রাজা গঙ্গারান উপলক্ষে কাশীধামে সঙ্গীক উপস্থিত হ'ন। অসুখ্যাম্প্রা রাজকুলবধূর সঙ্গম রক্ষার জন্ত, রাজার বাসভবন হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পথের দুই ধার পর্দা ফেলিয়া স্নসংস্কৃত করা হয়। মহিষী ও রাজা নান করিয়া সিক্ত বেশে পথে আসিতে আসিতে ঈর্ষিতে পান—যবনিকার ভিতরে মহিষীর সম্মুখে উলঙ্গ বেশে ত্রৈলোক্য স্বামী দণ্ডায়মান ! উলঙ্গমূর্তি দেখিয়া মহিষী লজ্জায় অধোমুখী

হঠাৎলেন, একটা পুরুষ বাজ-অস্থঃপূর্বব মর্যাদা নষ্ট করিল দেখিয়া বাজা স্বামীজীর উপর অশাস্ত ক্রুদ্ধ হ'ল। বাজা স্বামীজীকে যথেষ্ট ভৎসনা দিয়া স্বামীজী এইকণ বাবুজীবের প্রতিবাদ করিলেন—স্বামীজী কোন কথা কহিলেন না। ইশতে রাজা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। লোকে রাজদমক্ষে স্বামীজীস পেশ বিভূতির বিষয় নিবেদন করিল। বাজা কণ্ঠস্বর কণা শুনিলেন না তিনি স্বামীজীকে বেয়াঘাত কবিনার জন্ত দইজন আশ্রয়ক আদেশ করিলে। সর্বলোক লোচনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া ভাঙ্গমুখে স্বামীজী সেই নিম্নকণ পেশদত্ত সহ্য কবিলেন! সাধুব এই অপমানে অনেকেই তুঃখিত হইল।

সেইদিন বাহেই এক ভয়ঙ্কর ষণ্ম দেশিরা রাজা চীৎকার কবিয়া উঠিলেন। যেন স্বয়ং কাশীস্থ পশুদ্র ব্রহ্মলহস্তে—বাজাকে সেই দণ্ডেই কাশী পশুদ্রাগ করিয়া চলিয়া যাঠিতে বলিতেছেন! পাবিসদবর্গ রাজাব মুখে ষণ্মবৃত্তান্ত শুনিয়া চমকিত, বিবস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাঙ্গে পায়মর্শে অশ্রুপূর্ণ বাজা স্বামীজীব পাঁখে ধবিয়া ক্ষমা চাহিলেন। স্বামীজী বাজাকে ক্ষমা কবিলেন। কিন্তু কাশীতে থাকিতে রাজাব আব সাহস হইল না। পরদিন প্রভাতে রাজা কাশী পরিত্যাগ কবিলেন।

( ৫ )

স্বামীজীর যোগবল সম্বন্ধীয় অনেক জনশ্রুতি লোকসমাজে প্রচলিত আছে। সে সকল কথা স্বল্পবসবে বলিবাব নহে। যোগবলে তিনি অদৃশ্য হইতে পারিতেন।

একদা এক উচ্চপদস্থ ইংবাজ কোন নিকটবর্তী স্থান হইতে নৌকা-যোগে কাশীতে আসিতেছিলেন। সাহেবের সঙ্গে একটু বাঙ্গালী কর্মচারীও ছিল। নৌকাখানি মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

এই সময় ব্রৈলিঙ্গস্বামী গঙ্গার জলের উপর ভাসিতছিলেন। ইংরাজের বিধাত্মকিত দৃষ্টি স্বামীর উপর পতিত হইল। বাঙ্গালী বাবুটি স্বামীর যোগবৃত্ত ও অলৌকিক শাস্ত্র পবিচয় দিয়া, সাহেবকে স্বামীর মাহাত্ম্য বুঝাবার চেষ্টা করিলেন। সাহেবের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফটিয়া উঠিল। তিনি স্বামীদ্বীকে নৌকায় উঠিতে অনুরোধ করিলেন। বাঙ্গালী বাবুটিও অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। তখন স্বামীজী নিবাপত্তিতে নৌকায় উঠিয়া সাহেব ও বাঙ্গালী মধ্যস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া পড়লেন।

নৌকায় উঠিয়া স্বামীজী দেখিলেন—সাহেবের পার্শ্বে একখানি তববাবি রহিয়াছে। স্বামীজী তববাবি খানি উঠাইয়া লইয়া তাহার দাব পদাঙ্গা বসিলেন। তাহার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু ভাব প্রকাশ করিয়াই সহসা তববাবিখানি গঙ্গার অগাধ জলে নিক্ষেপ করিলেন। স্বামীজীর এই ব্যবহারে সাহেবের ক্রোধেব চিহ্ন প্রকাশ পাইল। বাঙ্গালী বাবুটি সাহেবকে বলিলেন—“আপনি যোগীব প্রতি ক্রোধ করিবেন না, যাটে উঠিয়া আমি দাব দিয়া আপনার তববাবি তুলিয়া দিব।” সাহেব কিন্তু স্বামীদ্বীকে শাস্তি দিবাব জন্ত মনে মনেসঙ্কল্প আঁটিতেছিলেন।

স্বামীজী সাহেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ঐ প্রাণঘাতী অস্ত্রখানা কি সাহেবের বড়ই আবশ্যকীয়?” বাঙ্গালী সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। তখন স্বামীজী গঙ্গার জলে হস্ত প্রসারণ করিয়া তিন খানি তববাবি উত্তোলন করিয়া, সাহেবকে নিজের তববারি বাছিয়া লইতে বলিলেন। সাহেব তো অবাক,—তিন খানি তববারিই দেখিতে একবকস, সাহেব নিজের তববারি চিনিতে পারিলেন না। তখন স্বামীজী হস্তমুখে একখানি তববারি সাহেবের হাতে দিয়া অপব দুইখানি জলে ফেলিয়া দিলেন। এইবার সাহেবের চমক ভাঙ্গিল,

তিনি স্বামীজীর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া, নিজের ব্যবহারের জন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া স্বামীজীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী প্রসন্ন-মুখে সাহেবকে আশীর্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গায় অবতরণ করিয়া, সর্বলোক লোচনেব সমক্ষেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

একজন ব্রাহ্মণের অন্নবরস্ক একটি পুরেব পঞ্জবাস্থি ভাঙ্গিয়া যায়, বহু চিকিৎসাতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নাহ। ব্রাহ্মণ স্বামীজীব শবণাগত হইলে,—স্বামীজী তাহাব পুত্রকে একটু মৃত্তিকা খাইতে দেন। ইহাতে সেই দিনেই বালক প্রকৃতিস্থ হয়।

( ৬ )

স্বামীজীব মুখে ধর্মোপদেশ শুনিবাব জন্ত, প্রত্যহ সন্ধ্যায় অনেক লোক স্বামীজীর আশ্রমে উপস্থিত হইত।

একদিন এক শোকাক্ত ভদ্রলোক মনেব অশান্তি দূব কবিবাব জনা স্বামীজীব সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে দিন বড় বর্ষা। বাত্রি ৯টা ১০টাব সময় সকলে বাটী যাইবাব জন্ত প্রস্তুত হইলে, ভদ্রলোকটীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে ইঙ্গিতে যাইতে নিষেধ করিলেন। তখন মূলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল।

বৃষ্টি থামিলে, ভদ্রলোকটী আবার প্রস্থানোত্তোগ কবিলেন। সেবাবেও স্বামীজী নিষেধ করিলেন। অবশেষে ভদ্রলোকটীকে ছুটী এলাচ খাইতে দিয়া, তাঁহাকে আশ্রমেব পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাহির হইতে বলিলেন।

বাহিরে রজনী ঘোরান্ধকারময়ী। সম্মুখের পথঘাট পর্যন্ত জমাট-অন্ধকারে লিপ্ত। মুহুমূহঃ গন্তীর মেঘগর্জনে দিগ্বাণল কম্পিত হইতে-ছিল। গগনের একপ্রান্ত হইতে অগ্র প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিস্ফারিত হইয়া আঁধারের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছিল।

ভদ্রলোকটী যে মুহূর্ত্তে পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাহির হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সম্মুখদ্বারের অনতিদূরে একটা গাছে উপযু্যপরি ছুই বাব বজ্রঘাত হইল।

ভদ্রলোকটি তখন স্বামীজীর নিষেধে কাণে বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভদ্রলোক দেখিলেন—আঁধারের ভীম আলিঙ্গনে আবদ্ধ পথিক, যিনি শূন্য কবলিত করিয়া বহিয়াছে! মাঝে মাঝে কেবল দামিনীর চকচক বিশসন! ভদ্রলোক দ্রুতপদসঞ্চাবে অগ্রসর হইলেন। সহসা তাহার অগ্রভাগে তিনি এক উজ্জল আলোক দেখিতে পাইলেন। সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন—সুদূরে অস্পষ্ট ভীতব ছায়া। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু এক ফোটা জলও ভদ্রলোকটির গাত্রে পড়িতেছিল না।

ভদ্রলোক বাটী পৌঁছিয়াই দেখিলেন—তাহার গায়ে বা গাত্রবস্ত্র কিছুই ভিজে নাই—কেবল পদদুটি সিক্ত হইয়াছে মাত্র। তখন তিনি বুঝিলেন—স্বামীজীর উদার ককণায় সে যাত্রা তিনি বক্ষা পাইলেন।

\* \* \* \*

স্বামীজী জীবনুকৃত মহাপুরুষ ছিলেন। সুখ দুঃখের অতীত হইয়া তিনি পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের পৌষমাসে শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে, সায়ংকালে স্বামীজী কাশী ধামে যোগাসনে আসীন থাকিয়া নশ্বর দেহত্যাগ করেন। সে সময় তাহার বয়ঃক্রম ২৮০ বৎসর হইয়াছিল।

## যোগীবর ভাস্করানন্দ স্বামী

( ১ )

ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাণপুৰেব অন্তৰ্গত মৈথেলাল পুর গ্রামে মিশ্রিলাল নামে এক সন্তানিষ্ঠ ধন্যপনায়ক ব্রাহ্মণ বাস কৰিতেন। ব্রাহ্মণেৰ অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল ছিল না। সংসাবে তিনি নিজেব অনুকণা প্রেমময়ী সহধৰ্ম্মিনী পাহৰাছিলেন।

ব্রাহ্মণেব সংসাবে আর কোনও অভাব ছিল না, এক অভাব ছিল—  
তঁাহাব পুত্র হয় নাই। কিন্তু সেজন্ত দ্বিজদম্পতীৰ প্রফুল্ল মুখে—এক দিনেব ভক্তও চিন্তাব রেখাপাত হয় নাই। শাস্ত্রালাপে, ধৰ্ম্ম সাধনায় অতিথি অভ্যাগতেব অভৰ্ণনা কৰিয়া, তঁাহাদেব জীবনেব অবসব পৰ্য্যন্ত স্নেহে অতিবাহিত হইত।

এই পুণ্য প্রথিত গৃহস্থেব হৃদয়েব যে অংশটা নিতান্ত গাণিছিল, বিধাতার বৰণ আশীৰ্ব্বাদে আঁচবেই সে শূন্যস্থান টুকু পূৰ্ণ হইবাব উপক্রম হইল। যোগনেব শেষ সীমায় ব্রাহ্মণী গৰ্ভবতী হইলেন। ব্রাহ্মণেব আব আনন্দেব সীমা বৰ্ণন না। জোগনেব সম্মুখে আশাব উজ্জল বাজ্য স্থাপন কৰিয়া—ব্রাহ্মণ ভাবী বংশধৰেব প্রতীক্ষা কৰিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে ব্রাহ্মণীৰ প্ৰসবকাল উপস্থিত হইল। এমন সময় বোণা হইতে তিন জন সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেব বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতিথি সৎকাৰেব ক্রটি কৰিলেন না। এই অজ্ঞাতপুৰ সন্ন্যাসীজয় ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“আজ মধ্য বাত্রে তোমার এক পুত্র জন্মিষ্ট হইবে।” সে দিন শুক্লাপক্ষমী তিথি।

তখন আশ্বিন মাস,—শরদাগমনেব শুভ মুহূর্ত্তে—ভাবতেব বিশাল বক্ষে মহামহোৎসবেব বাজ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, সিংহবাহিনীৰ সস্তাপ হাবিণী মূৰ্ত্তি দেখিয়া জন্ম সফল কবিবাব জজ্ঞ—কোটি কোটি নবনারী মাগবা মা, পুত্র বিবটি আয়োজন কবিয়াছে !

( ২ )

বঙ্গাব্দ ১০২০ সালের শুভ আশ্বিন মাসে, মিশ্রল'লেব পুণ্য ভবনে দেবতাব আশীর্বাদ বর্ধিত হইল ।

সেই দিব্য জ্যোৎস্নান্নাত নক্ষত্র কবিীটনী যামিনোতে, ঠিক দুই প্রহবেব সমব—ব্রাহ্মণী এক পুত্র প্রসব কবিলেন ! জগদত্তীত আনন্দ প্রবাহেব লহবা তুলিয়া শুভশঙ্খ বাজিয়া উঠিল । চুনখন আলোক পূর্ণ কবিয়া ব্রাহ্মণী আপনাব সমস্ত সৌন্দর্য্য উৎসঙ্গে ধবিয়া দেব সৌন্দর্য্যে দেবী প্রতিমাব মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন ।

হৃদয়েব সমস্ত অবসাদ—সমস্ত শৈথিল্য নিমেঘে দূরে ফেলিয়া, মিশ্রলাল—হৃতিকাগৃহে প্রবেশ কবিলেন, তাঁহাব সঙ্গে সেই তিন জন সন্ন্যাসী । সন্ন্যাসীবা—সত্তজাত শিশুব মঙ্গলাদেশে—হৃতিকাগৃহে হোমেব অনুষ্ঠান কবিলেন । হোমেব তিলক শিশুব ললাটে শোভিত হইল । তৃষ্ণাতুব মিশ্রলাল—ভূজবল্লী সাগ্রহে প্রসাবিত কবিয়া নব কুমাবেব মুখে—এক অপার্থিব প্রের্মাচক্ল মুদ্রিত কবিয়া দিলেন । তিনি যখন বাহিবে আসিলেন—তখন সন্ন্যাসীত্রয় চলিয়া গিয়াছেন । তাঁহাবা যে কোন্ পথে অদৃশ্য হইয়াছে—কেহ তাহা বলিতে পারিল না ।

বালকের জা•কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন হইল । শুভদিনে মিশ্রলাল—পুত্রের নাম বার্থিলেন—“মতিরাম” ।

অষ্টম বর্ষী শিশুব উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইলে, মিশ্রলাল বালকে গুরুগৃহে প্রেবণ কবিলেন । সেখানে—“সাবস্বত চণ্ডিকা” “ব্যাকরণ ও “বসুবংশ” মহাকাব্য পাঠ কবিয়া বালক বেদান্ত পড়িতে লাগিল । বেদান্ত



পাঠে বালকেব চ'খেব সম্মুখে—বিশ্বেব অগাব অনন্ত বহুশ্রাজি—ফুটিয়া উঠিল। বালক, অনন্তেব মধ্যে আপনাব ক্ষুদ্রত্ব অনুভব কৰিয়া, বুঝিতে পাবিল—অবিদ্যাব দুৰ্ভেদ্য কুয়াসায় সংসাবেব সমস্ত জিনিষ মলিন, নশ্বৰ, অস্পষ্ট। অতএব মনুষ্যজীবনেব কৰ্ত্তব্য—সত্যোৱ সাধনা, বৈবাগ্যোব আশ্রয়।

মিশ্ৰিলাল পুত্ৰেব ভাবগতিক দোখয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণী বংশেব ধনকে আপনাব কৰিবাব জন্তু—পুত্ৰবধূব অনুসন্ধান কৰিতে লাগিলেন। অপৰিণত বয়সে—মতিবামেৰ বিবাহ হইয়া গেল। পিতা মাতা আশায় বুক বাঁধিলেন।

বিবাহেব পৰ মতিবাম বিত্তা অধ্যয়নেব জন্তু কাশী যাত্ৰা কৰিলেন।

অপৰিণিত জ্ঞান সম্পদ সঞ্চয় কৰিয়া “মতিবাম” যখন দেশে ফিৰিলেন—তখন তাঁতীৰ বয়স ১৭ বৎসৰ। ১৭ বৎসৰেব বালক—এক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত।

( ৩ )

এইবাব মিশ্ৰিলাল পুত্ৰ বধূকে গৃহে আনিলেন। মতিবামেব পত্নী অসামান্য সুন্দৰী ছিল। উৎফুল্ল যৌবন—তাহাব স্নকুমাৰ অঙ্গে অৰুণেব আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যুবতী স্বপ্নেব গৃহে প্ৰবেশ কৰিয়া আপনাৰ মধ্যে আপনি কতই সুখ স্বপ্ন বচনা কৰিল, কিন্তু তাহাব দুৰ্ভাগ্য—স্বামী তাহাব আপনাৰ হইল না। দে দেখিল—কি এক মহাবহু স্বামীৰ অন্তবে প্ৰবেশ কৰিয়াছে—বিবাম নাই—বিশ্ৰাম নাই—অপ্লথ গতিতে অনন্ত দৃষ্ট লইয়া তিনি অভীষ্ট সত্যেব অন্তসৰণ কৰিতেছেন। তাহাৰ দিকে ফিৰিয়া চাহিবাব স্বামীৰ আৱ অবসৰ নাই। হায়। প্ৰথম সৌৰভে—যুৱতীৰ জীবন কেবল দুঃখ ব্যগ্ৰণায় ইতিহাস হইল।

মতিবামও বুঝিলেন—পত্নীকে তিনি স্মৃতি কবিত্তে পাবিবেন না ।  
সংসারের ভোগ আকাজক্ষায় তিনি তো মুগ্ধ নহেন—এ নাবী, এ যুবতী  
সংসারী বলাসসাধন, এতো আত্মাব সঙ্গিনী নহে ।

এইকপে প্রণয়হান পবিগবেব জয়পবাম্ব লইয়া, স্বামী জীর দ্বন্দ্বচঞ্চল  
প্রাণের উপব দিয়া বসন্ত চলিয়া গেল । যুবতীর গর্ভলক্ষ্যারের লক্ষণ  
প্রকাশ পাইল । বন্ধনেব উপব বন্ধনেব আয়াজন দেখিয়া মতিবাম  
ক্ষুব্ধ হইলেন । যুবতী ভাবিল—এই গর্ভস্থ ১৫শুট একদিন স্বামীজীর  
মধ্যে শান্তি সংস্থাপন কবিবে । আশাব আগ্রহে বমণীব হৃদয় উজ্জ্বলিত  
হইয়া উঠিল । আচরভাবী পৌত্রমুখদর্শনের লোভে মিশ্রিলাল ও তাঁহাব  
পত্নী উৎকণ্ঠিত হইয়া বহিলেন ।

শিশুব স্বাশুভীব আনন্দোচ্ছ্বাসেব মধ্যে যুবতী এক কমল কোবকোপম  
শিশু প্রসব কবিল । মিশ্রিলালেব পুণ্যভবন আলোকমালায় সুসজ্জিত  
হইল । কিন্তু সেই বাত্রে প্রসূতবতী প্রণয়নী ও সন্তজাত শিশু সন্তানকে  
পবিত্যাগ কবিয়া, মতিবাম নিকদ্দেশ হইলেন । মিশ্রিলালের উৎসব-  
ভবন—শোকের হাহাকারে পূর্ণ হইল ।

( ৪ )

পিতা মাতা, পত্নী আধ্যাত্মিক জীবনের পবিপাহু জ্ঞানে পবিত্যাগ  
করিয়া মতিবাম বিবৃদ্ধজননী উজ্জ্বলনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন ।

উজ্জ্বলনী কবি কালিদাসেব লীলাভূমি—বাজা বিক্রমাদিত্যের সাধের  
রাজধানী ! এখানে একদিন অভিসাবিকা অমুবাগে মেঘমল্লে অবহেলা  
কবিয়া, ঘনাককাবা রজনীতে বিদ্যুৎপ্রভায় পথ খুঁজিয়া প্রিয় সমাগমে  
চলিত, সুরভি পবন কুসুমিত উপবন কাঁপাইয়া শীকর সম্পর্কে শীতল  
হইয়া রহিত ! কুলবধু—বকুলের মালা গলায় পরিয়া ককুভমঞ্জরীতে  
কর্ণভরণ রচিয়া স্বামীব মনোহরণ করিত ! মেঘগন্তীর মৃদঙ্গধ্বনি

মুখর অভভেদী প্রাসাদমালায়—নাগর নাগরী বিহাষ কবিতা! সর্বোববে—  
নিত্য শতদলে শব্দদল ফুটিত, শাশকবে চন্দ্রকান্তমণি বিবিধা বিবচ্যে  
অনঙ্গ জ্বালা নিবারণ কবিত। কনককদলী তেষ্টিত এ'ডাটেশনে—একবক  
মণ্ডিত মাধবামণ্ডে।—মণিখচিত্র ফটিক ফ-কবাক্ষনেব বাসগৃহিতে  
বসিয়া ময়ূখা শিখিণীব তালে নৃত্য কবিত।

এখন উজ্জয়িনীৰ আৰ সে শোভা নাই, কৃতী মানুষ শোভাব উপব  
শোভা চাপাইয়া, কচি বাসনা কল্পনা অনুসাবে বাহ্যকে সমৃদ্ধিময়ী  
কবিয়া তুলিয়া ছিল, সে উজ্জয়িনীৰ এখন ভগ্নাবশেষে প'ৰ্ণিত। একস্থ  
সে শান্তময়, বিষাদময় ভগ্নাবশেষ এখনও কাবব পূণ্য স্থাভতে বিজাডত।  
মতিবাম উজ্জয়িনীতে বাস কৰিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীৰ মধ্যভাগে একটা স্নবৃহৎ মন্দির আছে, মন্দিৰাধিষ্ঠিত  
বিগ্রহেব নাম—“কালেশ্বর”। মতিবাম দিবাভাগে এহ মন্দিরেই  
থাকিতেন, শিবেব অৰ্চনা কবিতেন, রাত্রে—নগবেব সোমাস্তে অবাস্থত  
কোনও শাশানে ধ্যানমগ্ন হইয়া আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কবিতেন।

এই সময় দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ যোগী—পবমহংস পূৰ্ণানন্দ সবস্তু  
উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হ'ন। একদিন স্বামীজীৰ সঙ্গে মতিবামেব পৰিচয়  
হয়। স্বামীজী মতিবামের মনোভাব বুঝিতে পাবিয়া তাঁহাকে যোগ-  
বিজ্ঞান দীক্ষিত করেন।

মতিবাম অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত যোগ শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ কবেন।  
শিষ্যকে যোগবিভূতিতে অলঙ্কৃত দেখিয়া, স্বামীজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'ন  
এবং শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া গুজবাটে গমন কবেন।

গুজরাটেব মঠে থাকিয়া মতিবাম বেদশাস্ত্র শিক্ষা কবেন।

( ৫ )

কিছুদিন গুজবাটে বাস কবিয়া মতিবাম সন্ন্যাসধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।  
তা'র পব গুরুৰ উপদেশে—নিজেব নাম, জাতি, যজ্ঞসূত্র—সমস্তই

পরিভ্যাগ করিলেন। রেবানদী তীরস্থ কোন শ্মশানে তাঁহার আশ্রম স্থাপিত হইল। এই সময় তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর মাত্র।

পুত্র গুজরাটে বাস করিতেছেন—লোকমুখে মিশ্রিলাল এ সংবাদ পাইলেন। একদিন তিনি গুজরাটে উপস্থিত হইলেন। মতিরাম পিতার মুখে শুনিলেন—তাঁহার একাদশ বর্ষীয় পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না। বরং পিতাকে বুঝাইলেন—“মরণ প্রকৃতি শরীরগাং”—শোক সংসারীজীবের পরীক্ষা মাত্র। জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ মিশ্রিলাল পুত্রের সিদ্ধমূর্তি ব অনায়াস গাভীর্ষ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পিতার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, সে যাত্রা মতিরামকে গৃহে ফিরিতে হইল।

মতিরাম আজ একাদশ বৎসর গৃহত্যাগী, একাদশ বৎসর পরে আজ তিনি পিতার সঙ্গে মৈথৈলাল পুরে প্রবেশ করিতেছেন—মতিরামকে দেখিবার জন্ত পথে লোকে লোকারণ্য হইল। সকলের সঙ্গে হস্তমুখে সম্ভাষণ করিতে করিতে মতিরাম বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

মতিরামের মাতা তখন—রোগ শয্যায় শায়িতা। মতিরাম একাদশ বর্ষ পরে সেই চিরপরিচিত গৃহে উপস্থিত হইলেন। গৃহ নিস্তন্ধ—ঝড় উঠিবার পূর্বে গুমটের মত যেন কোন দারুণ দুর্ঘটনাব পূর্বে লক্ষণ স্তব্ধতার গৃহ সমাচ্ছন্ন! মতিরাম রোগিণীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া স্থির চক্ষুে মাতার রোগপাণ্ডুর মুখ দেখিতে লাগিলেন। তাঁর পর প্রাণের আবেগে ডাকিলেন—“মা”। সে স্বরে কোমলতা ছিল,—অশ্রু উচ্ছ্বাস ছিল না। বুঝি সে স্বর মুমূর্ষুর স্নেহময় হৃদয়ের রুদ্ধপ্রায় স্পন্দন তন্ত্রীতে ধীরে ধীরে আঘাত করিল! বৃদ্ধার বিলুপ্ত প্রায় মানসী শক্তি একবার সচেতন হইয়া উঠিল—মাতা পুত্রকে দেখিলেন। তাঁহার নয়নধ্বজ—একটু উজ্জল হইয়া উঠিল—কিন্তু মুখে আর কথা ফুটিল না! পুত্রের সম্মুখে—নীশকে বৃদ্ধার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

দীর্ঘপ্রবাসেব পব—প্রত্যাখ্যানকারী পতির সন্দর্শন লাভ করিয়া মতিবামের পত্নী অশ্রু সম্বরণ করিতে পাবিলেন না । বর্ষাজল তাড়িত তট ভূমির মত—মিলনাশা অন্তর্হিত হইয়াছে—রমণীর সেই গভীর উজ্জল হৃদয় ব্যাপী প্রেম—স্বামীব চরণে লীন হইয়া তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠাকে প্রবল করিয়া তুলিল । বিরহ বিষাদ বিকল লুকাইয়া—রমণী যৌবনে যোগিনী সাজিলেন ।

মতিরাম সংসারবেব মোহে আর জড়ীভূত হইলেন না, বৃদ্ধ পিতাকে ও শোকাতুরা সহধর্মিনীকে সমরোচিত মাস্তনা কবিতা আবার তিনি গৃহ পাবত্যাগ করিলেন ।

( ৬ )

ত্রয়োদশ বৎসব ধরিয়া পদবজ্রে ভাবতের নানা তীর্থ ভ্রমণ কবিতা মতিবাম বিখ্যাত যোগী অনন্ত বাগেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিবাব জন্ম হরিদ্বাবে উপস্থিত হইলেন । এখানে—সাধন তত্ত্বেব নিগূঢ় উপদেশ গ্রহণ কবিতা শেষে কাশীধামে সংস্থান করিলেন । তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ।

পবিত্র কাশীধামে—ত্রিপথ গামিনী জাহ্নবী তীরে ভক্তগণ মতিরামেব বাসস্থান নির্দিষ্ট কবিতা দিল । মতিরাম বিশ্বনাথের আবাধনা করিতা হৃষ্ট চিত্তে কালযাপন কবিতা লাগিলেন । এ সময় তাঁহার মুখে—কেবল “বিশ্বনাথের” নাম—মুতমূল্য ধ্বনিত হইত, প্রেমেব আবেগে তিনি কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন । প্রেমোন্মত্ত মতিবামেব ভাবুকতা দেখিতা অনেকেই তাঁহাকে দেবতার মত সম্মান করিতে লাগিল । তাঁহাকে দেখিবার জন্ম—তাঁহার আশ্রমে নানা দেশের লোক সমাগত হইতে লাগিল । জনতা বহুল আশ্রমে থাকিতে না পারিতা মতিরাম—অমোধ্যা প্রদেশে প্রস্থান করিলেন । কিন্তু সেখানেও জনতা বৃদ্ধি দেখিতা বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না । তিনি আবার কাশীতে ফিরিতা আসিলেন ।

কাশীতে, অযোধ্যা প্রদেশেব অন্তর্গত আমেটীব শাসনকর্তা বাজা লালমাধব সিংহেব একটা মনোহর উদ্যান ছিল । ঐ উদ্যানটিকে লোকে “আনন্দবাস” বলিত । উদ্যানটা নিম্নস্থানে অবস্থিত দেখিয়া মতিবাম এ উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন । বাজা সাধুকে সমাদবেব সন্তিত আহ্বান কবিলেন । সাধুব সেগাব জন্ত ৮ জন ভৃত্য নিযুক্ত হইল । আনন্দবাগে মাতবাম সদানন্দে বাস কবিতে লাগিলেন । এই সময় গুপ্তদত্ত নামে তিন পণ্ডিত হইলেন । লোকে তাঁহাকে “ভাস্করানন্দ স্বামী” বলিয়া অভিহিত কবিল ।

( ৭ )

এইবাব স্বামীজীর মহাপরীক্ষা আবম্ভ হইল । দুই লোকেব পোবো-চনায় কতকগুলি বেগু স্বামীজীকে বিখণ্ডগামী কবিবাব চেষ্টা কবিল । কিন্তু পাপীয়সীদের আশা ফলবতী হইল না । তাহাবা যখন অভিসাবে আসিত, তখন দেখিত ভাস্করানন্দেব জ্যোতির্ময় মূর্তি শত পভাকবেব প্রদীপ্ত পদ্মায় উজ্জ্বল, আব সেই অপূর্ব মূর্তিকে বেষ্টন কবিয়া ভীষণ কালসর্প গর্জন করিতেছ । তখন বেগুদেব জ্ঞানচক্ষু উন্মলিত হইত, তাহাবা অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বামীজীকে পণাম কবিয়া অধোমুখে চলিয়া যাইত । এই সকল উপায়ে বিবক্ক হইয়া বাজা লালমাধব “আনন্দবাগে” সাধাবণেব প্রবেশ নিবেধ কবিয়া দিয়াছিলেন ।

“আনন্দবাগে” ভূগর্ভমধ্যস্থিত একটা ক্ষুদ্রগৃহে স্বামীজী বাস কবিতেন । এই গৃহে তিনি ক্রমাগত ২৩ মাস কাল অনাহাবে, এমনকি জলটুকু পর্য্যন্ত পান না কবিয়া সমাধিমগ্ন থাকিতেন । এই সময় তিনি কৌণীন পর্য্যন্ত পবিত্যাগ কবিয়াছিলেন । সংসার ও সমাজেব কাছে তাঁগাব চাহিবাব কিছুই ছিল না ।

সমাধিগৃহ হইতে স্বামীজী যখন বাহিব হইতেন তখন অনেকেই তাঁহাব দর্শনপ্রার্থী হইয়া আনন্দবাগে উপস্থিত হইতেন । ভাবতের বহু

নৃপতি—রেওয়া, নাটোর, ভিঙ্গা, দুখরাওন, বেড়িয়া দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি রাজগণ, এমনকি হাইদ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর, মুর্শিদাবাদ ও রামপুরের নবাব প্রভৃতি মুসলমান নরপতিগণ সকলেই স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন। অসুখ্যাম্প্রা রাজমহিষীগণও স্বামীজীর চরণ দর্শন করিবার জন্ত শিবিকারোহণে আনন্দবাগে উপস্থিত হইতেন। ভারতের বড়লাট, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট, ভারতের প্রধান সেনাপতি—ইহারও আগ্রহের সহিত স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন। স্বামীজী সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

( ৮ )

জন্মাবধি দেহতাগ পর্য্যন্ত স্বামীজীব ইহলৌকিক জীবন—অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সে সকল কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবার স্থান ইহা নহে। আমরা কেবল স্বামীজীর অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

দাক্ষিণাত্যের কোন রানী বৈষয়িক গোলযোগে বিপন্ন হইয়াছিলেন। শত্রুপক্ষ তাহার নামে মামলা উপস্থিত করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য রানীর হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা হয়। এই অবস্থায় অসহায় রানী স্বামীজীর শরণাগতা হ'ন। স্বামীজী রানীকে মোকদ্দমায় জয় হইবে বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য বিচারশেষে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। বিজয়লাভ করিয়া রানী স্বামীজীকে দেড় লক্ষ টাকা দিতে চাহেন,—স্বামীজী সে টাকা লইতে অস্বীকার করেন। শেষে রানী এই টাকায় আনন্দবাগে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। ঐ শিব-মন্দিরের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডের উপর একটি অতিথিশালা নিৰ্ম্মিত হয়। রানী অতিথিশালার মধ্যে স্বামীজীর মন্মরমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

অযোধ্যার অধিপতি মহারাজ প্রতাপনারায়ণ সিংহ স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। একদা মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কাশীধামে

উপস্থিত হ'ন। সাক্ষাতের পর দেশে ফিরিবার অনুমতি চাছিলে, স্বামীজী নিষেধ করেন। এদিকে গুরুতর রাজকার্য্যেব অনুরোধে মহারাজের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মহারাজ স্বামীজীকে স্বদেশ গমনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলে, স্বামীজী বলিলেন,—“তুমি যদি নিতান্তই যাও—তবে যে গাড়ীতে যাইবার মনস্থ করিয়াছ সে গাড়ীতে যাইও না, পরের গাড়ীতে যাইও।” মহারাজা স্বামীজীর আদেশ পালন করিলেন। কিন্তু ষ্টেশনে গিয়া শুনিলেন—তিনি কাল যে গাড়ীতে যাইবার উদ্ভোগ করিয়াছিলেন—সে গাড়ী জোনপুৰ ষ্টেশনে অগ্ন একগাংনি গাড়ীর সহিত সংঘর্ষে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! এই দুর্ঘটনায় বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এতক্ষণে মহারাজ বুঝিতে পারিলেন—স্বামীজী কেন তাঁহাকে সে গাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার ভবানীচরণ দত্তের গলিহু ডাক্তার ভাটুড়ী ১৪ বৎসর অল্পশূল রোগে কষ্ট পাঠিতেছিলেন। স্বামীজী ডাক্তারের যত্নগা দেখিয়া, ডাক্তারের উদরের উপর একবার মাত্র স্থীয় কর সঞ্চালন করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই ডাক্তারের সকল কষ্ট দূর হইল। আর একদিনের জন্তও শূল রোগ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এক জমীদার সম্ভ্রীক স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা তিনি স্বামীজীকে দেখিবার আশায় আনন্দবাগে উপস্থিত হ'ন—তাঁহার জীও সঙ্গে আসেন। জমীদার-পত্নী পূর্ণগর্ভা ছিলেন, আনন্দবাগে উপস্থিত হইলে, তিনি প্রসববেদনায় কাতর হইয়া পড়েন। বিদেশে পত্নী কোথায় প্রসব হইবেন, ইহা ভাবিয়া জমিদার বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী সমস্ত বুঝিয়া জমীদারকে বলিলেন—“তুমি বাটী ফিরিয়া যাও—১০ দিন পরে তোমার জী প্রসব



হইবে।” স্বামীজীব ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছিল—দেশে গিয়া ঠিক ১০ দিন পরে জমাদার-পত্নী এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কাশীর মহারাজ ঈশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহাদুর স্বামীজীর প্রতি ভক্তিমান হইয়া তদীয় রামনগরেব বাজতবনে স্বামীজীর প্রস্তুতময়ী প্রতিমূর্তি স্থাপন করেন।

( ৯ )

স্বামীজীব যশ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি মহাদেশ হস্তে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক এমন কি যুরোপেব বিভিন্ন প্রদেশ হস্তে কত লর্ড রোডি, কাউন্ট ব্যাবণ, মাকুইস, জেনারেল, কর্ণেল উপাধিধারী ব্যক্তিগণ স্বামীজীকে দেখিতে “আনন্দবাগে” উপস্থিত হইতেন।

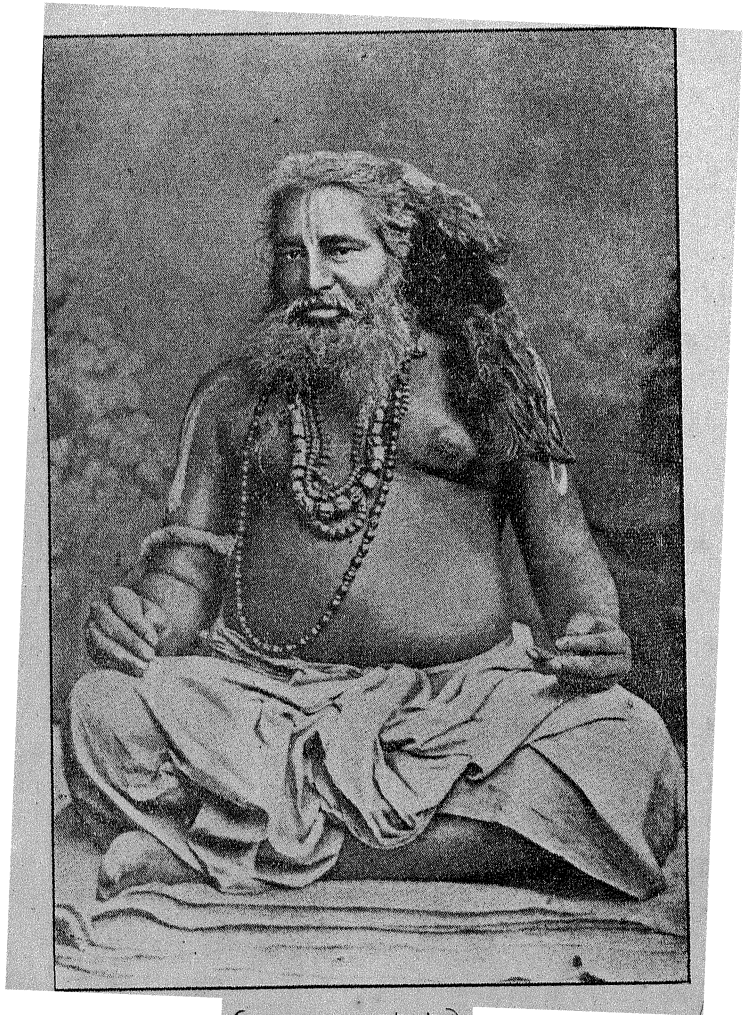
বঙ্গাব্দ ১৩০৬ সালেব ২৫শে আষাঢ় বিবাহ মধ্যবাত্র স্বামীজী সমাপিত হইয়া মৃত্যুদেহ পবিত্যাগ করেন। পূর্ব হইতেই তিনি এ সংবাদ শিষ্যগণের কাছে প্রেবণ করিয়াছিলেন। পবম ভক্ত গয়াপ্রসাদ, এলাহাবাদেব মহাদেব প্রসাদ, অযোধ্যাধিপতি, কাশীবাজ, নাগোদেব অধিপতি যাদবেন্দ্র সিংহ, মৈনপুবেব মহাবাজ তেজসিংহ এবং আবও অনেক জমাদার, তালুকদার, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ প্রভৃতি—স্বামীজীকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

প্রভূপাদ ৬বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বামীজীর একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন।

এখনও স্বামীজী প্রণীত “দশোপনিষদ্” গ্রন্থ—দার্শনিকগণ আগ্রহেব সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

বদরিকাশ্রেমে জীবনুভূক্ত পুত্রেব ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মিশ্রলাল তনুত্যাগ করেন। কাশীধামে স্বামীজীব সাধবী পত্নীব মৃত্যু হয়।





বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

## প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

( ১ )

শান্তিপুত্রের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবচ্যামনি শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর পবিত্র বংশে—  
১৮৪১ খৃষ্টাব্দে, ঝুলন পুণিমা রাত্রে, মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম  
হয়, মাতাব নাম স্বর্ণময়ী দেবী। বিজয়কৃষ্ণ পিতামাতার দ্বিতীয়  
সন্তান ছিলেন।

আনন্দ গোস্বামীর এক জ্যেষ্ঠ সন্তোদর ছিলেন—তাঁহার নাম গোপী-  
মাধব। বিজয়কৃষ্ণ যখন অত্যন্ত শিশু, তখন আনন্দ গোস্বামীর মৃত্যু  
হয়। গোপীমাধব বিধবা ভ্রাতৃবধূকে অনেক কষ্টে সম্মত কবিয়া বিজয়-  
কৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন বিজয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজগোপাল  
জীবিত ছিলেন।

গোপীমাধব ভ্রাতৃপুত্রের বালাশিক্ষার বন্দোবস্ত কবিয়া দিয়াছিলেন।  
প্রথমে পাঠশালার গুরু মহাশয়েব, নিকট বিজয়কৃষ্ণের প্রাথমিক শিক্ষা  
আরম্ভ হয়। বিজয়ের ধীশক্তি প্রথরা দেখিয়া, গোপীমাধব বিজয়কে  
টোলে পড়াষ্টবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অসামান্য প্রতিভাশালী বিজয়-  
কৃষ্ণ, সকলকে যুগপৎ বিস্মিত ও প্রীত করিয়া এক বৎসরের মধ্যে  
সমগ্র ব্যাকরণ-শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন, গোপী মাধবের আর  
আনন্দের সীমা বহিল না। সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্ত  
বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রেরিত হইলেন।

এই সময় যোগ্য হস্তের পরিচালনায়—কলিকাতার ভদ্র সম্প্রদায়ের  
ভিতর ব্রহ্মধর্ম বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী—  
একে একে নব সংস্কারপুত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইতেছিলেন। সংস্কৃত

কলেজে পড়িতে পড়িতে, ব্রাহ্মধর্মের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া বিজয়কৃষ্ণও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী তাঁহার ভাল লাগিল না। ব্রাহ্মধর্মকে ভাবতের যুগোপযোগী ধর্ম বলিয়া যুবক বিজয়কৃষ্ণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তিনি সরল হৃদয়ে জাগ্রত কোতুকে, আত্মার আকুল তৃষ্ণা শান্তির আশায় প্রকাশে ব্রাহ্মসভায় যোগদান করিলেন। এই ঘটনার মধ্যে গোপীমাধব লোকান্তরিত হইলেন।

( ২ )

বিজয়কৃষ্ণের পিতৃ পিতামহগণ গুরু বাবসায়ী ছিলেন। অর্ধেত বংশের গুরু গৌরবে ভুলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত বিজয়কৃষ্ণের পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভাতের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শিষ্যগণের নিকট হইতে প্রণামী স্বরূপ তাঁহার অনেক অর্থলাভ করিতেন।

উত্তরাধিকারী সূত্রে বিজয়কৃষ্ণ এই সকল শিষ্য সেবকের ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ কবিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন—এজন্ত শিষ্যগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় ব্রজগোপালেবও মৃত্যু হইল। বিজয়কৃষ্ণ বৃহৎ গোস্বামী-পরিবার লইয়া বিব্রত হইয়া গড়িলেন।

গোস্বামীদেব সংসারটা আয়তনে বড় সামান্য ছিল না। নানা সম্পর্কেব নরনাৰী আত্মীয়তাব নজিব দেখাইয়া বহুদিন হইতেই গোস্বামী পরিবারে আপনাদের স্বস্ত্র সাবাস্ত্র করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের অকর্মণ্য অলস জীবন, গোস্বামীদের অগ্নে পুরুষাণুক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছিল। বিজয়কৃষ্ণকে ধর্মাস্ত্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া, শিষ্যগণ যখন মনক্ষুন্ন হইল, কেহ কেহবা অত্র গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিল,—তখন বিজয়কৃষ্ণের আগের মাতাও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। বিজয়কৃষ্ণ কি করিবেন? আত্মীয়গণের মধ্যে কাহাকে বিদায় করিবেন? আর বিদায় করিলেইবা

তাহারা এমন নিশ্চিত জীবনের স্বপ্নের আশ্রয় পরিত্যাগ করিবেন কেন? কাজেই বিজয়কৃষ্ণ এই সুবৃহৎ পরিবারের গুরুভার স্বন্ধে লইয়া কাতর হইয়া পড়িলেন। কিসে সংসার চলিবে এই চিন্তাই তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল।

ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বনে বিজয়কৃষ্ণের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ ইহা বুঝিতে পারিলেন। বিজয়ের ভবিষ্যৎ আশ্বাসে উজ্জ্বল, তাঁহারা গোস্বামীকে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের পয়ামর্শ দিলেন। বিজয়ও বুঝিলেন—গুরুগিরি ছাড়িয়া, ডাক্তারী করিতে পারিলে, সমাজ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। সংসারপালনের জন্য অর্থাগমেবও অপ্রতুল হইবে না। বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন।

( ৩ )

অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য অধ্যবসায় বিজয়কৃষ্ণকে অচিরে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র বলিয়া পারচিত করিল। বিজয়কৃষ্ণ তিন বৎসর মেডিকেল কলেজে শারীর বিজ্ঞান শিক্ষা করিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি শক্তি তাঁহাকে সকলের প্রিয়দর্শন করিয়া তুলিল। সকলেই বলিতে লাগিল—বিজয়কৃষ্ণ দেহতত্ত্ববিদ্বৎ অদ্বিতীয় চিকিৎসক হইবেন। কিন্তু অদৃষ্টদেবী অন্তরালে বসিয়া বিজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিড়ম্বনার ক্রুর হাসি হাসিলেন। বিজয়ের আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। শেষ পরীক্ষার পূর্বে কলেজের অধ্যক্ষের সহিত তাঁহার একটু বচসা হইয়াছিল, সেই বচসা ক্রমে ভীষণ মনোবাদের মূর্ত্তি ধারণ করিল। জায়নিষ্ঠ বিজয় আত্মাভিমানের আবেগে কলেজ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বিপদে ব্রাহ্মসভা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। তিনি ধর্মপ্রচারকার্যে ব্রতী হইলেন। বঙ্গ, বিহার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ভারতের নানান্থানে তাঁহার

কৰ্মক্ষেত্রে বিস্তৃত হইল। তিনি লাধারণের কাছে ব্রাহ্মধর্মের গুঢ় রহস্য প্রচার করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা করিবার তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, সে ক্ষমতা শ্রোতার দেহে তড়িৎ সঞ্চার করিতে পারিত।

( ৪ )

বহুদিন ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম যাজন করিয়া ধর্মহংসকে তাঁহার অভ্যর্থনাসিদ্ধি হইল না, অতৃপ্তহৃদ পিপাসা লইয়া তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

এই দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে একদা এক পরমহংসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। পরমহংস বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়ের অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে—বিজয়কৃষ্ণকে যোগধর্মে দীক্ষিত করিলেন। সাধু সহবাসের অপূর্ণ মহিমায় বিজয়কৃষ্ণের প্রাণের অভাব পূর্ণ হইল। তিনি উপেক্ষিত হিন্দুশাস্ত্রকে অত্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। পুত্র অঙ্গে পরমহংসের পদধূলি মাখিয়া বিজয়কৃষ্ণ আবার হিন্দুধর্মকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার ধর্মমত পরিবর্তিত হইল। শেষে তিনি একজন আদর্শ হিন্দু হইয়া, হিন্দুনরনারীকে যোগশিক্ষায় দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। যে সকল শিষ্য হিন্দুধর্মবিদ্বেষী বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, আবার তাহারা বিজয়কৃষ্ণের স্নেহের অঙ্গে ফিরিয়া আসিল।

বিজয়কৃষ্ণ ভারতের বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, সাম্যমৈত্রীর লীলাভূমি পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। তখন পুরীর স্বায়ত্বশাসনের কর্তৃপক্ষ বানবহতায় আত্মা প্রচার করিয়া আপনাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। মিউনিসিপাল কর্মচারীর হস্তে নিত্য নিত্য অসংখ্য বানর নৃশংস ভাবে হত হইতেছিল। বিজয়কৃষ্ণ স্বচক্ষে বানর-হত্যা দেখিতেন, অসহ্য পশুগুলির মৃত্যুকালীন আর্তনাদ শুনিয়া তাঁহার কণ্ঠস্থ বস কঁদিয়া উঠিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া মিউনিসিপালিটীর

কর্জুপক্ষগণকে এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। পুরীবাসী নরনারী বিজয়কৃষ্ণের করুণার ঘোষণা করিতে লাগিল।

পুরীবাসীর হৃৎখদর্শনে বিজয়কৃষ্ণ বিচলিত হইলেন। তিনি দরিদ্রের দুর্দশা মোচনের অভিপ্রায়ে মুক্তহস্তে ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বিতরণ করিলেন। উড়িয়াব নরনারী তাঁহাকে কলতরু দেখিয়া হৃদয়ের প্রজ্জ্বা উপহার দিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে সেই করুণাব দান গ্রহণ করিল।

বিজয়কৃষ্ণ দেশের জন্ত অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় মহত্বের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল। তাঁহার মহান্ উদার প্রাণে, জীবদুঃখের করুণা প্রস্রবন লুকাইত ছিল। চৈতন্ত্যের প্রেমপ্রাবন বিজয়কৃষ্ণের মানব-জীবনকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। লোকহিতৈষণার প্রভাবে তিনি ভারতবাসীর আত্মার অধিক আত্মীয় ছিলেন।

\* \* \* \*

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্রি ৯টার সময় বিজয়কৃষ্ণ পৃথিবীর মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। এখনো অনেক শিষ্য তাঁহাকে দেবতার অবতার ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকে।



# রাজা রামমোহন রায়

( ১ )

জাতীয় জীবনে মহৎ উদ্যোগনা জাগাইবাব জন্ম—দুর্ভাগ্য সংকল্প, অপরিমেয় সাহস ও অক্লান্ত অধ্যবসারের প্রয়োজন ; মহত্ব লাভের এই তিনটি উপাদান—রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

হুগলি জেলার, থানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধা নগর গ্রামে— ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাব নাম—রামকান্ত রায়। বার মাহার একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে চাকুবী কবিতেন। সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় দেশের সর্বত্রই পারস্ত ভাষার আদর ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলকেই পারস্ত ভাষা শিক্ষা কবিতে হইত। রামকান্ত, দ্বাদশবর্ষীয় বালক পুত্র রামমোহনকে পাটনাব এক বিখ্যাত মৌলবীর নিকট প্রেরণ করেন। অল্পশাস্ত্র বুদ্ধি রামমোহন তিন বৎসরের মধ্যে সেই মৌলবীর নিকটে দুক্কহ পাবস্য ভাষা এবং আরব্য ভাষা শিক্ষা কবেন।

তারপর সংস্কৃত শিখিবাব জন্ম রামমোহনকে কাশীতে পাঠান হয়। সেখানে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে বাৎপত্তি লাভ করেন।

রামমোহনের পিতা গোড়া হিন্দু ছিলেন। পুত্র সর্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, পিতা বড় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি



রাজা রামমোহন রায়



দেখিলেন—বেদান্ত ও উপনিষদ্ পড়িয়া রামমোহন একেশ্বরবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, একেশ্বর বাদ প্রচার কবিবার জন্ত—রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তিনি যেখানে দেখেন হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া বেড়াহতেছেন।

বামকান্ত পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক শাসন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে পিতা বিরক্ত হইয়া অব্যাহত পুত্রকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

( ২ )

তখন ভারতবর্ষে রেল ষ্টীমার হয় নাই, লোকের যাতায়াতের বড়ই কষ্ট ছিল। এক দেশ হইতে অল্প দেশে যাইতে হইলে যাত্রীকে অনেক সময় দল্ল্য ভস্তে প্রাণ হারাতে হইত, অথবা বহু পণ্ডর করাল কবলে আত্ম সমর্পণ করিতে হইত।

গৃহ ত্যাগিত রামমোহন মাতৃচরণে বিদায় লইয়া শৈশব স্বপ্ন অধিক্ত সাধেব জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি উদ্যোগী পুরুষ—পদত্রে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন দেশের ভাষা, আচার ও রীতি নীতি অবগত হইয়া—দেশের অভাব অজিযোগ বুঝিতে পারিলেন। ভারতের নরনারীর অল্প তাঁহার প্রাণ কাঁছিয়া উঠিল। দেশের দুর্গতি বিনাশের জন্ত—তিনি স্বার্থ চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। রামমোহন বুঝিলেন—ধর্ম জীবনের উন্নতি না হইলে ভারতের আর উন্নতির আশা নাই।

রামমোহন প্রথমেই হিন্দুর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিলেন। এই বিচার প্রবৃত্তি একেবারেই হইয়া উঠিয়াছিল যে রামমোহন এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন না। দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া তথাকথিত পণ্ডিত

মণ্ডলীকে হৃদয় যুদ্ধে আহ্বান করিতেন। ইহাতে সাধারণের ধারণা হইল—রামমোহন হিন্দুধর্মের ঘোর বিদ্বেষ্টা—তঁাহার মত আর্ধ্য ঋষি-দিগের মতের বিরুদ্ধ, সুতরাং রামমোহন হিন্দুর মহাশত্রু !

বৌদ্ধধর্মের গূঢ় রহস্য অবগত হইবার জন্য রামমোহন তিব্বত যাত্রা করিলেন। সেখানে ধর্মযাজক লামাগণের সহিত তঁাহার অনেক বাক-বিতণ্ডা হইল। তিনি লামাগণকে স্পষ্টই বলিলেন—“বৌদ্ধধর্ম কুসংস্কার পূর্ণ”। ইহাতে লামাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামমোহনের প্রাণ বিনাশের উদ্যোগ করিলেন।

এই সময় রামমোহনের বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র। তিব্বতের চক্রব্যাহে প্রবেশ করিয়া রামমোহন অভিমত্য়ার মত বিপন্ন ! বিদেশে কে তঁাহাকে রক্ষা করিবে ? কিন্তু ভারতের উন্নতি ও উত্থানের বীজ বঁাহার হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে, ভগবান্ তঁাহার মৃত্যুবাণ রচনার মহাকালকে দ্বিগিত করিবেন কেন ? তিনি এক অভাবনীয় উপায়ে রামমোহনকে রক্ষা করিলেন।

সাহিত্য সত্ৰাট বন্ধিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—“শুন্দর মূখের জয় সর্বত্র।” রামমোহন অতি সুপুরুষ ছিলেন। তঁাহার সুকুমার দেহে বৌধনের প্রথম উদ্বেব ; তিব্বতের রমণীবৃন্দ লালসায় দৃষ্টিতে রামমোহনকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। রামমোহনের জীবন নাশের যড়যন্ত্র শুনিয়া—নারীগণ রামমোহনকে লুকাইয়া রাখিল। ভাবপর যড়যন্ত্রকারীদের অজ্ঞাতসারে তঁাহাকে সরাইয়া দিল। রামমোহন গোপনে পলায়ন করিলেন।

( ৩ )

রামমোহন দেশে কিরিলেন। পুত্রকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া রম্যাকাঙ্ক্ষ অগ্রতপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রামমোহন আখ্যায়িক-জনক-

জননীর স্নেহনীড়ে আশ্রয় পাইলেন । কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ অধিক দিন স্থায়ী হইল না । রামকান্ত যখন দেখিলেন—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পুত্রের মত কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই, তখন তিনি পুত্রকে বাটী হইতে আবার দূর করিয়া দিলেন ।

এই ঘটনাব কিছুদিন পবেই বামকান্তের মৃত্যু হয় । রামমোহনের মাতা পুত্রকে আবার বাটীতে আহ্বান করেন ; রামমোহন মাতৃ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, মাতাব নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন ।

এই সময় খৃষ্ট ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার জন্য রামমোহনের বড়ই ইচ্ছা হইল । তিনি ইংরাজী জানিতেন না ; বাইবেল পড়িবার জন্য ২২ বৎসর বয়সে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন, ৬ বৎসরের মধ্যে ইংরাজী ভাষার তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে ।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রঙ্গপুর কলেজের দেওয়ান হন । এই পদে ১০ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকিয়া রামমোহন লক্ষ মুত্ৰা সঞ্চয় করেন । কলেজের ডিগ্বী সাহেব রামমোহনকে অত্যন্ত ভাল বাসতেন । স্ত্রুতরাং অত্যাগ্র আমলাদের মত রামমোহনকে অধিক পবিত্রম করিতে হইত না, অথবা কথার কথার মনিবের হুকুম মাজ করিয়া চলিতে হইত না । রামমোহন যথেষ্ট অবকাশ পাইতেন এবং ফরাসী, গ্রীক, লাতিন ও হিব্রু ভাষার অমূল্যলন করিয়া অবকাশকাল যাপন করিতেন ।

( ৪ )

রামমোহনের মাতার নাম তারিণী দেবী । লোকে তাঁহাকে আদর করিয়া “ফুল ঠাকুরানী” বলিত । রাস্তাঘিক, এই ধর্মমতী পতিপ্রাণা সাধবী মহিলা—ফুলের মতই পবিত্র ছিলেন ।

রামমোহনকে গৃহে স্থান দিয়া তারিণী দেবী বড় বিপদে পড়িলেন । রামমোহন হিন্দুধর্মের উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছিলেন—

লোকে তারিণী দেবীকে কাছে ক্রমাগত অনুযোগ করিতে লাগিল । একদিকে স্নেহের নিধি—পুত্র, অপর দিকে—ধর্মগীর প্রধান অবলম্বন—সমাজ । তারিণী দেবী সমাজকেই বড় ভাবিলেন । কর্তব্যের কাছে পুত্রস্নেহও তিষ্ঠিতে পারিল না । তারিণী দেবী—পুত্রকে বলিলেন—“এবাটীতে তোমার আর থাকা হইবে না, তুমি হিন্দুধর্মের নিন্দা করিতেছ—লোকের কাছে আমি মুখ দেখাটিতে পারিতেছি না । আমি সমাজ ছাড়িতে পারিব না । অতএব আমার অনুবোধ—তুমি রঘুনাথ পুরে নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়া সেই বাটীতে অবস্থিত কর ।”

রামমোহন মাতৃ পরামর্শ গ্রহণ করিলেন । কিন্তু গ্রামে অধিক দিন থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিল না । শীঘ্র তিনি জনকোলাহলময়ী কলিকাতা নগরীকে আপনার কর্মক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত করিলেন ।

কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন ধর্মসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলেন । সংবাদপত্রে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সঙ্গে বিচার তর্ক করিয়া, প্রচলিত হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ চলিতে লাগিল । হিন্দুসমাজ বাতাহত কদলী কাণ্ডের মত কাঁপিতে লাগিল । ধর্মনাশের ভয়ে—অনেকেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিল । শুধু হিন্দুধর্মের উপর নহে,—খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধেও রামমোহন দণ্ডারমান হইলেন । ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বীণু-খৃষ্টের উপদেশাবলী সংস্কৃত ও বঙ্গ ভাষায় অনুবিত করিয়া রামমোহন পাঠরীণের সম্মুখে—সর্গর্বে প্রকাশ করিতে লাগিলেন—“বীণু কেবল ধর্ম প্রচারক মাত্র, তিনি লোক শিক্ষক—তাঁহাতে কোন দেবত্ব ছিল না ।”

তখন শ্রীরামপুরে পাত্রিগণের অত্যন্ত প্রভাব । তাঁহারা সদলবলে আসরে নাগিয়া হিন্দুধর্মের নিন্দা ঘোষণা করিতেছিলেন । ঠিক সেই সময়ে—রামমোহনের সঙ্গে তাঁহাদের ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল । এ যুদ্ধ যদিও এক বিন্দু শোণিতপাত হইল না—কিন্তু উত্তরপক্ষে—অনেক

কাগজ, কলম ও কালী ব্যয় হইতে লাগিল। উভয় পক্ষেই প্রবন্ধ লিখিয়া উভয় পক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। পাঞ্জিগণের ভ্রম প্রদর্শনের জন্য রামমোহন স্বতন্ত্র একখানি পত্রিকা বাহির করিলেন। রামমোহন ঘোষণা করিলেন—“পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা—এই ত্রিঈশ্বরী ঋষ্টানেবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিব—এই ত্রিঈশ্বরী হিন্দুদেব মতই পৌত্তলিক।” রামমোহনের তীব্র ভাষায় পাঞ্জী সমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল।

এই তর্ক যুদ্ধেব ফলে—এডাম্ নামক জনৈক পাঞ্জী রামমোহনের মত গ্রহণ কবির। “একেশ্বর বাদী” হইয়া পড়িলেন।

( ৫ )

রামমোহনের মতের সারবস্তা বুঝিতে পারিয়া অনেকেই তাহা গ্রহণ করিল। রামমোহন সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—প্রকৃত হিন্দুবা একেশ্বর বাদী, তাঁহারা পৌত্তলিক নহেন। বেদান্ত এবং উপনিষদই প্রকৃত হিন্দু শাস্ত্র।

ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে—রামমোহন আর একটা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহা—সতী দাহ নিবারণ। স্বামীব সঙ্গে এক চিতার আরোহণ কবা, সেকালের হিন্দু রমণীগণের বাঞ্ছনীয় ছিল। বৈধব্য-অনলে চিরকাল দগ্ধ হওয়ার চেয়ে স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া মরা ভাল—সাধ্বীগণের ইহাই ধারণা ছিল। অনেক নারীই হাস্যমুখে পতির অনুগমন কবিতেন। কিন্তু চিতার অগ্নি অনেকের পক্ষেই আবাব সুখস্পর্শ নীতল বলিয়া মনে হইত না। সেই সকল নারীগণ—পুড়িয়া মরিতে ভয় পাইত। কেহ কেহ বা শিশু পুত্রকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে, এই ভয়ে—চিতা-রোহণে ইতস্ততঃ করিত। অনুগমনে যাহাদের ইচ্ছা থাকিত না, সমাজ তাহাদিগকে জোর কবির। জলন্ত চিতার নিক্ষেপ করিত। পাছে অভাগিনীদের কাতরোক্তি শুনিয়া লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হয়, সেই জন্য—বিধবার চিতাবোহণ কালে—ঢাক ঢোল বাজাইবার ব্যবস্থা ছিল।



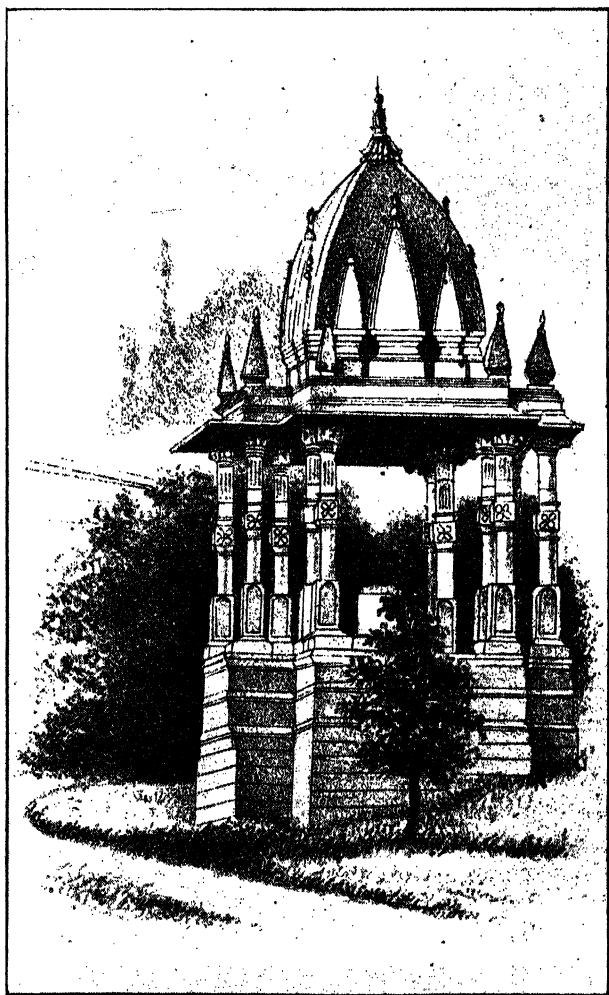
বামমোহন এই সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া বাজপুকষ্দের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রবন্ধের দিকে—বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিনের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া, ভারতে এই সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয়। ১৮২৯ খৃঃ ৪ঠা ডিসেম্বর—সতীদাহ নিষেধ করিবার জন্ত গণপর্লমেন্ট হইতে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

( ৬ )

ইংরাজের আচার ব্যবহার বীতি নীতি জানিবার জন্ত, অনেক দিন হইতেই বামমোহনের বিলাত যাত্রার ইচ্ছা ছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

বিলাসিতা ও অত্যাচারের ক্রীড়াভূমি—দিল্লী নগরী যখন নষ্ট গোবর হাবাইয়া মুসলমানের কীৰ্ত্তিস্তম্ভের ধ্বংসাত্মকে পরিণত হইয়াছিল, পদচ্যুত সম্রাট তখন ইংরাজের করুণাদৃষ্টিব পানে তাপদগ্ধ চাতকের মত চাহিয়াছিলেন। সম্রাটের কোন কোন অধিকার অক্ষুণ্ণ বাণিবার জন্ত, সম্রাটের অনুবোধে—এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র লইয়া ১৫ই নবেম্বর তারিখে—পালিত পুত্র বাজাবাম, রামবদ্র মুখোপাধ্যায়—এবং রাম হরির সঙ্গে বামমোহন বিলাতি যাত্রা করেন। এই সময়ে দিল্লীর পদচ্যুত সম্রাটই বামমোহনকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

বামমোহন—অনেকগুলি উপনিষদ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সেই সকল অনুবাদ পড়িয়া বিলাতেব অনেক সাহেবই বামমোহনের—প্রতিভার সমুচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। যুবোপের অনেকের কাছেই বামমোহনের নাম—সম্মানের সহিত পরিচিত ছিল। সুতরাং খেতবীপেব পবিত্র মৃত্তিকায় বামমোহন পদার্পণ করিবার মাত্র বিলাতেব অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—তাঁহাকে সমাদরের সহিত



রাজা রামমোহন রায়ে়ের সমাধি ( ব্রিষ্টলে )



অভ্যর্থনা করেন। বোর্ড অফ কন্ট্রোলার প্রেসিডেন্টের সাহায্যে রামমোহন রাজসবকাবে পরিচিত হন। ইংলণ্ডে—বাজদূতগণের আসনের সঙ্গে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। রামমোহনের সম্মানার্থ—বিলাতে এক মহাভোজের আয়োজন হয়। ভারতবর্ষে—বিচার ও বাজস্ব বিভাগের কার্য কিরূপে নির্বাহিত হয়—এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবার জন্ত রামমোহন পার্লামেন্টে আহূত হন। ভারতবর্ষ হইতে—সতীদাহ আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে যে আপীল হইয়াছিল, সেই আপীল শুনানির দিন হাউস অফ কমন্স—রামমোহনকে আহ্বান করিয়াছিলেন। রামমোহন ও আপীলের বিরুদ্ধে একখানি দরখাস্ত দাখিল করেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ফ্রান্স যাত্রা করেন। ফরাসী বাজ ফিলিপ রামমোহনকে সঙ্গে একত্র আহ্বান করিয়া, তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

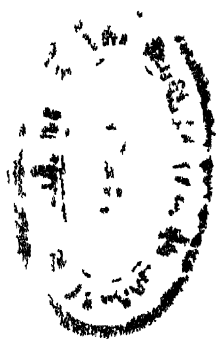
১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। সেপ্টেম্বর মাসে—কম্পেন্টিবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্ত ব্রিষ্টলে গমন করেন। কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে, সেপ্টেম্বরের ১০ই তাবিখে রামমোহন জ্বরবোগে আক্রান্ত হন। বহু সুবিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসাভেও সে জ্বর ভাল হইল না। সকলকাব প্রাণপণ সূক্ষ্মা নিষ্ফল করিয়া, জরাস্বর রামমোহনের আত্মাকে মহাকালে বিলীন করিয়া দিল। বিলাতের অনেক বড়লোক সম্মানের সহিত বাজার শবদেহ সমাহিত করেন।

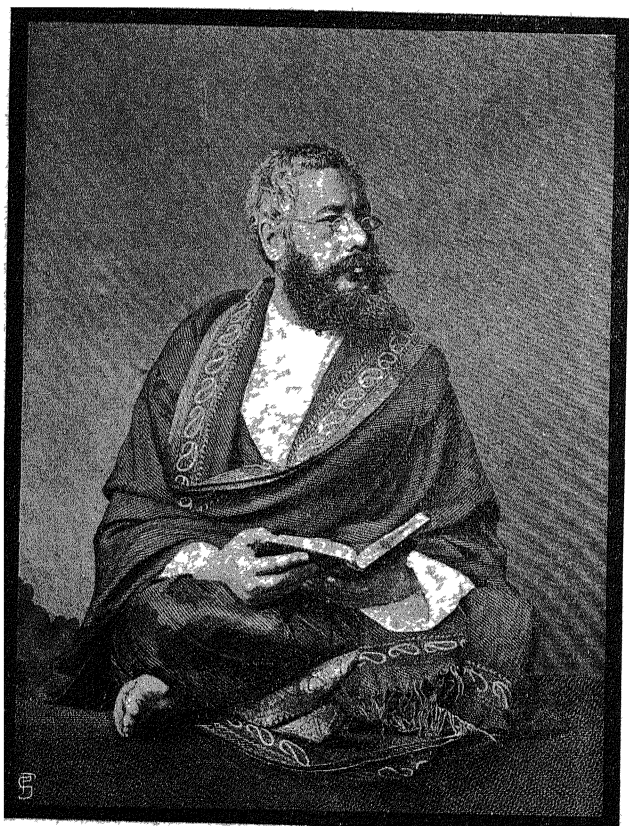
১০ বৎসর পরে রাজার দেহাবশেষ উন্মোচিত করিয়া, ব্রিষ্টল নগরে নীত ও সমাহিত করা হয়। এই সমাধির উপর ৬ বারকা নাথ ঠাকুর একটা স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

রাজা রামমোহন—ব্রাহ্মধর্মের প্রথম প্রবর্তক। ইংরাজী\* ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে—[শকাব্দ ১৭৫১, ১১ই মাঘ] চিংপুর রোডের পাশে রাজা

প্রথম ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্মাণ করেন। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ১১ই মাঘ—ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়া থাকে।

রাজা রামমোহনের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে, তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করা উচিত। সত্য সত্যই—ধর্ম্মজগতে রাজা রামমোহন একজন মহাপুরুষ ছিলেন





মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

# মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে আব একবার ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। ঐতিহাসিক মাত্রেই সে তত্ত্ব অবগত আছেন। এই বিপ্লবের শেষভাগে— ভারতের অলোক কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া বিপন্ন আর্ধ্যধর্মকে রক্ষা কবিরাজ জ্ঞাত,—এই অবতাব বাণীক দেশে মহাত্মা রামমোহন বায় ভারতের ভাগ্যদেবতা কর্তৃক আহৃত হইয়াছিলেন। রামমোহনের অতুলনীয় প্রতিভা সে সময় অত্যাচারপীড়িত ভারতে “একেশ্বরবাদকে” নূতন আকার প্রদান কবিয়াছিল। কিন্তু সে বিবট সাধনায় রামমোহন সিদ্ধিলাভ করিতে পাবেন নাই। লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তাঁহার মহত্বের সমাদরও কবে নাই। দেশবাসীর অবহেলায় “মহাপুরুষ” সপ্ত সমুদ্রের পারে গিয়া নির্বাসিত অপরাধীর মত নির্বাপ লাভ কবিয়া- দিলেন।

যে ভারতে ধর্মের সংস্কারকার্যে ব্রতী হইয়া রামমোহনের মত ধর্ম বীরকেও লাঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, সেই ভারতে ঈশ্বর প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব! রামমোহনের অনুষ্ঠিত মৃতপ্রায় সত্যকে পুনর্জীবিত কবিরাজ জ্ঞাত—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্ম। তখন বহু কু- সংস্কার, বহু অত্যাচার ধর্মের নামধারণ করিয়া ভারতকে ব্যথিত ও মথিত কবিতোছিল। সুযোগ বুঝিয়া খৃষ্টিয়ান পাণ্ডীগণ আর্ধ্যধর্মের উপর কলঙ্ক আরোপ করিতেছিলেন; “ডিরোজী” নামক জনৈক নাস্তিক সাহেবের শিষ্যগণ গুরুর প্ররোচনায় দেশীয় আচার পদদলিত করিয়া স্বাধীন প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছিলেন; সুদূর রাক্ষসীর তাণ্ডবনৃত্যে



মহানগরী কম্পিত হইতেছিল, যাঁহারা শিক্ষিত ও স্বাধীনচেতা, তাঁহারা দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া যুরোপের আচার ব্যবহারের বশঃকর্তন করিতেছিলেন। ভাবতের এই বিপদের সময় শুভক্ক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কুতূহ ভারতের উপধর্ম ও বিপ্লব দ্বীভূত করিয়া, জগতে আর্য আধ্যাত্মিকতাব শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়াছিল।

( ২ )

এই বিলাস-কলুষিত কলিযুগে ধার্মিকগণের চরিতাভিধানিব প্রথম স্থান যদি কাহারও প্রাপ্য থাকে—তাহা দেবেন্দ্রনাথের। তিনি ছিলেন ধর্মজগতের নিভৃত সাধক, কর্ম জগতের অনাড়ম্বর কর্মী। চরম নিপুণতার সহিত তাঁহার চরিত্রের সকল দিক ফুটাইয়া তুলিতে পারি, আমাদের সে শক্তি নাই। আমরা কেবল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। সেই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই পাঠক! বুঝিতে পারিবেন—এই পরিবর্তন সমাকুল লোকারণ্যের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তুঙ্গ শৃঙ্গ মহীকুহের মত চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিবেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—১৭৩৯ শকের [ ১৮১৭ খৃঃ ] ওরা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা নগরীতে ভূমিষ্ঠ হ'ন। তিনি স্বনামধন্য মহাত্মা স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ ঠাকুরের প্রথম সন্তান।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন যে সময় বিলাত যাত্রা করেন, দেবেন্দ্রনাথ তখন বালকমাত্র। রামমোহনের বিদ্যালয়ে, দেবেন্দ্রনাথ তখন ছাত্র; কিন্তু এই অদ্বিতীয় মণীষসম্পন্ন বালকের প্রতিভাদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া, রামমোহন তাঁহার বন্ধুগণকে বিলাতযাত্রার প্রাকালে বলিয়া গিয়াছিলেন—“এই শিশুই আমার গদি অধিকার করিবে।” যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের জীবন চরিত্রের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সহিতও

পরিচিত আছেন, তাঁহার অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন—রাজা রামমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সফল হইয়াছিল ।

• দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে নিত্য শালগ্রামের সেবা চইত, প্রতি বৎসর দুর্গা পূজার উৎসব হইত । ইহাতে বালক দেবেন্দ্রনাথ বড় আনন্দিত হইতেন । অতি শৈশবেই বালকের সরল মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভূজা দুর্গা । সমস্ত ঠাকুরই সেই ঈশ্বর । প্রতিদিন বিছালায়ে যাইবার পথে ঠন্থনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে দেবেন্দ্রনাথ প্রণাম করিতেন এবং পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বর চাহিতেন ।

অল্প বয়সেই দ্বারকানাথ পুত্রের উপনয়ন দিয়াছিলেন । উপনয়নের পর হইতেই বালক দেবেন্দ্রনাথের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া উঠে ; ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার জন্ত তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠেন । একদা ভ্রমণকালে সহসা আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল । আকাশের সুনীল সৌন্দর্য্যের অনন্ত বিকাশ দেখিতে দেখিতে দেবেন্দ্রনাথের মনে হইল—এই যে কোমুদীসুন্দর শশধর, এই যে অগণিত তারকাবলী, ইহাদের স্রষ্টা কে ? আমাদের বাটার শালগ্রাম কি মা দুর্গা, কিবা ঠন্থনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী ইহারা কি চন্দ্র তারকার সৃষ্টি করিয়াছেন ? এইবার দেবেন্দ্রনাথ সমিদ্ধ চইয়া পড়িলেন, তাঁহার ধারণা হইল—শালগ্রাম ও দুর্গা, ইহারা প্রস্তর ও মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, ইহারা কখনও স্রষ্টা হইতে পারেন না, অতএব এ জগতের একজন প্রকৃত স্রষ্টা আছেন, তিনিই অনন্ত শক্তিশালী—ঈশ্বর ।

সেই হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

( ৩ )

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, দেবেন্দ্রনাথ শবের অনুগমন করেন । শ্মশানের উদাসীন চিত্র তাঁহার নয়ন-

সম্মুখে সমুজ্জলরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। মরণোৎসবের মাঝখানে কে যেন তাঁহার মনে বৈরাগ্যভাব জাগাইয়া তুলিল। সংসারের নশ্বরতায় দেবেন্দ্রনাথ ব্যথিত হইয়া পড়িলেন।

রাজা রামমোহনেনব বিলাতযাত্রার পর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্ম সমাজেব আচার্য্যের পদগ্রহণ করেন। তৎকালে পণ্ডিত বলিয়া বিদ্যাবাগীশের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ধর্ম্মপিপাসু দেবেন্দ্রনাথ, প্রথম যৌবনের কামনার অঙ্কুর পদদলিত করিয়া, সমস্ত সাংসারিক প্রলোভনের হাত এড়াইয়া, বিদ্যাবাগীশের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাবাগীশও দেবেন্দ্রনাথকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।

বিদ্যাবাগীশেব কাছে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ কবিত্তে লাগিলেন। রামমোহনেনব “একেশ্বরবাদ”—দেবেন্দ্রনাথেব নিম্নলিখিত হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার কবিল। ভগবানেব অমুপ্রেবণাশক্তি সংসারের স্বার্থ হইতে দেবেন্দ্রনাথকে পৃথক করিয়া দিল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা বুঝিয়া ভগবৎ পাদপদ্মে আশ্রয় নিবেদন করিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি—যে আধ্যাত্মিক বড় বিপন্ন, হিন্দুসন্তান খ্রীষ্টান পাত্রীর বক্তৃতায় বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মপরিবর্তন কবিত্তেছিল। ভারতের সেই অতি বড় ছঃসময়ে পদস্থলিত ভারতবাসীকে পৈতৃক গৌরব বুঝাইয়া, দেবেন্দ্রনাথ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের মত পাঞ্চজন্ম শঙ্খ ফুৎকার প্রদান করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতবাসীর নৈতিক জীবন গঠিত হইল। লোকলোচনের সমক্ষে মহর্ষির অলৌকিকত্ব প্রচার হইয়া পড়িল। ভারত তাঁহাকে “মহর্ষি” আখ্যা প্রদান করিল।

“ঋষি শব্দের অর্থ—মন্ত্র দ্রষ্টা। বেদমন্ত্র ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত হইয়া যাহাদের হৃদয়ে অবতরণ করিয়াছিল, তাঁহারা ই ঋষি। মন্ত্রের অন্তর্ভূত সত্যের সাক্ষাৎ দর্শন ঋষিদের একমাত্র নিদান। এই অর্থ দেবেন্দ্র

নাথের মহর্ষি আখ্যা সার্থক হইয়াছিল । তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন করিয়া-  
ছিলেন ।

• স্বলিখিত ‘আত্মজীবন চরিতের’ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—“আমি যখন পূর্বে দেখিতাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেবা কৃত্রিম পবিত্রিত দেবতার উপাসনা করিতেছে, আমি মনে করিতাম—কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহাব উপাসনা করিব ? এই স্পৃহা আমার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল । শয়নে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল । এখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদয় কামনা পবিতৃপ্ত হইল ; এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল । আমি এতোটা পাষ্টয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতটুকু দিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না । এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তবে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম—জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়মন্দিরের দেবতা হইলেন ; যাহা কখনও আশা করি নাই তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল । আমি আশার অতীত ফললাভ করিলাম ; গঙ্গা হইয়া গিরি লজ্জ্বল করিলাম ।”

এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই তাঁহাকে নূতনভাবে গঠন করিয়া নূতন শক্তি দিয়াছিল ।

( ৪ )

১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্ত মহর্ষি “তত্ত্ব-বোধিনী” সভার প্রতিষ্ঠা করেন । প্রথমে এই সভা তাঁহার নিজ বাড়ীর এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই আহুত হইত । সভায় তখন মাত্র ১০ জন সভ্য ছিলেন, এবং তাঁহারা নিজ আয়ের প্রত্যেক টাকা হইতে তিন পয়সা চাঁদা দিতেন, তাহাতেই সভার খরচ চলিত । অন্নদিনের মধ্যেই

মহর্ষির উদারভাৱ মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গভাষার অগ্রতম অধিনায়ক অক্ষয়চন্দ্র দত্ত এই সভার সভ্য হ'ন।

১৭৬৩ শকে “তত্ত্ববোধিনী” সভা ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হয়। এই সম্মিলিত সভা ধন্যমত প্রচারের জন্ত ১৭৬৫ শকে “তত্ত্ববোধিনী” পত্রিকায় প্রচার করেন। এই সময় ডক্ সাহেব খ্রীষ্টধর্ম প্রচাৰের ছলে হিন্দুধর্মের অনর্গল নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মহর্ষি, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা করাষ্টয়া, প্রবন্ধ লিখাষ্টয়া হিন্দুধর্মের প্রাধাত্য বক্ষা করেন। মহর্ষির চেষ্টায় ডফের সকল যুক্তিতর্ক ভাসিয়া যায়। শিক্ষিত যুবকদল খ্রীষ্টধর্মের প্রলোভন ত্যাগ কবিয়া মহর্ষির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

লোকে তখন বিস্তৃত চটল, দেখিল—আবর্তময় ভীষণ তরঙ্গ বাণের প্রভাবে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। মহর্ষির অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া রাজা রাধাকান্ত দেব দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন—

“দেবেন্দ্রনাথই জাতীয় ধর্মের রক্ষক।”

১৭৮৩ শকের ২৭শে চৈত্র মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের “প্রধান আচার্য্যের” পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। পৌত্তলিক রীতি নীতির কোন অমুঠান না করিয়া দেবেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মমতে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

( ৫ )

মহর্ষির বিশেষত্ব তাঁহার মনে কখনও হিংসা ছিল না। তাঁহার ক্ষুদ্রতা ছিল শরভের শুভ্র শিশির কণার মত। তর্কের সময়েও তাঁহার মুখ দিয়া কখনও কঠোর কথা বাহিব হয় নাই। আত্মহারা হইয়া অতি বড় মহাশক্তিকেও তিনি প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিতেন।

ধনসম্পদের মধ্যে জন্মিয়াও তাঁহার গতি হইয়াছিল বিষয় বিরাগের দিকে। ক্ষুদ্র মহাশাগরে নাবিক যেমন ঞ্চবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিল

অভীষ্টপথে অগ্রসর হয়, দেবেন্দ্রনাথ তেমনি ক্রবতারার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসারসমুদ্রে জীবনতরণী চালাইয়া গিয়াছেন। তিনি সংসারে বাস করিতেন পদ্মপত্রস্থিত বারির মত নির্লিপ্ত হইয়া। রাশি রাশি ঐশ্বর্য্য, চতুর্দিকে ঘিরিয়া থাকিলেও তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই।

সংসারের গোলমাল হইতে দূরে থাকিবার জন্ত ১৭৭৭ শকে তিনি হিমালয় প্রদেশে গমন করেন এবং সেখানে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন ; কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের আন্দোলন তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আবার তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়।

তাঁহার অনুপস্থিতি এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত মতানৈক্য হওয়ায়—নব্য সম্প্রদায় দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাবি ফলে—কেশব বাবু নব বিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা।

জীবনের শেষভাগে—মহর্ষি বীবভূম জেলায় বোলপুর নামক স্থানে এক আশ্রম নির্মাণ করেন এবং আশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহের জন্ত উপযুক্ত সম্পত্তিও দান করেন। ১৮০৯ শকের ফাল্গুন মাসে এই আশ্রম সাধারণে ব্যবহারার্থ অর্পিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ৭ই পৌষ তারিখে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেই দীক্ষা দিবসের স্মৃতি রক্ষার্থ প্রতি বৎসর ৭ই পৌষ বোলপুর আশ্রমে উৎসব হইয়া থাকে।

দেবেন্দ্রনাথ—যেমন ধার্ম্মিকের চূড়ামণি ছিলেন তেমনি পণ্ডিতেরও শিরোমণি ছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার “আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞা,” “ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস,” “জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি,” “পরলোক ও মুক্তি” প্রভৃতি গ্রন্থগুলি—সরল উপদেশে পূর্ণ। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল, গীতা উপনিষদ ও হাফেজের কবিতা—আগাগোড়া তাঁহার কর্ণস্থ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া উপাসনায় মগ্ন থাকিতেন, দ্বিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে নীরবে

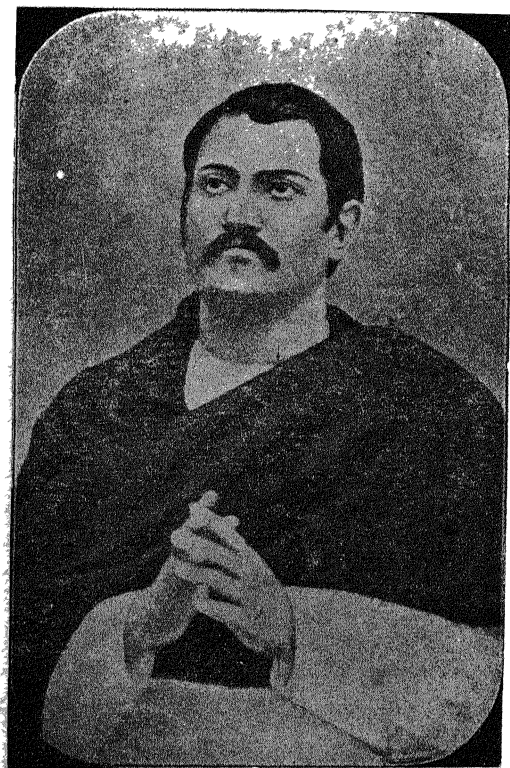
ধান মগ্ন থাকিতে দেখা বাইত । মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর "ডিসট্রিক্ট চেরি-টেবল সোসাইটিতে" লক্ষমুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন । কিন্তু ইহার সাক্ষী ছিল না, পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ—সোসাইটির জ্ঞাত লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া গির্জা গণিশোধ করিয়াছিলেন ।

বঙ্গাব্দ—১৩১১ সালের ৬ই মাঘ—মহর্ষি পরলোক গমন কবেন । ইহার আট পুত্র ও পাঁচ কন্যা । পুত্রগণেব মধ্যে—রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য জগতে দেবতার আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

তঁাহার চরিত্রের মৌলিকতা জানিতে হইলে—তদীয় আত্ম জীবন পাঠ করা উচিত । বঙ্গভাষায় উহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ ।







কেশবচন্দ্র সেন

## ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

( ১ )

২৪ পরগণা জেলায় “গরিফা” একখানি গাওগ্রাম। এখন যেমন গরিফা জনশূন্য অবশ্যো পরিণত হইয়াছে, ৪০ বৎসর পূর্বে তাহা ছিল না। অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য, লাবণ্য, কশ্মক্ষমতা, প্রসন্নতা এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তিব প্রকাশ।—এই মানচিত্রে নগণ্য গরিফাকে একদিন মহানগরীর সমৃদ্ধি দান করিয়াছিল। গরিফায় গমন করিলে, এখন আর পূর্ব সৌন্দর্যের স্বপ্ন রেখাপাতও দৃষ্টিগোচর হয় না, সে শোভন লালিত্য এখন কালের কুক্ষিগত হইয়াছে।

যে সকল মহাত্মা “মাতৃভূমির মুখোজ্জলকারী” বলিয়া নবাবঙ্গের ইতিহাসে সম্মানের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, এই গরিফা গ্রাম তাঁহাদের অনেকের জন্মভূমি। স্বর্গীয় রামকমল সেন, এই গরিফার এক বৈদ্য-বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। চাকুরীর খাতিরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রামকমল কলিকাতা প্রবাসী হ’ন।

রামকমলের চারিপুত্র—হরিমোহন, পারিমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর। হরিমোহন জয়পুরাধিপতির প্রধান সচিব ছিলেন। পারিমোহন টাকশালের দেওয়ানী করিতেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই পারিমোহনের দ্বিতীয় পুত্র।

রামকমল সেন কলিকাতার কলুটোলার নিজের বসতবাটা নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কলুটোলাস্থিত ভবনে, ১৮৩৮ খঃ অব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়।

প্যারীমোহনের স্বভাব নম্রমধুর আবেগে পূর্ণ ছিল। তাঁহার শাস্ত্র মূর্তি শত্রুর মনেও ভক্তির উদ্রেক করিত। তিনি সর্বক্ষেত্রে হরিনামের ছাপ দিতেন, বিষ্ণুপূজা না করিয়া জলগ্রহণও করিতেন না। পিতার অনুকরণ করিয়া কেশবচন্দ্রও শিশুকাল হইতে ধর্মপবায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কেশবের বয়স যখন ৬ বৎসর, তখন রামকমলের মৃত্যু হয়। কেশবের বয়স যখন ১১ বৎসর, তখন প্যারীমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন।

( ২ )

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম বর্ষীয় বালক কেশবকে তদীয় অভিভাবকগণ হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। তিনি বড় মেধাবী ছাত্র ছিলেন, বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয়—কোনও কারণে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহাকে পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পরই তাঁহার ধর্ম প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। এই ধর্ম প্রবৃত্তিই তাঁহার ভবিষ্য জীবনকে গৌরব মণ্ডিত করিয়াছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে—বিখ্যাত পাদ্রী “লং” সাহেবের সঙ্গে কেশবের আলাপ হয়। পাদ্রীর সহিত মিলিত হইয়া কেশব একটা সভা স্থাপন করেন। ঐ সভার নাম—“ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি”। সভা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নিজ বাটীতে একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময় হইতেই ধর্ম সংক্রান্ত সমস্ত কার্যেই—কেশব যোগদান করিতেন। এই সূত্রে—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবের পরিচয় হয়। মহর্ষি—তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতা ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, কেশব ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হ’ন। বলা বাহুল্য এই সময় হইতে উভয়েই একযোগে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

## ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রসেন।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে মহর্ষির সহিত পরামর্শ করিয়া কেশবচন্দ্র “ব্রাহ্ম বিদ্যালয়” স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র বঙ্গভাষা ও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতাৰ উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রগণকে ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বুঝাইয়া দেওয়া।

( ৩ )

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০৭ বেতনের একটা কাজ খালি ছিল ; অভিভাবকগণেব একান্ত অনুরোধে কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্কের চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই কেশবচন্দ্র চাকুবী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন।

এই শুভ সূহৃদে ভারতব নবনারীকে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে উন্নত কবিবার জন্ত কেশব ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। প্রথম যৌবনেই অত্যন্ত সৌন্দর্যের প্রতিধ্বনি তাঁহার বেদনাময় বক্ষে আপনার অস্তিত্ব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। বিবরকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, কেশবচন্দ্র আপনার আনন্দের বেগে আপনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সুরোগ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল—স্বাধীন বুদ্ধি স্বল্প বিচার, বিনয় শ্রদ্ধা ও পর্যবেক্ষণ ; কেশবের উপর ভগবানের করুণা-দৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহার বক্তৃতার নোহিনী শক্তিতে লোকে ব্রাহ্ম ধর্মের মহিমা বৃদ্ধিতে লাগিল। সে বক্তৃতা শুনিবার জন্ত নরনারী ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কেশবের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৮৬২ খৃঃ অব্দে কেশবকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বরণ করিলেন। মহর্ষির উদার উন্মুক্ত করুণার ধারায় অভিষিক্ত হইয়া এই সময় কেশবচন্দ্র বোম্বে ও মালদ্বাজ প্রদেশে গমন করেন এবং ঐ সকল স্থানের অধিবাসী-গণকে ব্রাহ্মধর্মের মহিমা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার মহত্তর আত্মায় পতীর-

প্যাবীমোহনের স্বভাব নম্রমধুব আবেগে পূর্ণ ছিল। তাঁহার শাস্ত্র মুক্তি শত্রুর মনেও ভক্তির উদ্রেক করিত। তিনি সর্বদা হবিনামেব ছাপ দিতেন, বিষ্ণুপূজা না কবিয়া জলগ্রহণও কবিতেন না। পিতাৰ অণুকৰণ কৰিয়া কেশবচন্দ্রও শিশুকাল হইতে ধৰ্ম্মপৰায়ণ হইয়া উঠিয়া-  
ছিলেন।

কেশবের বয়স যখন ৬ বৎসব, তখন বামকমলের মৃত্যু হয়। কেশবের বয়স যখন ১১ বৎসব, তখন প্যাবীমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন।

( ২ )

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম বর্ষীয় বালক কেশবকে তদীয় অভিভাবকগণ হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। তিনি বড় মেধাবী ছাত্র ছিলেন, বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অলুবাগ ছিল। কিন্তু ছঃখের বিষয়—বোনও কারণে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহাকে পাঠ সমাপ্ত কবিতো হয়।

বিদ্যালয় পবিত্যাগ কবিবাব পবই তাঁহার ধৰ্ম্ম প্ৰবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। এই ধৰ্ম্ম প্ৰবৃত্তিই তাঁহার ভবিষ্য জীবনকে গৌরব মণ্ডিত কৰিয়াছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে—বিখ্যাত পাদ্রী “লং” সাহেবেব সঙ্গে কেশবেব আলাপ হয়। পাদ্রীৰ সহিত মিলিত হইয়া কেশব একটা সভা স্থাপন করেন। ঐ সভার নাম—“ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটি”। সভা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নিজ বাটীতে একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময় হইতেই ধৰ্ম্ম সংক্ৰান্ত সমস্ত কার্যেই—কেশব যোগদান করিতেন। এই সূত্রে—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবেব পরিচয় হয়। মহর্ষি—তদানন্তন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতা ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, কেশব ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য -শ্রেণীভুক্ত হ'ন। বলা বাহুল্য এই সময় হইতে উভয়েই একযোগে কৰ্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

## ত্ৰক্ষানন্দ কেশবচন্দ্রসেন।

১৮৫৯ খৃঃ অৰ্দ্ধে মহৰ্ষিৰ সহিত পৰামৰ্শ] কৰিয়া কেশবচন্দ্র “ব্ৰাহ্ম বিদ্যালয়” স্থাপন কৰেন। এই বিদ্যালয়েৰ ছাত্ৰগণেৰ নিকট মহৰ্ষি ও কেশবচন্দ্র বঙ্গভাষা ও ইংৰাজী ভাষায়ে বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতাৰ উদ্দেশ্য ছিল ছাত্ৰগণকে ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মেৰ মন্থ বুঝাইয়া দেওয়া।

( ৩ )

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০ বেতনেৰ একটা কাজ খালি ছিল; অভিভাবকগণেৰ একান্ত অনুবোধে কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্কেৰ চাকুবী গ্ৰহণ কৰেন। কিন্তু একবৎসৰেৰ মধোই কেশবচন্দ্র চাকুবী পবিত্যাগ কৰিতে বাধ্য হ'ন।

এই শুভ মুহূৰ্ত্ত ভাবতেৰ নবনাবীকে জ্ঞানে, প্ৰেমে ও কৰ্ম্মে উদ্বুদ্ধ কৰিবাব জন্ত কেশব ব্ৰাহ্মধৰ্ম্ম প্ৰচাৰে মনোনিবেশ কৰেন। প্ৰথম যৌবনেই অত্যন্ত সৌন্দৰ্য্যেৰ প্ৰতিধ্বনি তাঁহাৰ বেদনাময় বক্ষে আপনাৰ অন্তিত্ব জাগ্ৰত কৰিয়া তুলিয়াছিল। বিষয়কৰ্ম্ম হইতে অবসৰ গ্ৰহণ কাৰয়া, কেশবচন্দ্র আপনাৰ আনন্দেৰ বেগে আপনি অগ্ৰসৰ হইতে লাগিলেন। স্বেয়োগ পাইয়া তাঁহাৰ সঙ্গে মিলিত হইল—স্বাধীন বুদ্ধি স্বল্প বিচাৰ, বিনয় শ্ৰদ্ধা ও পৰ্য্যবেক্ষণ; কেশবেৰ উপৰ ভগবানেৰ কৰুণা-দৃষ্টি পতিত হইল। তাঁহাৰ বক্তৃতাৰ নোহিনী শক্তিতে লোকে ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম্মেৰ মহিমা বুঝিতে লাগিল। সে বক্তৃতা শুনিবাৰ জন্ত নৱনাৰী ব্যাকুল হইবা উঠিল।

কেশবেৰ অদ্ভুত ক্ষমতাৰ পৰিচয় পাইয়া মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ, ১৮৬২ খৃঃ অৰ্দ্ধে কেশবকে ব্ৰাহ্মসমাজেৰ আচাৰ্য্য পদে বরণ কৰিলেন। মহৰ্ষিৰ উদ্যাব উন্মুক্ত কৰণাৰ ধাৰায় অভিযুক্ত হইয়া এই সময় কেশবচন্দ্র বোম্বে ও মাল্দ্ৰাজ প্ৰদেশে গমন কৰেন এবং ঐ সকল স্থানেৰ অধিবাসী-গণকে ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মেৰ মহিমা বুঝাইয়া দেন। তাঁহাৰ মহত্তৰ আত্মাৰ পতীৰ-

কেশবচন্দ্রের আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মবিবাহ সংক্রান্ত একটা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ আইনও আইন নামে খ্যাত হয়।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে, কোন কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য হওয়ায় কেশবের সহিত ব্রাহ্মসমাজের এক বিরোধ হয়। কেশবচন্দ্র পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া বাসের জন্ত একটা নূতন বাটা নির্মাণ করাইয়া তাহার নাম রাখিলেন—“কমলকুটির।”

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজার সঙ্গে কেশবের অপ্রাপ্তবয়স্ক একটা কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহের তিনটা যুক্তি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম বিরোধী ছিল। (১ম) কেশব জাতিচ্যুত, স্তত্রাং কন্যাকর্তার কাজ করিতে পারিবেন না। (২য়) এই বিবাহে কোচবিহারের রাজ-পুরোহিতগণই পৌরহিত্য করিবেন। (৩য়) এই বিবাহে ব্রাহ্ম উপাসনা চলিবে না। কিন্তু কেশবচন্দ্র কোনও বাধাই মানিতে চাহেন নাই, ব্রাহ্মগণের সহস্র অল্পরোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বয়ং কুচবিহারে গিয়া বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের বহু সভাই কেশবের উপর বিরক্ত হ'ন এবং কেশবকে আচার্য্য পদ হইতে অপসৃত করিবার চেষ্টা করেন। অধিকাংশ সভাই কেশবকে পরিত্যাগ করিয়া আর একটা স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন করেন। ঐ ব্রাহ্মসমাজই “সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ” নামে পরিচিত। কেশবচন্দ্রও কতকগুলি বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন সাধন ভজন লক্ষণাক্রান্ত নববিধান সমাজ স্থাপন করেন। এই নূতন প্রতিষ্ঠিত সমাজের উন্নতি করে ১৮৭৮ খৃঃ হইতে ১৮৮৪ খৃঃ পর্যন্ত তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়—তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত রোগে অশেষ কষ্টভোগ করিয়া কেশবচন্দ্র নশ্বর দেখে ত্যাগ করেন।

কেশবচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের গৌরবকাহিনী, “জীবন-চিত্রের” দুই চারি পৃষ্ঠায় লিখিত হইবার নহে, নব্য বঙ্গের ইতিহাসে ব্রাহ্ম প্রচারের সঙ্গ, তাহা চিরদিন সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে ।



# কলী পাবন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

( ১ )

যে মহাত্মার স্মৃতি চর্চার জন্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা—তিনি অজ্ঞেয়, অত্যন্ত, অশেষ লীলাময়। তাঁহার জীবনের কথা, অনেক দিনেব পুরাতন কথা, হয়তো আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই জানা কথা ; কিন্তু মহাব্যক্তের পূজা পুরাতন হইয়াও চির নূতন, তাই অকিঞ্চন হইয়াও ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের বৈচিত্র্যময় জীবন কাহিনী পাঠকগণকে আমবা উপহার দিতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত অদ্ভূত ক্ষমতাপালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পরম হংস রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের অগ্রতম।

হুগলী জেলার কামার পুকুর গ্রামে—ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ষোগবল সম্পন্ন ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ক্ষুদিরামের ঔরসে, ১৭৫৬ [ ইং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ] ১০ই ফাল্গুন বুধবার শুক্ল দ্বিতীয়ার পবিত্র প্রভাতে—ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম হয়। রামকৃষ্ণ পিতাব কনিষ্ঠ সন্তান। রামকুমার ও রামেশ্বর নামে—তাঁহার আর দুই সহোদর ছিলেন। সর্বজ্যেষ্ঠ রামকুমার সর্বশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া কলিকাতায় একটা চতুষ্পাঠী খুলিয়া ছিলেন। বামাপুকুর নামক স্থানে এই চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রামকৃষ্ণ বাল্যকালে লেখাপড়া শিখেন নাই,—লেখা পড়ায় তাঁহার আস্থাও ছিল না। কিন্তু অতি অল্প বয়সেই, একবার রাজ্যের রহস্য বুঝিয়া, উদ্ভ্রান্ত বালক রামকৃষ্ণ অপ্রকট রাজ্যের অতীত শোভার কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র কামার পুকুর গ্রাম—তখন ছাপরের বন্দাবন,



শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব



পৈশব সহচরগণকে সঙ্গে লইয়া প্রান্তরে গিয়া রামকৃষ্ণ গোষ্ঠালীলার অভিনয় করিতেন। বালকগণের মধ্যে কেহ শ্রীধাম, কেহ স্ববল, কেহ বা স্ফদাম সাজিত,—রামকৃষ্ণ স্বয়ং কৃষ্ণ সাজিতেন। পথিকেরা ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইত।

রামকৃষ্ণের বয়স যখন বোড়শ বৎসর, তখন তাঁহার উপনয়ন সংস্কার হয়। উপনয়নের পর স্কৃদিবাম পুত্রকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি—রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় একটা টোল খুলিয়াছিলেন। এই টোলে রামকৃষ্ণের শিক্ষা আরম্ভ হইল। কিন্তু পড়াশুনা তাঁহার আদৌ ভাল লাগিল না। বেদান্তের মায়ী, ব্রহ্ম, আত্মা, মুক্তি প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনিয়া—রামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—টোলের বিদ্যার পরিণাম—কেবল আতপ তত্ত্ব ল কাঁচকলা ও কয়েক খণ্ড রোপ্য মুদ্রা সংগ্রহ মাত্র! রামকৃষ্ণ তাঁহার অগ্রজকে স্পষ্টই বলিলেন—তিনি পণ্ডিত বলিয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা স্থাপনে অনিচ্ছুক।

( ২ )

চতুর্পাঠীর অধ্যাপনা কার্য্য ব্যতীত, রামকুমার আর একটা কার্য্য করিতেন। লোক প্রসিদ্ধা রাণী রাসমণি সহরের ক্রোশতর উত্তরে অবস্থিত “দক্ষিণেশ্বর” নামক স্থানে—প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া, গুরুর নামে “কালিকা দেবী” ও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহদ্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রামকুমার রাণী প্রতিষ্ঠিত এই দেব মন্দিরের পৌরহিত্যে নিযুক্ত হ’ন। জ্যেষ্ঠের সহিত রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে বাভারাত করিতেন। জ্যেষ্ঠের কাজ থাকিলে রামকৃষ্ণকে বিগ্রহের পূজা করিতে হইত।

এক সময় রাম কুমার পীড়িত হইয়া পড়েন, এই পীড়ার উপশান্তি পদ্যাপত্ত হইতে হয়। রাণী—রামকৃষ্ণের উপরই বিগ্রহ পূজার আদর্শ

করেন। সেই অবধি পূজারীৰূপে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্ববেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ—শুধু ফুল বিল্বদল দিয়াই দেবতার পূজা করিতেন না, কালীর প্রতিমাকে তিনি নিজের জননী জ্ঞানে পূজা করিতেন, শিশুর মত মায়ের কাছে আবদাব করিতেন। লোকে দেখিত—পূজারী ঠাকুর আশ্রু বিহ্বল হইয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, কখনও বা উচ্চৈঃস্ববে “মা ! মা !” বলিয়া রোদন করিতেছেন ;—যাহারা মামুষ তাহারা বুঝিত—“এ রোদন’ সংসার ত্যাগীর শেষ মায়ায় রোদন।” আব যাহারা হৃদয় হীন, তাহারা রামকৃষ্ণকে “পাগল” নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করিত ! হায়, তখন কেহই জানিত না—বামুন ঠাকুরের মহাজীবনের নিলিপ্ত বৈরাগ্য একদিন বিশ্ব জগৎকে আশার তূৰ্য্যধ্বনি শুনাইবে।

দেব পূজায় রামকৃষ্ণের এই ঐকান্তিকী ব্যাকুলতায়, যখন স্বার্থপর সংসার তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিল—সেই সময় এই নবীন সাধক আপনাকে একান্তে মানব চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন।

ঠিক এই সময়েই—কুদিরাম ও তাঁহার সহধর্মিণী পুত্রের বিবাহ দিবস জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। উদাসীনকে সংসারে বাঁধিবার প্রধান রজু—রমণী। রামকৃষ্ণের অভিভাবকগণ আর সময় নষ্ট করিতে চাহিলেন না। শীঘ্রই, জয়রাম বাটী নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সারদা দেবীর সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল।

( ৩ )

আজন্ম বৈরাগী রামকৃষ্ণ—বিবাহের উদ্দেশ্য বুঝিলেন না, কেবল অভিভাবকদের মতামুবর্তী হইয়াই বিবাহ করিলেন। প্রেম মামুষকে নবীন করে, কিন্তু রামকৃষ্ণের জীবনে পক্ষী প্রেম কোনও তরুণতা আনিতে

পারিল না নব দম্পতীর এ মিলনে প্রণয়ের তেমন উদ্দাম উচ্ছ্বাস ও দেখা গেল না ।

বিবাহের পর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন । তাঁহার উন্নততা আরও বাড়িয়া গেল । তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে জগজ্জনীর কাছে প্রার্থনা করিতেন—“মা ! একবার দয়া ক’রে দেখা দে ।” তাঁহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর মন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া গগন স্পর্শ করিত । রজনী শেষে যখন প্রাভাতিক শব্দ বাজিয়া উঠিত, তখনও দেখা যাইত রামকৃষ্ণ মঙ্গলারতি না করিয়া কেবল কাঁদিতেছেন । তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মন্দির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইত । কিন্তু সন্তানের রোদন না ভিন্ন কেহ কি নিবারণ করিতে পারে ? যাহারা কামনার দাস—তাঁহারা কেমন করিয়া বুঝিবে যে একটা ব্যাকুল আত্মা কি পিপাসায় অবীর হইয়া নিজ উপাস্যের কাছে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতেছে । যাহারা রামকৃষ্ণকে কাঁদিতে দেখিত, তাহারা কানাকাণি করিত—“এব্যক্তি পাগল হইয়াছে ।” আবার কেহ বা বলিতে লাগিল—“এ এক রকম রোগ, ইহার চিকিৎসা করান উচিত ।” ইহাদের মতানুসারে—কিছুদিন ধরিয়া রামকৃষ্ণের চিকিৎসাও চলিল, কিন্তু সে অদ্ভুত রোগের কোনও প্রতীকার হইল না । দাণরথি বলিয়া গিয়াছেন—“হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈজ্ঞ কি তার জানে বিধি ?” রুক্ প্রতিক্রিয়ায় ব্যর্থ চেষ্টা চিকিৎসকগণের অজ্ঞতার অহঙ্কার খুঁচিয়া গেল । অভিভাবকগণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন । রামকৃষ্ণের রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ভাবোন্মত্ত ঠাকুর—জগজ্জনীর দেখা না পাইয়া আত্ম হত্যার সঙ্কল্প করিলেন । এই সময় অনেকক্ষণ তিনি বাহুজ্ঞান শূন্য হইয়া থাকিতেন । ছয় মাস পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়াছিল । তাঁরপর একদিন—রাত্রে স্বপ্নে মা তাঁহাকে দেখা দিলেন । সন্তান বৎসলা জননী—সন্তানের কামনা পূর্ণ করিলেন । কিন্তু—ইহাতেও রামকৃষ্ণের তৃপ্তি হইল না, তিনি প্রত্যহ দর্শনের জন্য

ব্যাকুল হইলেন। মনের যখন এইরূপ অবস্থা—তখন আর তাঁহার দ্বারা বিগ্রহের নিয়মিত পূজা কেমন করিয়া হইবে? বিশেষতঃ অনেক সময় দেখা যাইত—রামকৃষ্ণ বাহুজ্ঞান শূন্য অবস্থায় উর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছেন! ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না! রাণী—রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র হৃদয়কে<sup>১৭</sup> পূজারী নিযুক্ত করিলেন।

( ৪ )

এইবার রামকৃষ্ণের সাধনাবস্থা। ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন—ভগবানকে পাইতে হইলে দীর্ঘকালের সাধনার আবশ্যক। মানুষের “আমি” ক্ষুদ্র হইয়াও প্রবল শক্তিশালী—তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে হইলে পরের সঙ্গে আপনার বিনিময় করিতে হয়। আমরা তাহা পারি না, আমরা এই ক্ষুদ্র “আমি” লইয়া অভিমানের সঙ্গে সদ্ধি স্থাপন করি। তাই আমাদের চতুর্দিকে এত চরম অনর্থের সৃষ্টি! বিধাতার সমুদ্রিময় জগতে—পরম দ্বারদ্বা ভোগ করিয়া আমরা পদে পদেই বিড়ম্বিত। এই সর্বনাশকর আমিষের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া রামকৃষ্ণদেব কালীর সাধনার ব্রতী হইলেন। তিনি নানাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ষাটশ বর্ষ কাল তপস্যা করিতে লাগিলেন।

লোকে বুদ্ধদেবের কাহিনী পুস্তকেই পাঠ করিয়াছে—তাঁহাকে কেহ চাক্ষুষ দর্শন করে নাই। সাধনাস্থায় রামকৃষ্ণকে দেখিয়া তাহারা জীবন্ত বুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিল।

ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন—“কামিনী ও কাঞ্চন” হইতেই সকল পার্থিব পদার্থের সহিত আমাদের সম্বন্ধ; কামিনী হইতে সন্তানাদির উৎপত্তি—একে মন স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে মূগ্ধ—তাহার উপর আবার পুত্রাদির প্রতি বাৎসল্য রসে অভিভূত—মনের এরূপ অবস্থায় তাহার দ্বাৰা কি ঈশ্বর চিন্তা হইতে পারে? এই জন্তই ঠাকুর পত্নীর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন নাই।

এক এক দিন দেখিতে পাওয়া যাইত—ঠাকুরের এক হস্তে মৃত্তিকা, অপব হস্তে বোণা মুদ্রা । এই উভয় পদার্থ লইয়া ঠাকুর বিচাব করিতেছেন—“টাকা জড় পদার্থ—ইহা দ্বারা হাতী খোঁড়া ক্রয় করা যায়, আত্মীয় সংগত করা চলে, কিন্তু টাকাতে শো সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না । টাকা থাকিলে মনও আসক্ত বিহীন হয় না । আব এই মৃত্তিকা—হঠাৎ এমনি উৎপন্ন হয়, সেই এমনি জীবন বাক্ত হয়,—কিন্তু ইহাও • টাকার মত সংজ্ঞ পদার্থ । অতএব দুইটাই এক জাতীয় পদার্থ ! টাকা—মাটী, মাটী—টাকা !” এই সকল কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর টাকা ও মৃত্তিকা উভয়ই এক সঙ্গে নদাগর্ভে বিসর্জন দিতেছেন ! দেউশত টাকা মুশ্যেব ণাল উপহাৰ পাইয়া ঠাকুর তাহা পদদলিত করিয়া বলিতেছেন—“যখন এখানে বন্ধুগণ হইয়া, তখন এতে আর ছেড়া গ্রাকডাতে প্রভেদ কি ?”

এই সকল ঘটনাই লোক সম্মুখে ঠাকুরকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করিয়াছিল ।

( ৫ )

সাপনাবস্তায়—ঠাকুরের নেত্র নিদ্রাশূণ্য, প্রাণেব মধ্যে কি যেন ঝড় বাহিতেছে, আত্মব বন্ধ প্রায় । অকস্মাতঃ হৃদয়—এক এক দিন অনেক কোশল করিয়া কিছু আত্মব কথাইতেন, নহিলে অধিকাংশ দিনই অনা হাবে কাটিয়া যাইত । জগন্মায়ী মাতাকে দেখিবার জগ্ন—ঠাকুর বাহিবের বন্ধন সমস্তই ছিন্ন করিয়াছিলেন । সত্যেব আলোক তাঁহাব অন্তর্বাকাশ উজ্জল করিয়া তুলিয়াছিল । তিনি কেবল বলিতেন—“না ! মানুষগুলো কেবল ভুল শেখায়, আমি তোমা ভিন্ন অপর গুরু চাই না” । এক এক দিন—চাকর মেথবদেব গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহ মার্জনা করিতে করিতে বলিতেন—“আমি ব্রাহ্মণ, আমি বড়, ইহারা ছোট—এ ভেদ বুদ্ধি একেবারে বুচাইয়া দাও না । ইহাৰা যে শোমায়ি ভিন্ন মূর্তি !



সাধনা চলিতে লাগিল। ত্রৈকান্তিকতায় ও ব্যাকুণতায় চিত্ত দৃঢ় ও নিশ্চল হইতে লাগিল। এই সময় সৌভাগ্য ক্রমে—এক যোগিনী'ব সঙ্গে ঠাকুরে'ব পরিচয় হইল। যোগিনী সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা, সঙ্গীত বন্দে অভিজ্ঞা, বিচিত্র বিভূতি ভূষণা এবং মধুবভাষিনী ছিলেন। যোগিনী'ব অপূৰ্বশ্রী দেখিয়া ঠাকুরে'ব মাতৃভক্তি উৎখলিয়া উঠিল। এই মহিমাময়ী মাতাজীব নিকটেই ঠাকুরে'ব যোগ শিক্ষা'ব আরম্ভ।

যোগ শিক্ষার কিছুদিন পরে একজন দার্শনিক সন্ন্যাসী'ব সঙ্গে ঠাকুরে'ব পরিচয় হ'ল। সন্ন্যাসী'ব নাম—তোতাপুৰী। ঠাকুর ঈহার কাছে বেদান্তের নিগূঢ়ত্ব শিক্ষা করেন।

তোতাপুৰী—পণ্ডিত ছিনে বটে, কিন্তু তিনি ভক্তি তত্ত্ব একেবারেই বুঝিন না। বামকৃষ্ণে'ব কালী ভক্তিকে কুসংস্কার মনে করিয়া তোতা পুৰী অনেক বিদ্রূপ কবিতেন। একদিন ঠাকুর তোতাপুৰীকে ভক্তি তত্ত্ব'ব নিগূঢ় মন্তব্য বুঝাইয়া দেন। শিষ্যে'ব অলোক সামান্য প্রতিভা'ব পরিচয় পাইয়া, তোতাপুৰী পরাজয় স্বীকার করেন।

তন্ত্ৰোক্ত সাধনা'ব পৰ—গামকৃষ্ণ দেব বৈষ্ণব কর্তৃদ্বারা, আউন বাউন প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় সম্মত সাধন করেন। মুসলমান ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম—কিছুই তিনি বাদ দেন নাহ। শেষে, নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া সাধনা'র তাহা'ব সিদ্ধিলাভ হয়।

ঠাকুরে'ব সাধনা'ব ফল যেদিন জন সমাজে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে দিন স্বা পুরুষ সকলেই কোষমুক্ত প্রজ্ঞাপতির মত তদীয় চিত্ত সৌন্দর্য্যে'ব পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

( ৬ )

আমরা হস্তভাগ্য বিলাসে'ব দাস, আমবা সাধুর মহিমা বুঝি না, সাধনা'র কথা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহি না। তাই আমাদের মন্ত—

অধঃপতিত জাতির সম্মুখে একদিন ত্যাগী সন্ন্যাসী—সাক্ষাৎ বেদান্তেব অবতার বামকৃষ্ণ দেবকে ও জিতেল্লিয়তাব পবীক্ষা দিতে চাইয়াছিল ।

বামকৃষ্ণদেব এমন অনেক কাজ কবিতেন—যা সাধাবণে বুঝিতে পারিত না, তাহাদেব ধারণা হইয়াছিল তাহাব বুঝি মস্তিষ্কেব বিকৃতি ঘটয়াছে । এমন কি রাণী বাসমণিও—বামকৃষ্ণ দেবকে প্রথমে সন্দেহেব চক্ষে দেখিয়াছিলেন । আশা মহাশয় শেব চিহ্ন যখন অন্ত্যচলানলয়ী তপনেব বশ্মিজ্বালেব মত অতি দ্রুত অদৃশ্য হইতেছিল সে সময় বাসকৃষ্ণেব মত স্বভাব সাধুব অপূর্ব মাহাত্ম্য লোকে সম্মান প্ৰদান করিতে চাহে নাই । এই জন্তই সাধাবণ সংসারীক কাছে—ভগবান বামকৃষ্ণদেবেব পবীক্ষা । রাণী বাসমণিও জ্ঞাত সাবে—এক ব্যক্তি বামকৃষ্ণেব জিতেনিয়ণ পবীক্ষা করিতে হচ্চুক হন । ঘটনাটী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ ক বতোছি ।

বসন্তেব এক স্নিগ্ধ সুন্দর জ্যোৎস্নালোকিত বঙ্গনীতে এবটী নিম্নজন গৃহে বামকৃষ্ণদেব বাসয়াছিলেন । এমন সময় সজীব বসন্ত ছাবব মত কোনও পুষ্পময়ী কামিনী তাহাব সম্মুখে উপস্থিত । তাহাব দেহযন্ত্রী মনোজ্ঞ যৌবন কুসুম ভারে সজ্জিত , অধব নব কিশলয়েব অরুণ বাগে লোহিত—তাহাতে নেশাব মত একটা চাঞ্চল্য । বালুদগ পেলব শাখা সৌকুমার্যো স্নেহোমল , বসিক পবন—চূর্ণ কুসুম লহযা কপসীব কপালেব উপব ক্রীড়া কবিতৈছিল । রমণীব চছা—আজ সে হৃদয়ানোগেব সচিত্ত নিবিড় বাহু বন্ধনে ঠাকুবকে বেঁধেন বাববে । কিন্তু কুহকনীঃ আশা পূর্ণ হইল না । অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শে সমস্ত দেহ যেমন ঘূর্ণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, রমণী গৃহে প্রবেশ কবিয়ামাত্র ঠাকুব নিজেকে তেমনি অস্তিত মনে কবিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ কবিলেন, রমণীব প্রতি ফিবিয়াও চাহিলেন না । “এমন মহাপুরুষকেও অপবেব প্রবোচনায় কলুষিত কবিতে আসিয়াছি”—হহা ভাবিয়া বেগ্না আপনাব স্বীয়ত যৌবনকে সহস্র ধিক্কার প্রদান কবিল ।

সেই দিন হইতেই বাণী বাসমণি—ঠাকুবেব অপূৰ্ণ মহিমা বুঝিতে পারিয়া মলমতরু বিগলিতা চন্দন তরুর ছায়া ঠাকুবেব পদমূলে লুপ্তিতা হইলেন । বাণীব কণ্ঠচাবীগণও বুঝিল—পবমহংসদেব সামান্য সন্ন্যাসী নহেন—তাঁহাব মধ্যে অসাধারণত্ব আছে ।

মথুব বাবু নামে এক ব্যাক্তি কালী মান্দবেব ভাব প্রাপ্ত প্রধান কন্ম-চাবী ছিলেন । এই মথুব বাবুও একবাব বামকৃষ্ণ দেবেব জিতেজ্জয়তা পৰীক্ষা করিবাব চেষ্টা কবেন ।

লছমী বাই নামী কলিকাতা নিবাসিনী এক বাবনিতাব সঙ্গে—মথুব বাবুব আলাপ । ছল । এক দিন কোশল কাবয়া মথুব বাবু—পবমহংস দেবেকে এই বেষ্ঠাব বাটীতে লইয়া যান । তাব পব ঠাকুবেব অজ্ঞা গুণাবে আপনি তথা হইতে সহসা অদৃশ হ'ন ।

মথুব বাবুব শিক্ষা মত—১৫১৬ জন বেষ্ঠা বামকৃষ্ণদেবেকে ঘিবিয়া ফেলিল, এবং নানাবিধ ছাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল । বেষ্ঠাগুলোব কদৰ্ঘ্য অভিনয় দেখিয়া বামকৃষ্ণদেব শিহবিয়া উঠিলেন । তাব পব “মা ব্রহ্মময়ী ! মা আনন্দময়ী” বলিয়া জগজ্জননাকে ডাকিতে ডাকিতে—নব যৌবনা কপসীদের মধ্যেও সহসা সমাধস্ত হইলেন । সাধুব এই ভাব দেখিয়া—বেষ্ঠাগণ ভীত হইয়া পড়িল । নিকষ কালো মেঘেব মত একটা গভীৰ অমঙ্গল ছায়া—তাগদের ফুটন্ত সৌন্দৰ্য্য মালন করিয়া দিল । তাহারা সাধুব চরণে পতিত হইয়া বারম্বাব ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল ।

বেষ্ঠাদের মুখেই মথুব বাবু সমস্ত ঘটনা শুনিতে পাইলেন । আপনাব মুহূৰ্ত্তেব ত্বৰ্ণলতা স্মরণ করিয়া তাহারা মুখ লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল । ঋষ্ট দেবতাব সম্মুখে বিচার প্রার্থী মানুষেব মত তিনি বামকৃষ্ণেব সমীপে বোড় হস্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন । সাধুব প্রতি তাহার ভক্তি—শতগুণে বাড়িয়া গেল ।

( ৭ )

বামকৃষ্ণদেব সখীভাবে সাধন করিবার জন্ত—মথুরা গাবর অন্তঃপুরে জীশেশ দ্বীমগুলাব মধ্যে বাস করিতেন । নিশ্চয় তাঁহাব মন—শুভ্র শিশিব করাব মত স্বচ্ছ ছিল ।

এইরূপে জ্ঞান ও ভক্তিব নানা পথে তাণ ববিষা তিনি নিচ্ছান্ত করিয়াছিলেন—সকল ধম্মনত ও সাধন পণ্ডারাব গাবিণ্য এক ।

বামকৃষ্ণদেব উপদেশে ও জীবনে অসংখ্য ভগ্নেব কল্যাণ সাধন কাবয়া তাহাদেব মুক্তপথেব সহায় হইতেন । তাঁহাব শ্রীমুখ উপদেশ শুনিবাব জন্ত, তাঁহাকে একবার দেখিবাব প্রত্ন—বাজা মংবাজা হংগে সামাঞ্জ গৃহস্থগণ পণ্যস্ত দাক্ষিণেথবে বাণ্যাক করিতেন । তাঁহাবেব উপদেশেব মধ্যে—কেমন একটা সাধুণ ও বজঃসীতা বভমান ছিল—তাণ অতি পাষণ্ডেব জড হৃদযেও বৈদ্যাতক শক্তিব সম্ভাব করিতে পারিত । তাণ যেন দেবতাব শজ্ঞবনি—স উপদেশ শুনিবাব জন্ত গোকে সঙ্গম ছাড়িয়া কাণী মান্দবেব প্রাক্ষণে ছুটিয়া আসিত । সে দম্ভ বাঁচাণ দেখিতেন, তাহাদেব মনে হইত—স্ফুটব ভাবত অকস্মাৎ তাহাব নিব্বাপত কায়া আবাব বুঝি আঁগয়া বসিবাছে । অতীত দিনসেব চিব আচবিত কাযেব অভ্যাস—তাঁহাব সমস্ত শক্তিকে সাচতন করিয়া তুলিবাছে ।

বামকৃষ্ণ দেবেব আব এটি ভাব ছিল—ভাবতেব ইতিকাসে তাণ অপূৰ্ণ । তিনি কখনও সাধু সন্ন্যাসিব বেশে থাকিতেন না, কোন সাম্প্রদায়িক লক্ষণ তাঁহাব শবীবে বা বেশে সেণা বা ত না । তিনি কখনও ব্রাহ্ম সমাজে বাইতেন, কখনও হরিদ্বারে বাইতেন, মণিজদ দেখেও প্রণাম করিতেন ।

বামকৃষ্ণদেবেব উপদেশ জীবন্ত ছিল । সে উপদেশে বিখ্যাত নাটক-কাব গিরিশ চন্দ্রেব চিত্তেব অবিলতা দূব হইয়াছিল । সে উপদেশ শুনিবাব জন্ত—কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাণ্ড প্রভৃতি স্বনাম ধন্ত মহাপুরুষগণ

—দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া যাইতেন। পবন হংসদেব ভক্তদেব সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন। ভক্তেরাও তাঁহার সঙ্গে ছাড়িতে চাহিত না। কখনও কখনও তিনি ভক্তদেব বাটীতে আশ্রয়িত হইতেন। সে দিন সে গাটী কীৰ্ত্তন, নৃত্য ও হবির্কলিতে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

কেহ তাঁহার পদবলি গট্টাব অবলম্বন পাঠিত না, শিষ্যগণের মধ্যে প্রথম কর্তব্য পূরণে তিনি নমস্কার করিয়া ফেলিতেন।

বামকৃষ্ণদেবের অপূৰ্ণ চবিত্রে মুক্ত ৩০২, একজন বিদেশী বলিয়াছেন—  
“এতদিন পরে একটা মানুষের দেখা পাঠবাড়ি, তাঁর কাছে ধর্ম্য সব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত যে—তাঁহার কাছে বাসিলে মানুষের সমস্ত কামনা বিধি সকাশে নম্রুণী হইয়া পড়ে। আত্ম মর্যাদা গোরব—  
তাঁহাকে ভাস্কর কবিতা তুলিতে পাবে নাই।”

নব বিধান সমাজের বিখ্যাত প্রচাবক স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার বলিয়াছিলেন—“বামকৃষ্ণের ধর্ম্য কি? হিন্দু ধর্ম্য, কিন্তু তাহা অদ্বৈত প্রকারেব হিন্দু ধর্ম্য। সাধু বামকৃষ্ণ কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈব নহেন, বৈষ্ণব নহেন, বৈদান্তিক নহেন, অথচ তিনি এ সকলই! তিনি শিব, কৃষ্ণ, কালী, বাম—সকলেবই উপাসনা করেন, অথচ বেদান্ত মতেবও দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি এক জন পৌত্তলিক ও বটেন, অথচ তিনি নিবাক্য অদ্বৈত, পূর্ণ, অনন্ত জৈবের অল্পবক্তা ধাতা।”

বামকৃষ্ণদেব—এক স্থানে স্থির থাকিতেন না, নানা দেশ ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার মুখের একটা কথা—লোকেব মনে বিশুদ্ধ ধর্ম্যভাবের সঞ্চার হইত। নব সেবা তাঁহার জীবনের একটা বিশেষ ব্রত ছিল। ধনী, দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে সবার ব্যবহারই তাঁহাকে এত স্বার্থ পরতা-পূর্ণ সংসাবে “দেবত্ব” দান করিয়াছিল। কাহাকেও তিনি ঘৃণা করিতেন না। মেথবাণী দেখিলে বলিতেন—“তুমি আমার মা। ছেলেবেলায়

মা স্বহস্তে মল মুত্র পরিষ্কার করিয়াছেন, এখন সেই কাজ তুমি করিতেছ—তুমি আমার মা ! আশীর্বাদ কর আমি যেন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারি ।”

( ৮ )

একবার রামকৃষ্ণদেব—খণ্ডুর বাটী গিয়াছিলেন । তাঁহার পত্নী তখন যোশী । কিন্তু তিনি পত্নীকে প্রেম সন্তোষে অভিনন্দিত করেন নাই । মাতৃ সঘোষন করিয়া যুবতী পত্নীর চরণ পূজা করিয়াছিলেন ।

রামকৃষ্ণদেবের এই পত্নীও এক অসাধারণ রমণী । তিনি কখনও স্বামীর সাধনার পথের কণ্টক হন নাই । অতি অল্প বয়স হইতে—যে রূপ সংঘের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, কামনা বাগনা ত্যাগ করিয়া, তিনি নারী চরিত্রেব অপূৰ্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—তাৎকালে তাঁহাকে “দেবী” না বলিয়া থাকিতে পাবা যায় না । তাঁহার সেই পুণ্যস্মৃতিতে আজ সমস্ত ভারত গৌরবোজ্বল । সারদাগণির মত মনোহরী রমণীর কথা প্রকাশ করিলেও পুণ্য, পাঠ করিলেও পুণ্য, তাই আমরা আভাষে সেই মহিমাময়ীর নামোল্লেখ করিলাম ।

পরম হংস রামকৃষ্ণদেব ভারত জননীৰ পাদপদ্মে—একটী দুর্লভ রত্ন উপহার দিয়া গিয়াছেন । সে রত্ন—স্বামী বিবকানন্দ ।

( ৯ )

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ( বঙ্গাব্দ ১২৯৩, ১লা ভাদ্র ) মহাত্মা রামকৃষ্ণের নখর লীলার অবসান হয় । বেলা দুই টার সময় মৃদঙ্গ করতাল বাজাইয়া হারিনাম করিতে করিতে ভক্তগণ পরমহংস দেবের শব কাশী-পুরের উদ্যান বাটী হইতে জাহ্নবীর তীরে আনয়ন করেন, সন্ধ্যার পূর্বে চিতা সজ্জিত হইল । প্রজ্জলিত চিতার উপর চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের নখর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল ।

রামকৃষ্ণ আঁব নাট। কিন্তু ভাবত তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পাবিবে না। যাহা বাষ্টিভাবে ছড়াইয়া গিয়া, তাহাব সমষ্টি করিয়া রামকৃষ্ণ যে গিষ্ঠ মানবেব কল্যাণেব জন্ম বাখিয়াছিলেন, তাঁহার এ স্বর্ণ কে পবিশোধ করবে? রামকৃষ্ণেব জীবনী অনুশীলন করিলে মনে হয়—ত্রেতাযুগেব “বান্” এবং দ্বাপরযুগেব “কৃষ্ণ” এই দুই অবতাবেব চবিত্র সম্পাদে ভূষিত হইয়াই—কালযুগে তিনি “রামকৃষ্ণ” নামে সাধন রাজ্যে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

## স্বামী-বিবেকানন্দ

( ১ )

ভাবত—ধর্মপ্রাণ মহাদেশ। এখানে যুদ্ধের নাম—“ধর্মযুদ্ধ”, বণ-ভূমির নাম—“ধর্মক্ষেত্র,” সংসার সাঙ্গনীর নাম—“ধর্মপত্নী” ও “সচ-ধর্মিনী”। বিষয়ার্থীর প্রবল উৎপীড়নে, বিদেশীয় অমানুষিক অত্যাচারে ভাবত বারম্বার পর্য্যুদস্ত হইয়াও আপনাব ধর্ম বিক্রয় কবে নাই। এখনও গত শত যোগী ঋষি তপস্বী—হিমালয়ের নিভৃত কন্দবে আত্ম গোপন কবিয়া রূপণেব ধনের মত আপনাব ধর্মধন রক্ষা করিতেছেন। এখনও অনেক সিদ্ধ পুরুষ আছেন—লোকে বাহাদেব নাম জানে না। জগতের কোলাহল, স্বার্থপবতা ও প্রতিযোগীতা হইতে তফাতে থাকিয়া তাঁহারা সাধারণের অনুসরণের অতীত হইয়া আছেন! এই যে সকল সিদ্ধ পুরুষ—তাঁহারা কেবল আত্মমুক্তির অভিলাষী, জগতের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধও নাই। সমাজেব ভাল মন্দের জ্ঞাত তাঁহারা দায়ী নহেন। তাঁহাদের জীবন—নিজেব অসম্পূর্ণ কার্য সাধনের জ্ঞাত। কিন্তু, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক জন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যিনি আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম—‘স্বামী-বিবেকানন্দ।’

ধর্মের মানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে—এক এক জন প্রেরিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ সেই প্রেরিত পুরুষ। যদি “অবতার বাদে” বিশ্বাস করিতে হয়—তবে বিবেকানন্দ এই শতাব্দীর অবতার।



বিবেকানন্দ—কত শত উন্ন্যাসগামী যুবককে সংযম ও ধর্মপথে আনয়ন করিয়াছেন। বাহ্যিক আচার ভ্রষ্ট, উপেক্ষিত, বৃণীত—তাহাদের জন্ত মুক্তি সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতফেরতকে সমাজে স্থান দিয়াছেন।

এতদিন ইউরোপ—বিজিত পদানত ভারবাসীকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া, ভারতে আপনার ধর্ম প্রচার করিতে আসিত, আমেরিকা, ভারতকে খ্রীষ্টমত্রে দীক্ষিত করিত, কিন্তু বিবেকানন্দের প্রাসাদে ভারতের ধর্ম সপ্তসিন্দু মন্থন করিয়া ইউরোপকে আক্রমণ করিয়াছে। বিবেকানন্দের আহ্বান আমেরিকা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছে! বাঙ্গালী বিদ্বৎ সাহেব ছাটকোট খুলিয়া গৈরিক বসন গ্রহণ করিয়াছে, বাইবেল ফেলিয়া “গীতা” ধরিয়াছে, যাঁও ভুলিয়া “আর্য্য” সাজিয়াছে! এ সকল কথা যখন ভাবি, তখনই মনে হয়—কি অতুল অমৃতময়ী মহতী প্রতিভা লইয়াই স্বামীজী এই চির অলস, চির নিষ্ক্রিয় অধম বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দেবতার আশীর্বাদের মত অবতরণ করিয়াছিলেন! হায়! স্বার্থপর আমরা তাঁহাকে চিনিয়াও চিনিতে পারি নাই।

“বিবেকানন্দ”—এই গুরুদত্ত নাম নিজের প্রতিষ্ঠাময় জীবনে তিনি যে সার্থক করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ইহাই আমাদের সাধনা! চক্ষুর জলের কালীতে লিখিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আজ আমরা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

(২)

১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ সোমবারে স্বামী বিবেকানন্দ, কলিকাতার সিমলা নামক স্থানে এক কার্যস্থলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, ইনি হাইকোর্টের এটর্নী ছিলেন।

তখনও প্রভাত হয় নাই। রজনীর তামসিক ববনিকা ভেদ করিয়া উদয় তোরণে তপনের রম্যবর্ণ বিকাশ তখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই,

সেই দিবসাত্তির সন্ধিকণ পূণ্যময়ী উষার ক্রোড়ে, নিশাবসানে “শুক-  
তারার” মত বিবেকানন্দের আবির্ভাব ! দত্তবাটীর অন্তঃপুরের মুহুমূহঃ  
শ্রদ্ধাধ্বনি শুনিয়া, তখন কেহই ভাবে নাই—এই স্মৃতিকাগৃহের স্বর্ণরাগ  
একদিন বিধেব প্রাক্ষণে অবতরণ করিবে ! তথাপি সাধারণ শিশু  
হইতে সেই জ্ঞাতমাত্র শিশু যে যথেষ্ট মৌলিকতা ও বিশেষত্ব আছে,  
তাহা অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল ।

বিদ্বনাথ পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—নবেজনাথ । নবেজ বাল্যে  
বড় হ্রস্ব ছিলেন । কিন্তু সে শৈশবচপলতার সকলেই কোতুক অনুরভ  
কবিত । বিদ্যালয়ে সকল বালক অপেক্ষা নবেজের কৃতিত্ব অধিক ছিল ।  
কুশাগ্র বুদ্ধি এবং অলোকসামান্য প্রতিভাশুণে তিনি শিক্ষকগণের প্রিয়-  
পাত্র ছিলেন । তাঁহাব যুক্তিপূর্ণ তর্ক শুনিয়া বরষ ব্যক্তিরাত্তি মুগ্ধ  
হইতেন ।

নবেজনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে, এফ,এ পাড়বার জন্ত  
“তাঁহাকে “এসেন্সি কলেজে” ভর্তি করা হয় । এই সময় ইংরাজী  
শিক্ষার প্রভাব নবেজকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল । ছাত্রাবস্থায়  
ধর্মজীবন গঠনের উপাদানগুলি তিনি ইংরাজী শিক্ষার নিকট হইতে  
লাভ করিয়াছিলেন । ফলে তাঁহাব দ্বন্দ্বচ্ছল মন এক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট  
না হইয়া কখনও, তাঁহাকে “ব্রাহ্ম সমাজে” কখনও পাত্রী সকাশে,  
আবার কখনওবা মৌলবী মসজিদে লইয়া যাইত । বসন্তের পুষ্পবিলাসী  
মধুপের মত তিনি সকল সম্প্রদায়ের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেন । নবেজের  
সর্বাপেক্ষা গতিবিধি ছিল—“ব্রাহ্ম সমাজে ।” ব্রাহ্মসমাজের আচার্যাগণের  
বক্তৃতা—নবেজের ধর্মজীবন গঠনের অনেক সাহায্য করিয়াছিল । তাই  
পূর্বতন সংস্কারের অন্ধবিশ্বাসে তাঁহার উপর কখনও প্রভুত্ব করিতে  
পারে নাই । ভবিষ্যতে জগতের শিক্ষার জন্ত তিনি যে হিন্দুর দার্শনিক  
মতকে আধুনিক, বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া শিক্ষিত নরনারীর উপর

সহায়—প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, নবেঙ্গের ছাত্রজীবনেই তাঁহার স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায় ।

( ৩ )

এই সময়ে নবেঙ্গনাথ ঘোষ সংশয়বাদী । কোন ধর্ম্মেই তাঁহার আস্থা ছিল না, কোন ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহার সন্দেহ নিবশন কবিত্তে পাবেন নাই—কাজেই নবেঙ্গনাথ সংশয়বাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন । কেহ কুতর্কিকের বুদ্ধিব নিকট পবাতব স্বীকার কবিত্তা সংশয়বাদী, কেহ বা স্রীয় অমার্জিত বুদ্ধির জডতাব জন্ত সংশয়বাদী । নবেঙ্গনাথ ংরূপ সংশয়বাদী ছিলেন না । সমস্ত ধর্ম্মমতগুলি তন্ন তন্নকূপে বিশ্লেষণ কবিত্তা, শেষ মিমামসা কবিত্তে অক্ষম হইয়া নবেঙ্গনাথ সংশয়বাদী হন, তাঁহার অন্তবে এমন একটি তীব্র ব্যাকুলতা ছিল—যে ব্যাকুলতা তাঁহার স্মৃতিমায জীবনকে ভবিষ্যতে ংধরনিষ্ঠ কবিত্তা তুলিয়াছিল । ংট ংকুলতাব জন্তই পবিণামে প্রভু রামকৃষ্ণের কুপালাভ ।

ংকদিন ংহাকে সমগ্র সভ্য জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীয সমক্ষে দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহাদের অসংখ্য মতের মধ্যে ংপনার ধর্ম্মমত যুক্তি-নির্ণীত কবিত্তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কবিত্তে হইবে, তাঁহার ংবতীয় ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি ংয়ত্ত না কবিলে চলিবে কেন ?

নবেঙ্গ কিশোর বয়সে মৌলবী ব্রাহ্মপ্রচাবক পাট্রী ও সাধু সন্ন্যাসী-দিগকে জিজ্ঞাসা কবিত্তেন—“ংপনারা কেহ কি কখনও ংধর প্রত্যক্ষ কবিত্তাছেন ?” উত্তবে শুনিতেন “না” । তাঁহার ব্যাকুল অন্তঃকরণ সে উত্তরে স্রোতের মুখে বেতস লতাব মত নিবাসায ভাঙ্গিয়া পড়িত । ত্তিনি ংল্যকাল হইতেই সাধু সন্ন্যাসীয ভক্ত ছিলেন, সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদের সন্মুখে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু কোথায় তাঁহার মনের ংধা মিটিত না । ংই সময় নবেঙ্গ কতকটা নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন । ংইরূপ সন্দেহ বিপ্লবের চক্রবূহে পড়িয়া, ংশয ও

যেবনের সন্ধিক্ষণে শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত মহাত্মা বামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নবেন্দ্র নাথের পবিচয় হইয়াছিল । নবেন্দ্রকে প্রথম দিন দেখিবামাত্রই পূরমহংসদেব বুকিতে পাবিয়াছিলেন—“হলোকেব কৰ্ম্মযন্ত্ৰ এতদিনেব পর তাঁহাব যণার্থ উত্তর সাধক মিলিয়াছে ।

এই কামহুহ কল্পক্ৰমেব স্নিগ্ধ চবণচ্ছায়াতলে বসিয়াই নবেন্দ্রের দীক্ষা ও সাধনা ।

নবেন্দ্রকে দেখিয়া প্রভু বামকৃষ্ণদেব অত্যাশ্চর্য ভক্তদেব বলেন—

“এই ছেলেটিকে দেখু ছ এখানে একরকম দ্রবস্ত ছেলে, যখন বাবাব কাছে বসে, জুজুটী, আবাব চাঁদনোনে যখন পেশে এখন আব এক মূর্ত্তি । এবা নিত্য সিন্ধেব থাক, এবা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না, একটু বয়স হ'লেই চৈতন্য হয়, আব ভগবানেব দিকে চ'লে যায় ; এবা সংসারে আসে জীব শিক্ষাব জন্ত । এদেব সংসাবেব কাজ কিছু ভাল লাগে না—এবা কামিনীকাঞ্চে কখনও আসক্ত হয় না ।”

প্রভু বামকৃষ্ণের সহিত নবেন্দ্রনাথের পবিচয়—আত্মায় আত্মায় পবিচয় । বামকৃষ্ণদেব নবেন্দ্রকে বড়ই ভাল বাসিতেন । এ ভাল-বাসায় মন্দাবের মধু মাখান ছিল, আশীর্বাদেব শিখ্যায় কুসুমের সৌভ জড়িত ছিল । নবেন্দ্রের হৃদয় উদার উন্মুক্ত আকাশ, নরেন্দ্রের মন তত্ত্বানুসন্ধিৎসায় ব্যাকুল । নবেন্দ্রের প্রাণ, জীবহৃৎপ্রেরণায়,—বামকৃষ্ণ দেব বুকিয়াছিলেন, এই মৃন্ময়ব ভিতব চিন্ময়েব লীলা দেখিয়া একদিন নিখিল সংসার মহাশিক্ষা লাভ কবিবে । নবেন্দ্রকে একদিন না দেখিলে পবমহংস দেব পাগল হইয়া উঠিতেন ।

নবেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে অস্বাবয়ুপূৰ্ব সিজিতেব আভাষ পাওয়া যাইত ; দুব হইতে শুনিলে সতসা বামাকণ্ঠ বলিয়াই ভ্রম হইত । সেই কণ্ঠে যখন মায়েব নাম গীত হইত—তখন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরস্থিত পাষণ প্রতিমায় কি এক অপূৰ্ব মূৰ্চ্ছনায় কে যেন প্রাণস্পন্দন আনিয়া

দিত । রামকৃষ্ণদেব তদ্ব্যয় হইয়া সেই জীবন্ত সঙ্গীত উপভোগ করিতেন, তাঁহার তপঃপূত কলেবেবে অনির্বচনীয় নাস্তিক লক্ষণ প্রকাশ পাইত ।

রামকৃষ্ণদেবের লীলা যতদিন মর্ত্যে প্রকট ছিল, ততদিন নরেন্দ্রের ভক্ত্যভাব শিষ্যের অবস্থা । এ মূর্ত্তি বড় ককণ—বড় মৰ্ম্মস্পর্শী ! এ মূর্ত্তি বুকে টানিয়া লইতে ইচ্ছা কবে—যেন মনে হয় কত আপনাব । প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা কবে । নরেন্দ্রের মোহনীয় চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁচাব এই শিষ্যটির নামকরণ করিয়াছিলেন “বিবেকানন্দ” । বাস্তবিক “বিবেকানন্দ স্বামী” এই নামটি শুনিলেই শ্রোতার মনে শ্রদ্ধা সন্ত্রম ও ভয়মিশ্রিত কেমন একটি ভাবের উদয় হয় । মনে হয় হিমাদ্রির অপেক্ষা উন্নত, মহাসমুদ্রের মত অতলস্পর্শ । সে উচ্চতার “নাগাল” গাওয়া যায় না, সে গভীবতাব “থট” মাগা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব । রামকৃষ্ণদেবের দীক্ষাগুণে আমাদের নরেন্দ্র-নাথ আজ জগজ্জয়ী ; ইহার ধৰ্ম্মপতাকাতে সমস্ত পৃথিবীবাসী সমবেত । রামকৃষ্ণদেবের সরল উপদেশগুলি দার্শনিক যুক্তি দ্বারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ।

( ৪ )

বিবেকানন্দের ধৰ্ম্মপ্রচার ।—সে এক অপূৰ্ব বস্তু ! এই ধৰ্ম্মপ্রচারের সমস্ত চৈতন্য দেওয়া ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে । ধৰ্ম্মজগতে তাঁহার সৰ্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য কার্য “চিকাগোর” মহাসভায় বেদান্ত বক্তৃতা, উপনিষদ, ধৰ্ম্মপ্রচার । এই বক্তৃতা দ্বারাই বিবেকানন্দকে জগৎ সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়াছিল ।

স্বামীজী ধৰ্ম্মপ্রচার কার্যে ব্রতী হইয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন ; এইজন্ত কেহ কেহ স্বামীজীর কীবিক কালে তাঁহার কার্য “হিন্দুধর্মের অল্পমোদিত নহে” বলিয়া আপত্তি করিয়াছিল । তাঁহাদের মতে—স্নেহ দেশে গমন হিন্দুধর্মের অল্পমোদিত নহে, কেমনা স্নেহ দেশে বাস করিতে

গেলে “অথাচ্ছ ভক্ষণ” অপবিহার্য্য হইয়া উঠে । আগন্তিকারীগণ যদি একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেন—যে অথাচ্ছ ভক্ষণ ও স্নেচ্ছ দেশে গমিন সাধাৰণের পক্ষে দূষ্য হইতে পারে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে তাহা দূষ্য হইতে পারে না । শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ জ্ঞানীদেব পক্ষে নহে । বাহাবা নির্বিকার—তাঁহাদের আবাব পাপপুণ্য কি ? \*

একদিন স্বামীজীর ধর্ম্ম প্রচার ভেরী এসিয়া হইতে আমেরিকা, আমেরিকা হইতে ইউরোপ মাতাঙ্গেরা তুলিয়াছিল । এই ধর্ম্ম প্রচারের ফলে বিশ্বের কোটী কোটী নর নারী স্বামীজীর জ্ঞান আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন । তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে । আজি যে বেদান্তের এত আদর—তাঁহার একমাত্র কারণ স্বামীজীর ধর্ম্ম প্রচার । তাঁহার জ্ঞান পৃথিবী আজ বেদান্ত ধর্ম্মেব নিকট নতশির । স্বামীজী যে যে স্থানে বক্তৃতা করিতেন, সেই সেই স্থলেই বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিয়া গৌরব বোধ করিতেন । স্বামীজীর আরক্স ব্রত উদ্যাপনের জন্ত কত যুবক যে আপনাদের মন প্রাণ সমর্পণ কবিয়াছেন, তাঁহার প্রমাণ—বেলুড় মঠের মহোৎসবে আপনারা দেখিতে পাঠিবেন ।

এই আরক্স ব্রত দীন সেবা । কতাল হইতে আবস্ত করিয়া অষ্ট্রেলিয়া—আমেরিকা পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে । বাঙ্গালার পল্লীতে

\* এই গল্পটি বিবেকানন্দ-ভক্ত কোন এক বন্ধুর নিকট শুনিরাছি ।

“একদিন স্বামীজী আহায়ে বসিবেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, একজন মেথর বিঠাখার লইয়া চলিয়া যাইতেছে । স্বামীজী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—“তুই এই বিঠার হাতে আমার ভাত মেখে দে ?” স্বামীজীর আগ্রহাতিশয্যে মেথর তাহাই করিল । স্বামীজী তখন সেই অন্ন অন্নদ্বন্দনে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন । আহায়ে সমাধা করিয়া বলিয়া উঠিলেন “এইবার আমি বিলাত যাইতে পারিখ । ইহাতে আমার কোন পাপ হইবে না ।”

মাতীতে এই মহান আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া দেখা যাউতেছে। পবিত্রায়ে সমস্ত জগতের আকুল দৃষ্টি এই দীনসেবা কার্যে পতিত হইবে—তাঁহা আকাশ কুসুম নহে।

স্বামীজীব শিষ্যগণের নবোদয়মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ দেশ প্রিদ্ধ। শিষ্যগণের মধ্যে বিদ্যাবী নিচ দিতা নব প্রধানা, বিবেকানন্দেব সাধু চরিত্র ও স্বদেশ প্রীতির মতমাত্র আরও হইয়া দেখা নিবোধিতা—স্বদেশের স্থপিত্ত্ব্যতাগ কবিয়া, তপস্বিনী উনার তেণে ভা তেব চরণে শরীর মন নিবেদন করণে আসিয়া ছিলেন।

স্বামীজীব “বক্তৃতা” আশোচনা কশিণে দেখা যায়—তাঁহার উৎসাহ, অধ্যবসায় জগন্ত ছিল, তাঁহার প্রাণ সমগ্র জগতের জন্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আশা গগনস্পর্শী, লক্ষ্য ভগবানেব উন্নত ছিল। তাঁহার সহানুভূতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি সমস্ত জাতি নির্বিশেষে করুণার মত বার্ষত হইত।

( ৫ )

আমেরিকাব চিকাগো নগরে এক বহুতী সভা আহূত হয়। পৃথিবীর ভাবদ্বন্দ্বের প্রতিনিধিগণ এই সভার সমবেত হইলেন। একপ বৃন্তী ধর্ম সভা, একপ ধর্ম প্রচাবক সম্মিলন জগতেব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাহ। মাস্ত্রাজ এসোসিয়েশনেব অর্থ সাহায্যে স্বামীজী তথায় প্রেরিত হন। তথায় যাওয়া দেখেন অভূতপূর্ব ব্যাপাব। স্বামীজীব মনে হর্ষ ও বিষাদ যুগপৎ উৎখিত হইল। হর্ষ—সেই অসাধারণ সভায় বক্তৃতা কহিবেন ভাবিয়া। বিষাদ—পাছে কৃতকার্য হইতে না পাবেন বলিয়া। কি উপায়ে সেই সভায় বক্তৃতা কবিতো অধিকার পাইবেন—তাঁহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পাথের নিঃশেষিত, সে দেশে কেহ ভিক্ষা দেয় না, কেহ ভিক্ষা করিলে বাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। সকলেই অপরিচিত—কেই বা ঋণ দিবে। দেশ বরফাবৃত, শীত অসহ্য, শীত নিবারণোপ-যোগী তাড়ণ গাত্র বস্ত্রবও অভাব। সেই দুঃসময়ে মাস্ত্রাজ বাসীরা

অর্থ সাহায্য করিয়া স্বামীজীকে বক্ষা করেন—তাহার জন্ত বাঙ্গলা তাঁহা-  
দেব নিঃশেষী ।

সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি সমুখে কাষ্ঠখণ্ড দেখিতে পাইল, অন্ধকারাচ্ছন্ন  
বিজন অবশ্যে আলোকরাশি দেখা দিল—স্বামীজীব আশাব উদয় হইল ।  
ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধিকূপে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই  
চিকাগো সন্ধ্যা নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন । স্বামীজী দীন ভিখারীর মত  
মজুমদার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন । সেই প্রবাসে—সেই নিঃসঙ্গার  
অবস্থায় স্বামীজী মজুমদার মহাশয়ের নিকট হঠাৎ সাহায্য প্রাপ্তি দুবে  
থাক, যথেষ্ট একটা সহানুভূতি সূচক আশ্বাস ও পাইলেন না । স্বামীজী  
চক্ষে অঁদার দেখিলেন তাঁহাব উৎসাহদীপ্ত মুখমণ্ডল তর্জনে কালিমাময়  
হইল, তাহার গোবদোন্নত বক্ষ সে মনোভেদী আঘাতে দমিয়া গেল ।  
স্বামীজীব ধারণা ছিল ব্রাহ্মেরা স্বভাবতঃ উদার । এইবার সে ধারণা  
ঘুচিয়া গেল ।

চিকাগো হঠাৎ নিন “কষ্টম” নামক স্থানে যাত্রা করিলেন । “কষ্টম”  
একটা পল্লী । তথায় অল্পবয়সে জীবন যাত্রা নিব্বাহ করবে—ইহা  
তাঁহার আশা । “কষ্টমেব” এক বরফাবৃত পথে—স্বামীজী অনাথের মত  
পাতিত, সে দৃশ্য এখনও দর্শন করিলে চক্ষু জলে ভরিয়া আসে ! সে  
অবস্থা দেখিলে পাষাণে উৎস ছুটে ।

“কষ্টমের” এক দয়াময়ী প্রৌঢ়া বঙ্গী স্বামীজীব হৃদয়ে বাথিত হইয়া  
নিজেব গৃহে স্থান দিলেন । তাহারই চেষ্টায় চিকাগোর প্রবেশাধিকার  
এবং বক্তৃতা করিবার জন্ত দশ মিনিট মাত্র সময় স্বামীজী পাইয়াছিলেন ।

অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমাব ভ্রাতা ও ভগিনীগণ  
এক বলিয়া সম্ভাষ্য নব নাবীকে সম্বোধন করিলেন—তখন সকলেই  
একযোগে কবতালি দ্বারা সেই মহাত্ম্যের অভিনন্দন করিলেন । সকল  
ধর্ম প্রচারকের বক্তৃতা শেষ হইলে স্বামীজী উঠিলেন ।



সভা আরম্ভ হইল । জলদ গম্ভীর স্ববে স্বামীজী প্রথম বৈদিককালের কথা পাড়িলেন । শ্রোতাবা নূতন কথা শুনিল । শ্রোতৃবৃন্দে বক্তৃতা শুনিবার তীব্র আকুলতা দেখিয়া স্বামীজীব বক্তৃতাৰ সময় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন । স্বামীজী ওজস্বিনী ভাষায় জগৎকে অপূৰ্ণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন, জগৎ সমক্ষে হিন্দু জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া গেল । সভা তখন নিস্তব্ধ সমুদ্রের মত, শ্রোতৃগণের চিত্র পুত্তালকাবৎ । সেই সহস্র সহস্র শ্রোতৃগণের—জয়গানের যশোমালা স্বামীজীব মস্তকে কিবাটি হইল । তাঁহাব সমাদরের ইয়ত্তা বহিল না ।

( ৬ )

স্বামীজী আজীবন ব্রহ্মচাৰী । তাঁহাব মেঘধানবৎ গুণগম্ভীর স্বব, প্রোভভামস তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল, আকর্ষণ বিশ্রাস্ত নবনের উজ্জ্বল দৃষ্টি পলককেই মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল । পাশ্চাত্য দেশের কোন ধনবতী স্ত্রীবা যুবতী তাঁহাব গাণ পাখিনী হইয়া দাঁড়াইলেন । স্বামীজী আজীবন ব্রহ্মচাৰী—কামিনা কখন কাগী সন্ন্যাসী । তিনি “উত্ত জীবনে সংসাৰশ্রমী হইবেন না” তঁহা জানাইলেন । একটা অর্থশালিনী পাশ্চাত্য স্ত্রীবা—স্বামীজীব প্রেম লালসায়, নাবী জন সুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন—“যদি আপনি আজীবন কামায্য ত্রঃ গ্রহণ করিয়া থাকবেন, এককপ সঙ্কল্পট কাবয়া থাকেন তবে কেন পুনঃ পুনঃ আমার প্রতি চাহিয়াছিলেন ? আমি আমার প্রাণ পুষ্পাঞ্জলির মত আপনাব চরণে ঢালিয়া দিতেছি, আপনি কেন লইবেন না ?”

স্বামীজী হাসিতে হাসিতে উত্তর দেন—“আমি আনাব ভারতীয়া জননী ও ভাগনীগণকে দেখিয়াছি, আজ আনাব আমেরিকা বাসিনী জননী ও ভগিনীগণকে দেখিতে ছিলাম, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহারই স্মৃতিত্ব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম । আমি লালসায় দৃষ্টিতে আপনাব দিকে তাকাই নাই ”

স্বামীজী চিকাকো বন্ধুতা পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তথা  
হতাত এত্যাগত হইয়া তিনি ভারতের বহুস্থানে যে যে বন্ধুতা কবেন,  
তাহাও “ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থ” সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত  
তাঁহাব জ্ঞানযোগ পদ্ধতি কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ বাঙ্গালাব গোবদ পদ্ম  
পুস্তকান আছে। তাঁহাব সম্বন্ধে ও তাহা এই গ্রন্থ “উদ্বোধন” নাম  
পত্রিকায় ১৭শিখ হইতেছে

৭

স্বামীজী প্রতিমাপূজক—সাকার বাদী, বেশ ১২৩কব  
স স্বাবেব প্রবর্তিত। তিনি সমাজ সংস্কারক—সমাজ বিপ্লবকারী নহেন।  
তিনি ব্রাহ্মণে জাত্যভিমান ত্যাগ কারো যেমন ব্রাহ্মণ দ্বিতেন, শূদ্রকেও  
তদ্রূপ ব্রাহ্মণেব উপব ভক্তি কারিতে বলেন—ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ প্রচার কার  
তেন না। “ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। \* \* \* ব্রাহ্মণেতব জাতিব ব্রাহ্ম-  
ণেব উপব বড় বাগ \* \* \* স্থাবধা পাঠলেই ব্রাহ্মণ জাতিকে আক্রমণ  
কারিতে যাউও না।” \* পাশ্চাত্যেব কম্বজাধনেব সহ্য প্রাচ্যেব ধর্ম  
জীবনেব সমন্বয় কথাত তাঁহাব উদ্দেশ্য ছিল।” †

স্বামীজী বামকৃষ্ণদেবেব ভক্ত শিষ্য। গুরুদেবেব ফালা ভক্তি  
স্বামীজীতেও কিছু দেখিতে পাও যায়। একদিন তিনি প্রভু বামকৃষ্ণ  
দেবকে নিবেদন কবেন, “কয়দিন ত’ মায়ের নাম জপ কবিলাম কিন্তু দর্শন  
পাইলাম কই?” \* বামকৃষ্ণদেবেব তিবোধানেব উপবেও শিষ্যগণকে  
উপদেশ দিতে শুনিয়াছি যে “এই পালাই লীলাময় ব্রহ্ম।” বন্ধুতাত  
দেখিতে পাই—\* \* \* “অন্ত্র দেণেব মহা মহা শাক্ত ব্যক্তিগণও নাক  
সিঁটকাইয়া আমাদের ধর্মকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করেন।

+ (স্বামীজীর বক্তৃতা, ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থ)।

\* (বামকৃষ্ণ কথামৃত)।

আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা স্থির হইয়া এইটা ভাবেন না যে, তাঁহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোরতর কুসংস্কার বর্ত্তমান।”\*

স্বামীজী জাতিনির্ধিষ্টে জ্ঞান চর্চাব পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া জাতিভেদ ধ্বংসকারী ছিলেন না। বিগুদ্ধি বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার বাসনা ছিল। তবে জাতিভেদেব বর্ত্তমান আকার তাঁহার মনঃপূত ছিল না। জাতি জন্ম ও গুণমূলক—এত দুইটি দিকই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। নাস্তাবক আমাদের সংহিতা ও পুরাণে—“জাতি, জন্ম ও গুণমূলক” বাল্যার্ত্ত অভিহিত আছে, তবে জাত কর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়নাদি যাবতীয় সংস্কারই জন্ম মূলক জাতিবহ অপেক্ষা কবে, শিশুর পক্ষে জন্মমূলক জাতি ভিন্ন গুণমূলক জাতি নির্ণীত হইতে পারে না।

“চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা হবিভক্তি পরায়নঃ”

জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁহার মত—“আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে (ভারতবর্ষে) ইহার উদ্দেশ্য যেকোন মত, কোথাও প্রকৃপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতা নামন্ত আত্মত্যাগেব উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বহু ভাল বলিতে হইবে।”\*

বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিপ্রায়—“স্ব স্ব বর্ণকে নিম্ন করিয়া আচার বিধাবে যথেষ্টাচারিতা অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন-করিয়া জাতিভেদ সমস্যাব মীমাংসা হইবে না।†

\* ( ভারতে বিবেকানন্দ ) ।

\* ( ভারতে বিবেকানন্দ ) ।

† ( কুন্তকোন বক্তৃতা ) ।

তিনি আধুনিক উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধী ছিলেন। ধর্মের নামে যথেষ্টাচারিতার প্রশংসা দিতেন না, যথা—“সহরের সব লোক মিলে যেখানে যাক্কে ইচ্ছা বিবাহ করুক, আর দেশটাতে একটা পাগলা গাবদে পারিগত করুক।” \*

অজ্ঞান সংহতা ও স্মৃতিকারগণের উপর গায়ের ঝাল ঝালা কোন কোন সঙ্কার্ণ মনা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংক্রামক হওয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের উপর স্বামীজী একটি গভীর শ্রদ্ধা, ইহাদের মতের উপর কি গভীর বিশ্বাস ছিল তাও তিনি একস্থানে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন—“এক্ষণে আমাদের কাছে যা যা করতে হইবে, তাহার প্রত্যেকটা আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরা সহস্র বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন।”

বেদ সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা—পশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত বা তৎপদ-লেখী নব্য ইংরাজি শিক্ষিত বাবুদের মত ছিল না—“বেদ যখন লিখিত হয় নাই, বেদের উৎপত্তি নাই। বেদ অপৌরুষেয়। \* \* \* অনৈতি হাস্যকর তাই বেদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশংসা।”

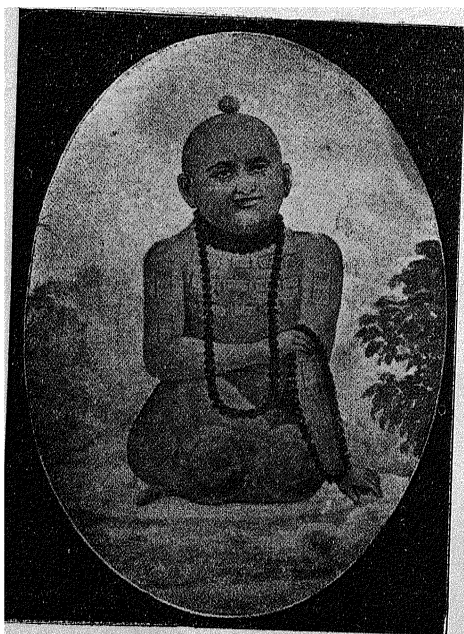
স্বামীজী স্থির জানিতেন যে, চিরোচিত সনাতন প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া, শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান সমূহের হাত কর্তব্যতা না মানিয়া, নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও স্থায়িত্বের আশা নাই। কালের কৃষ্টি পাথরে তাহার বেথা থাকবে না। অথবা শেষ একটা ক্ষুদ্র উপধর্ম প্রবণত হইবে। এই কারণে স্বামীজীর প্রাতিষ্ঠিত বা তাঁহার আদর্শে স্পষ্ট আশ্রম বা মঠগুলির মধ্যে হিন্দুর প্রবেশের পক্ষে কোন আপত্তি নাই। যাহারা প্রবেশ করিবেন তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম ত্যাগ কবিতা নূতন ধর্ম গ্রহণ করিতে হয় না, বা প্রচলিত আচার পদ্ধতিকে দূরে ফেলিয়া নূতন আচার গ্রহণ করিতে হয় না।

( ৮ )

কোন কোন বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতের সহিত হিন্দু সাধারণের  
অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইনি যে বর্ত্তমান শতাব্দীর একমাত্র ধর্ম্ম-  
প্রচারক, দেশের একমাত্র সংস্কারক—এ বিষয়ে হিন্দুর মতভেদ থাকিতে  
পারে না। অধুনাতন ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে ইনি সংসার ত্যাগী।  
সংসারে জ্ঞী পুত্রের মায়ায় আবদ্ধ থাকিয়া প্রকৃত লোক শিক্ষা দেওয়া চলে  
না। বুদ্ধ, যাক্ত, শঙ্কর, গৌরান্ধ সকলেই এই বিষয়ে প্রমাণ। ১৯১৩  
বঙ্গাব্দে ২০শে আষাঢ় ভাগরথী তাঁরে যে স্থানে এই মহাত্মার নশ্বর  
দেহত্যাগ ঘটে, সেই স্থানে প্রতিবৎসরেই মহা সমারোহে উৎসব হয়,  
স্থানটির নাম বেলুড় মঠ।

ধর্ম্ম প্রচারের জন্ত স্বামীজী—হৃদয়ে যে ভারতবর্ষের নাস্তোজ্জ্বল মহান্  
আদর্শ ধারণ করিয়া বারের মত কল্কব্য পথে চালিয়াছিলেন, সহস্র প্রতিবন্ধ-  
কতায় একদিনের জগৎ তাহা স্মান হইয়া পড়ে নাই। বিবেকানন্দ স্বামী  
দেশের মঙ্গলের জন্ত তাঁহার বিজ্ঞা, বুদ্ধি, দেহ, মন—সমস্তই নিবেদন  
করিয়াছিলেন। অতীতের অপূর্ব জ্ঞান মাহাত্ম্য—ভবিষ্যতের উদীয়মান  
গৌরব—আমাদের মত অবিস্থাসকে বুঝাইবার জন্ত, তিনি যে সরল নিষ্ঠা  
ও অক্লান্ত অধ্যবসার দেখাইয়া গিয়াছেন,—সেই আদর্শ একাগ্রতা আমা-  
দিগকে কল্কব্য কল্ম সাধনে দৃঢ়তর চালিত করুক। মঙ্গলের দৃষ্টান্ত কখনই  
ব্যর্থ হইবে না।





উদ্ধারণ দত্ত

## শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

১]

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ভাগে—সপ্তগ্রাম উন্নতিব উত্তম শৈল শিখরে উন্নীত। তখন সচ্ছ সলিলা সবস্বতাব তরঙ্গবাশি বিক্ষুব্ধ কবিতা পণ্য-সম্ভাবপূর্ণ পৰ্তুগীজ বাণিজ্যতবী সপ্তগ্রামেব বন্দরে উপস্থিত হইত। নগরেব সুরমা হস্ত্যমালা মাণময় মস্তক তুলিয়া কালসাক্ষা আকাশকে স্পর্শা দেখাইত। ধনীর বিলাসোদ্যানে পুষ্পময়ী বসন্তলক্ষ্মী ভ্রমরেব তিলকাজল পবিয়া অরুণ প্রবাণ-বাগে ওষ্ঠাধব রঞ্জিত করিতেন। প্রকৃতিব সহস্রে রচিত শ্রামায়মান ক্ষেত্রেব নবীন শম্পাস্কুর বালতপনের লোহিত কিবণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। বটছায়ায় বসিয়া দূরদেশগামী পাম্বকুল শীকর কণণহী শীতল সমীৰণ সেবন করিয়া অধ্বশ্রম নিবারণ কাবত। বমণীর হুপূর নিকনের সহিত সারসেব কলধ্বনি মাশয়া প্রাতঃ সন্ধ্যায় নদীতীর মধুরতব হইয়া উঠিত। মধ্যাহ্নের কনকবালুকায় ছুটাছুটি করিয়া পল্লী-বালকগণ কন্দুক ক্রীড়া কবিত। বহুবাদেশীর কল্যাণে—সোণার বাজালাব বিপুল ঐশ্বৰ্য্য-কাহিনী স্মৃদুচ যুবোপথগের বণিক কুলে প্রচারিত হইয়া পাড়িয়াছিল। তখন পৰ্তুগীজেরা আদর করিয়া সপ্তগ্রামের নাম রাখিয়াছিল—“পোটো পেকিনো”।

সেই সমুদ্রযাত্রাব ৭৫ নিদর্শনে ‘সুশোভিত, সহস্র সৌধমালায় গৌবাসস্থিত সপ্তগ্রাম এখন হুর্গম জঙ্গলে পবিপূর্ণ! তাহাব অতীত সমৃদ্ধি পৃথিবীর মাটিতে মুখ লুকাইয়াছে! গ্রামা শিশুব উৎফুল্ল আনন, কুল-নারীর হর্ষচঞ্চল নেত্র—গৃহস্থের প্রাক্ষণে আর প্রসন্ন পদ্যের মত বিকশিত হইয়া উঠে না! কলনাদিনী সরস্বতী বিচিত্র তরঙ্গ ভঞ্জে সপ্তগ্রামের



পাদমূল আর নিরন্তর অভিষেক্ত কবে না । নদী এখন শৈবালদলে সনাচ্ছন্ন, বাবকর-শুষ্ক ক্ষীণ পল্লে রিপণত হইয়াছে ! বাণিজ্য-জাহাজ আব বহু বিদেশেব রত্নভাণ্ডার সপ্তগ্রামে বহন করিয়া আনে না ! প্রশস্ত বাজপথ এখন ঘনবিশ্রান্ত কণ্টকাকর্ণ বেত্রবন—উদ্ধামুখী শিবির বিহার-ক্ষেত্র । সপ্তগ্রামের ভগ্নাবশেষ—এখন সুখসুপ্ত বিষধবেব নিষ্শাস্মি দীপত, ভীষণ বহুজন্তব নিভৃত নিবাস ! এখন সে ভগ্নাবশেষ দোঁথলে মনে হয়—যত্নপতেঃ কুগতা মথুবাপুবী ! সুরসরিৎ সরসতী—নিজে মজিয়া সপ্তগ্রামকেও মজাইয়াছে !

কথাকথং সচিস্কৃত্য অবলম্বন করিলে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে এখনও সপ্তগ্রামের গৌবের কিছু নিদর্শন দোঁথতে পাওয়া যায় । এই সপ্তগ্রামে একদিন হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া এক রাজনৈতিক মহাজ্যোতিতে পরিণত হইয়াছিল ।

সপ্তগ্রামের জঙ্গলের ভিতর আমরা কতকগুলি ভগ্নস্থপ এবং একটী বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ বিশাল শাল্মলী তরু দেখিয়াছি । বৃক্ষটী কণ্টকশূন্য—বোধ হয় যমরাজ্যব আদেশে তদীয় অন্তরবর্ণ—কত শত মণাপার গাত্র এই তরুতে ঘর্ষণ করিয়া দিয়াছে—তাঁহাতেই তরু কলেবর মসৃণ হইয়াছে । এই শাল্মলী তরুটী সপ্তগ্রামের উত্থান ও পতন দুই-ই দর্শন করিয়াছে । ইহার মূলদেশে হিন্দু মুসলমানের কত বিশ্বয় বিজড়িত বিলুপ্ত কাহিনী লুক্কায়িত রহিয়াছে !

সপ্তগ্রামের যখন সমৃদ্ধিশালী অবস্থা—তখন শ্রীকর দত্ত ব্যবসায় উপলক্ষে আসিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন । প্রতিবাসী মণ্ডলীর রোগে সুশ্রীষা, স্বাস্থ্যে সাস্ত্রনা, বিপদে প্রাণপাত করিয়া, শ্রীকর দত্ত সপ্তগ্রামে দেবতার মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বালয়া রাজ-সরকারেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল । পরোপকারী, সজ্জন, আশ্রিত প্রতিপালক, অনাথ-শরণ এবং ধান্নিক-চুড়ামণি বলিয়া

সকলেই তাঁহাকে ভক্তি কবিত। গৃহধর্ম্মে—তিনি মনোবৃত্তান্তসারিণী মনোরমা ভাষাভাষ কবিয়াছিলেন। দত্তবংশের সেই গৃহলক্ষ্মীর নাম—  
ভদ্রাবতী।

[ ২ ]

শ্রীকর দত্তের অর্থ ছিল, সুখ ছিল, যশঃ ছিল, সৌভাগ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজ প্রাসাদ তুল্য ভবন এক নিদারুণ শূন্যতা বক্ষে লইয়া দিবানিশি গাহাকার করত। বংশধরের অভাবে দত্তদম্পতী বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন। একজন সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই এক দেববালক শ্রীকর ও ভদ্রাবতীকে পিণ্ডলোপের আশঙ্কা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিচস্তার হস্ত হইতে উদ্ধার কাবলেন। অর্চরে স্বামী স্ত্রীর প্রেমসাধনার ফল ফলিল। ১৪০৩ শকে ভদ্রাবতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। শুভক্ষণে পিতামাতা শিশুর নাম রাখিলেন—“উদ্ধারণ।”

শ্রীকর দত্তের পরলোক প্রাপ্তির পর—উদ্ধারণ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। পিতৃমাতৃ স্বর্গের সমস্ত উৎকৃষ্ট উপাদান—উদ্ধারণের হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল। তিনি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। শত শত দীন দীনদরিদ্র তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইত।

তখন হুসেন সা বাঙ্গালার মসনদে উপাধি। নবাব সরকারে উদ্ধারণের যথেষ্ট প্রাপ্তি ছিল। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, তিনি এক বিশাল জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ জমিদারী অত্যাধি বিস্তৃত আছিল। উহা কাটোয়ার সন্নিকটে—“উদ্ধারণ পুর” নামে বিখ্যাত।

[ ৩ ]

প্রেমাবতার শ্রীগৌরানন্দ যখন শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—তখন শান্তিপুরের নিত্যানন্দ ঠাকুর তাঁহার উত্তরসাধক হইলেন—

ছিলেন। বাঙ্গালায় তখন প্রেমের বান ডাকিয়াছিল। পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু, উচ্চ-নীচ, ধনী-দীন, পাণ্ডিত্য-মূর্থ—স প্রেমের বজ্রায় সকলেই হাবুডুবু খাইয়াছিল।

সেই উদ্বেল প্রেমের বজ্র প্রবল উচ্ছ্বাসে তবঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া “নন্দে শান্তিপূর্ব” পবিত্রা বত কবয়া সপ্তগ্রামেও ছুটিয়া আসিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর সেই শুভ মুহূর্ত্তে প্রেমভক্তির সাকার মূর্ত্তি—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পদবেখার সংস্পর্শে দত্তবাটী পবিত্র হইয়াছিল।

উদ্ধারণ দত্ত পরম ভক্ত ছিলেন। এইজন্য নিত্যানন্দ তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। সপ্তগ্রামে আসিলে দত্তবাটীতেই তাঁহার বাসস্থান নিরূপিত হইত। নিত্যানন্দের কৃপায় উদ্ধারণ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুব শুভাগমন ঘটিলে দত্তগৃহে সমাবাহের সোমা থাকিত না। ভক্তগণ একত্র হইয়া সংকীৰ্ত্তন করিতেন। সে দিন সপ্তগ্রামে ভক্তিব শ্রোত বহিত, সমস্ত পল্লীতে এক বিরাট বিশাল আলোড়ন উপাস্ত হইত।

ক্রমে নিত্যানন্দের নিকট উদ্ধারণ দাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি শ্রীগোরাঙ্গের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। একনিষ্ঠতাব গুণে তাঁহার প্রাণ চৈতন্যচন্দ্রের গলুগ্রহ হইল। ভগবৎ-কৃপায় উদ্ধারণের পাবিত্র জীবনে অধ্যাত্ম ও পারমার্থিকতার প্রভাব দিন দিন প্রবল হইতে লাগল। মান, সম্ম, খ্যাতি, কাক্তি, ধনগৌরব পদগৌরব প্রভৃতি সৰ্ব্ব-বিধ সম্পদের দ্বার তাঁহার জন্ত উন্মুক্ত থাকিলেও, তিনি সে সকল দিকে দৃকপাতও করিতেন না। একমাত্র শ্রীমহাপ্রভুই মন্ত্যধামের পরম সম্পদ, ইহা ভাবিয়া উদ্ধারণ অত্র সম্পদকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে চাহিলেন। এই অনাসক্ত বিষয়ভোগী মহাপুরুষকে পাইয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

[ ৪ ]

শবতের পুণ্য আলোক দীপ্ত প্রভাতে একদা এক শঙ্খবাণক সপ্ত-  
গ্রামদ্বব বাজপথ দিয়া শঙ্খ বিক্রয় করিতে যাইতোছিল। এমন সময়  
সে স্থানতে পাইল—কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে! শাঁথারী পশ্চাৎ  
ফিরিয়া দেখিল—এক অপূর্ব বমণীমুষ্টি পথ আলো কাবয়া দণ্ডায়মান।  
ববিব কিরণ গাহাব মালিকা-পুষ্প তুলা গুণ বসনের উপব তবঙ্গায়িত  
হইতোছিল।

শাঁথারী মুগ্ধেব ত্রায় এষ্ট নারীমূর্ত্তির পানে নানমেবে চাহিয়া রহিল।  
তখন সেই চাকহাসনৌ সুন্দরী আপনাব মৃণাল কবছতী বাডাহয়া দিয়া  
বলিল—“বাছা! আমাকে এক জোড়া শাঁথা পরাইয়া দিবে কি?”  
শাঁথারী গাহাব মাথার বোঝা নামাইয়া বমণীকে বলিল—“কোন্ জোড়া  
তোমার পছন্দ বাছিয়া লও মা!”

মণী এক জোড়া শাঁথা দেখাইয়া দিলেন। শাঁথারী সেই শিবীষ  
কুসুম সুকুমার কব প্রকোষ্ঠে শাঁথা পরাইয়া দিল। তাবপব মূল্য  
চাহিল। বমণী বলিলেন—“আমাব কাছে মূল্য নাই। তুমি ঐ বাড়ী  
যাও—বক্তাকে গিয়া বল—আপনাব কত্তা শাঁথা পবিয়া ছ—তাহাব  
মূল্য দিন। যাদাতান তোমাব কথায় বিশ্বাস কবিয়া টাকা না দেন,  
তাহা হুইলে তাঁগকে বলও মাঝেব ঘরেব কুলুঙ্গাতে যে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা  
আছে—আপনাব কত্তা তাহাহ আমাকে দিতে বলিয়াছে। তবুও যাদ  
তান মূল্য না দেন,—তুমি ফারিয়া আসিয়া এহ স্থানে আমার নকট  
মূল্য লহও। আম এখন স্নান কাবতে যাইতোছ।” বমণী চলিয়া  
গেল। সেই রাজহংসীব ত্রায় গীলাক্ষিত পাদক্ষেপ দোথতে দোথতে  
শাঁথাবাও দত্তগৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

[ ৫ ]

বাটীর দ্বারদেশে—স্নাতাঙ্গুলিপ্ত তম্ব উদ্ধারণ দাঁড়াইয়াছিলেন।

শাঁথাবী তাঁহার সম্মুখে গিয়া সম্মুখে মন্তক নত করিল ; তাবপব বলিল—  
 “দত্ত মহাশয় ! আপনাব কত্না পথের মাঝে একজোড়া শাঁথা বিনিয়া-  
 ছেন, এবং আপনাকে তাহার মূল্য দিতে বলিয়াছেন। সেই জন্তই  
 আমি আসিয়াছি।” দত্ত মহাশয় শঙ্কবণিকের কথায় অতিশয় বিস্মিত  
 হইলেন। কেননা তাঁহার পুত্রকত্না কিছুই ছিল না। তবে কে তাঁহার  
 কত্না পাবচেষ্টা শঙ্কবণিককে প্রত্যাশা করিল ? তিনি শাঁথাবীকে  
 বাবস্বাব প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শাঁথাবীও সমস্ত ঘটনা আমূল নিবেদন  
 করিল। শেষে দত্ত মহাশয় বলিলেন—“যে মেয়েটী শাঁথা পবিয়াছে—  
 তাকে দেখাইতে পাব ?” শাঁথাবী স্বীকৃত হইল। শাঁথাবীর কথার  
 সত্যতা পবীক্ষাব জন্ত উদ্ধাবণ মাঝে মাঝে কুলুঙ্গী অনুসন্ধান করিলেন,  
 দেখিলেন—সত্যসত্যই সেখানে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা বহিয়াছে। সেই পঞ্চমুদ্রা  
 লইয়া উদ্ধাবণ শাঁথাবীও পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

অনন্তর উভয়ে—নবস্বতীব শীবে উপস্থিত হইলেন। শাঁথাবী লজ্জায়  
 পাঁড়ল—পূর্বদৃষ্টা নাবী কোথায় গন্তব্য হইয়াছে। সে সকলকেই  
 জিজ্ঞাসা করিল—কেহই বস্তুব সন্ধান দিতে পারিল না। ভদ্রলোকের  
 সম্মুখে মিথ্যাবাদী হইতে হইল ভাবনা শাঁথাবী কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন সেই—নীল সলিল বাণ আলোড়ন করিয়া নদীগর্ভ হইতে  
 দুইখানি স্তম্ভ উত্থিত হইল। উদ্ধারণ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন—সেই  
 হাত দু’খানিতে শাঁথা পবান’ বহিয়াছে। শাঁথাবাব মুখে হর্ষের দীপ্তি  
 ফুটিয়া উঠিল। দত্তমহাশয় তাকে সেই পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলেন  
 —“শঙ্ক বণিক ! তুমি বড়ই ভাগ্যান্বিত, স্বয়ং জগজ্জননী আজ তোমাব  
 কাছে শাঁথা চাহিয়া পবিয়াছেন ”

[ ৫ ]

উদ্ধারণদত্ত সঙ্ক্ষে অনেক অলৌকিক কাহিনী লোকমুখে শুনিতে

পাওয়া যায় । তাঁহার “সংক্ষিপ্ত জীবনীতে” সে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব ।

দত্তমহাশয় সুবর্ণ বর্ণিক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রেমের ঠাকুর নিত্যানন্দ উদ্ধারণ স্পৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন পবিত্র জ্ঞানে ভোজন করিতেন । একদা নিত্যানন্দের সঙ্গে এক আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ উদ্ধারণের গৃহে অতিথি হ’ন । উদ্ধারণ নিত্যানন্দকে—ব্রাহ্মণের আহ্বারের কি হইবে জিজ্ঞাসা করলে, নিত্যানন্দ দত্তমহাশয়কে খিচুড়ী পাক করিতে বলেন ।

ব্রাহ্মণ সরস্বতীতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—চুল্লীর উপর খেচরান ফুটিতেছে, উদ্ধারণ—মাঝে মাঝে—কাটা দিয়া তাহা নাড়িতেছেন । বৈষ্ণৱ কুমাণের স্পর্ধা দোষিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে ঝুট হইলেন—অন্তর্যামা নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণের মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—“কহে দত্ত ! যে হাঁড়ীর অন্ন ব্রাহ্মণে খাইবে, তুমি তাহা ছুঁইয়া ফেলিলে ?” নিত্যানন্দের হাঁসিত বুঝিয়া উদ্ধারণ—সেই ভাতের কাঠি মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন । কাটা যে স্থানে পতিত হইল, সেই স্থানে সহসা একটী মাধবীলতার গাছে উৎপন্ন হইল । তখন, সেই ব্রাহ্মণ—উদ্ধারণের মতিমা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সকল গর্ব খর্ব হইল । “উদ্ধারণের স্পৃষ্ট অন্ন—স্বর্গের অমৃত জ্ঞানে ব্রাহ্মণ মাথায় পাতিয়া লইলেন । ব্রাহ্মণের ভাবান্তর দেখিয়া পারিপার্শ্বিক বৈষ্ণবগণ গাহিয়া উঠিলেন—

“গৌর প্রেমে জেতের বিচার নাই ।

ডাক্ছে গোরা,

আয়না তোরা—

সমাজ ছেড়ে, ভাই !

চণ্ডালকে করেন কো’লে আমাদের নিতাই !”

এই “মাধবী গতা”র বৃক্ষ, এখনো সপ্তগ্রামে দখিতে পাওয়া যায়।  
ভক্তগণ হাহাব মূলদেশ বেদীর মত করিয়া বাধাটয়া দিয়াছেন।

[ ৬ ]

একপে উদ্ধাবণের ম'মা সমগ্র সঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। উদ্ধা-  
রণকে দেখিবাব জন্ত দেশ দেশান্তর হইতে লোকে সপ্তগ্রামে ছুটিয়া  
আসিতে লাগিল তাঁহাব কাব্য দাঁখবা অনেকের বিশ্বাস হইল -  
উদ্ধারণ মাল্লব নহেন। ইনি বৃন্দাবনে—শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ সপাব মধ্যে এক  
সখা ছিলেন।”

উদ্ধারণ নিত্যানন্দর সঙ্গে বহুদেয়ে গমন করিয়া—শান্তমথ বৈষ্ণব  
ধর্ম প্রচাব করিয়াছিলেন। তিনি এ তিমে বৈষ্ণু ছিলেন, তাই প্রেমের  
বাপাবী সাজিয়া প্রেমের হাতে অনেক “এচা কেনা” কাবয়া গরাছেন।  
বঙ্গদেশের অনেক ঘাটেই তাঁহার নামের ম'বী ভাড়িয়াছিল।

নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য বৈষ্ণব সেবায় অর্পণ কাবয়া উদ্ধারণ পবম ধন  
দানের জন্ত—লীলাচরে গমন করেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া শ্রীধাম  
বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। ১৪৬০ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী  
তিথিতে ৫৭ বৎসর বয়সে—বৃন্দাবনে ধামে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের  
তিবোভাব ঘটিয়াছিল। এখনো বংশীবটের কাছে—ইহার সমাধি মন্দির  
বর্তমান আছে। ভাবতেব কোটি কোটি নর নারী এ সমাধির পূজা  
করিয়া থাকে।

উদ্ধারণ চৈতন্য দেবের প্রকৃত সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাব জীবনো  
সম্বন্ধে আব বেশী কিছু জানতে পারা যায় না। ইনি অনেক বৈষ্ণব  
শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, শাস্ত্র অধ্যয়নে ইহার যথেষ্ট অনুবাগ ছিল।  
কিন্তু ইহাব স্বরচিত কোন পদাবলা এ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই।

হুগলা খুঁটিয়া বাজার নিবাসী বলরাম মল্লিক মহাশয়—শ্রীমহাক্ষর  
দত্ত ঠাকুরের স্থিতি সংরক্ষণের জন্ত, বঙ্গের অতীত গৌরবের কেন্দ্র সপ্ত

গ্রাম একটা মেলাব প্রতিষ্ঠা করেন । পতি বৎসর পোষ মাসে—উক্ত মেলা অন্তর্গত হয় । উদ্ধাবণের “মহোৎসব” মহা সমারোহেব সহিত সম্পন্ন হইত, নানা দিগ্দেশেব ভক্তগণ আসিয়া উদ্ধারণ মন্দিরে সমবেত হইতেন । তখন মহা সঙ্কীৰ্ত্তনেব “ধূলাটেব” ধূলিগটল গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিত । ঐহুত দুঃখেব বিষয় বলবাম পাবু অকাল মৃত্যুতে উৎসবেব অনেন্দ্রশ্রোতে যেন ভাঁটা পাউয়াছে । এ বিষয়ে আমবা সুবর্ণ বর্ণকগণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতোছি উদ্ধাবণ সুবর্ণবর্ণিক কুলোজ্জলকারী মহাপুরুষ,—এই মহাপুরুষেব পবিত্র স্মৃতি বক্ষাব ভাব—সুবর্ণবর্ণিকদেব । এ কথা যেন তাঁহাবা ভুলিয়া না যান । দেবতা পতিষ্ঠাব অক্ষয় পুণ্য লাভেব জন্য সকলেবই বদ্ধপবিকব হওয়া উচিত ।

ইষ্ট উত্তিয়া বেলেব ত্রিশ বিঘা ছেশনেব অনতি দূৰে—পুণ্যধাম সপ্তগ্রাম অপরিস্ফুট । সপ্তগ্রামে দত্তঠাকুরেব পবিত্র মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে । মন্দিরেব সন্নিহিত “মধবী মণ্ডপ” প্রত্যেক ভক্তেবই দর্শন যোগ্য ।

উদ্ধাবণেব স্মৃতি সংবক্ষণেব যান প্রধান উজোগী--সেই স্বর্গীয় মহাত্মা বলধাম মল্লিকেব বংশধরগণ । তৃকীৰ্ত্তি বজায় রাখিবার চেষ্টা করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা ।

সম্পূর্ণ





বাহির হইবে

জীবন-চিত্র সম্পাদকের বিরচিত

ক'নে-মা

সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস

যে সৎ-মা'র নাম গুনিলে বাঙ্গালীমাত্রেই  
শিহরিয়া উঠেন, বাঁহাদিগের রীতি নীতি,  
আচার ব্যবহারের দোষগুণে, বঙ্গীয় সংসার  
স্বর্গের নন্দন কানন বা মর্ত্যের বিভীষণ  
আশ্রানে পরিণত হয়, সেই সৎ-মা'র চিত্র  
ও চরিত্র লইয়া, বঙ্কু বাবু আপন অভিস্কৃত  
হৃদয়েব শোণিতধারা ঢালিয়া, “ক'নে মা”  
লিখিতেছেন। গ্রন্থকারের রচনা সৰ্ব্বত্র  
পাঠক সমীপে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

“জীবন-চিত্র” সম্পাদক প্রতিভাবান্‌ জুলেখক .

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিলারী ধর প্রণীত

## সচিত্র উপন্যাসাবলী

বঙ্গ সাহিত্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ও হিন্দী ভাষার অনুবাদিত হইয়াছে। গার্হস্থ্য ও সমাজ-চিত্র অঙ্কনে গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত, এ কথা আমরাদিগেব নিঃসংশয় নহে, দেশেব গণ্যমান্য শিক্ষিত সমাজ, হাকিম, মোক্তাব, “বেঙ্গলী”, “অমৃতবাজার”, “হিন্দু পেট্রিয়ট”, “চৈতন্যবাহিনী”, “বঙ্গমতী”, “সময়” প্রভৃতি বিস্তার সংবাদপত্র সম্পাদকগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কি রচনা-নৈপুণ্য, কি চরিত্র চিত্রে, কি ভাব-মাধুর্য্যে, কি ভাষার লালিত্যে বঙ্কুবাবুর উপন্যাস সর্বতোভাবে নূতন ও চিত্তাকর্ষক। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকে সুন্দর সুন্দর হারফটোন ছবি আছে।

কি কি পুস্তক বাহির হইয়াছে দেখুন !

## কাকী-মা।

সচিত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস

( ৩য় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত । )

এমন শিক্ষা দীক্ষাপূর্ণ ভ্রাতৃপ্রেমানুবাগোদীপক উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে আব নাই। স্বামী জীকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে, পিতা কন্ডাকে পড়িতে দিন, সংসাব সোণাব হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক পাঠিকায হৃদয়ও উন্নত হইবে। মাবে সাহেব, মিঃ টমসন্, বড় ভাই গোপাল, ছোট গোবিন্দ, বড়বোঁ মোহিনী, ছোট বোঁ কমলা ( কাকী-মা ) ও পুলিশ ইন্স্পেক্টর শবচ্চন্দ্রেব চরিত্রসৃষ্টি অতি অপূর্ব। ইহাতে ৫ খানি হারফটোন ছবি আছে। মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, সোণার জলে নাম লেখা ১২ মাত্র, বোর্ডে বাঁধা ৫০ আনা।

প্ৰতিভাবান্ শ্ৰীযুক্ত বঙ্কুবিহাৰী ধৰ প্ৰণীত

## গৌৰী-দান।

সচিত্ৰ সামাজিক উপন্যাস

বাঙ্গালীৰ কল্পাদায়েৰ উজ্জল চিত্ৰ। মা লক্ষ্মীগণেৰ ও গৃহস্থমাত্ৰেবই পাঠোপযোগী, ভাষা ভাব সুদৃষ্ণগ্ৰাহী। ঘটনাবলী চিত্ৰোদ্ভাসকাৰী।

মিঃ ইলিষট, কস, হাৰিণ্টন পভতি ইংৰাজ বণিক, মাতৃভক্তনীৰ হৰবল্লভ, সমাজদোষী কালীনাথ, স্বাধীনচেতা চলধৰ, মুসলমান সৰ্দ ব বেজা খাঁ, সন্দাৰ পত্নী জোবেদা, ধৰ্মপৰায়ণা মানদাসুন্দৰী, পাতগতপ্ৰাণা লক্ষ্মীমণি, ষড়ৈশ্বৰ্য্যমণী হিন্দুৰ বিনবা স্ত্ৰী সনৌ পত্নীৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টি অপূৰ্ণ।

৫ খানি ছবি, ছাপা, কাগজ, মুদ্ৰাঙ্কনাদি অত্যুৎকৃষ্ট।

মূল্য বোৰ্ডে বাধা ১৮ কাপড়ে বাধান ১০ মাত্ৰ।

বিঃ-লিঃ

২য় সংস্কৰণ

সচিত্ৰ সামাজিক উপন্যাস

“কাম, ক্ৰোধ, মোহ, মদ ও মাৎসৰ্য্য” এই ছয় বিপু অবস্থানে সুন্দৰ ভাবে লিখিত, বুদ্ধিকালে পাণি গ্ৰহণ কৰিলে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা ইহাতে স্পষ্টই প্ৰতীয়মান কৰা হইয়াছে। কালীশচন্দ্ৰ, শিবে ডাকাত, বালবিধৱা সবস্বতীৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টি অপূৰ্ণ, ছুইখানি হাফটোন ছবি আছে, বিবিধ বৰ্ণে বৰ্জিত সচিত্ৰ কভাৰ, বোৰ্ডে বাঁধাই মূল্য ১/০ আনা।

সতীৰ কলঙ্কিনী

২য় সংস্কৰণ

অপৰূপ সচিত্ৰ প্ৰণয়-কাহিনী

সুন্দৰ সুন্দৰ হাফটোন ছবি আছে, গল্পাংশ মধুৰ—বড় মধুৰ—বিধূৰ জ্যাংলাপ্লাবিত যামিনীৰ জায় প্ৰাণোদ্ভাসকাৰী, পোত্যেক বনৰীৰ পাঠা। পবনাবীৰুপমোহে মুগ্ধ বামধন, কপগৰ্বে গৰবিনী মেমাজিনীৰ ভাব পৰিবৰ্ত্তন, আৰ সতীৰ আদৰ্শ চঞ্চলাৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টি অপূৰ্ণ। বোৰ্ডে বাঁধাই, তিন বৰ্ণে বৰ্জিত হাফটোন ছবি আছে, নানাৰ্ণে বৰ্জিত ক ভাষা—মূল্য ১/০ আনা।

ବାଣୀର ଏକନିষ্ঠ ସାଧକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ, ବନ୍ଧୁବିହାରୀ ସବ ପ୍ରଣୀତ

# ପିସୀ-ଆ

ସଚିତ୍ର ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ

ସାହାର ବଚିତ “କାକୀ-ଆ,” “ଗୋବୀ-ଦାନ” ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ ଆଜି ବହୁ ସ୍ଥଳେ ସବେ ସବେ ପଢ଼ିତ ଓ ଉଚ୍ଚତାରେ ଆଦୃତ, ସେହି ବନ୍ଧୁବାବୁର ମେଧାବୀ ନିଃସନ୍ଦେହ ଆବ ଏକଥାକୁ ନୂତନ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ । ବିଷୟା ବିଶାଳ ଚିତ୍ର ଓ ଚିତ୍ରଣ ଶୈଳୀ ଉପାସିତ, ଘଟଣାବଳୀ ବଡ଼ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଭାବେବ ପର ଭାବ ଆତ୍ମାରେ, ଏକଟିର ପର ଆଉ ଏକଟି ଘଟଣାତରଙ୍ଗେ ଏ ଉପନ୍ୟାସେବ ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରରେ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ମା-ଶାସ୍ତ୍ରାଗଣେର ପାଠାପସୋଗୀ ଏକପ ଉପନ୍ୟାସ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ଅତୀତ ବିବଳ । ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ପିସୀ ମା (ମହାମାୟାର) ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଅପୂର୍ବ, ସଂଶାସ୍ତ୍ରବାଦ ହସ୍ତେ ଫୁଲକୁସୁମାର ନିର୍ଦ୍ଦାୟନ, ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ପତିତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଗସାଧାର ଆତ୍ମା-ସ୍ଥାପନ, ବହୁକାଳୀର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣକାର ଏକ ଅଭିନବ ବହୁତା ସୃଷ୍ଟି । ସବ ସୁନ୍ଦର—ସବ ମନୋହର, ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ଅନେକ ହାଫ୍‌ଟୋନ ଛବି ଆଛି,—କାପଡ଼େ ବାଧା—୧୦ ସିକା—ବୋର୍ଡ଼େ ୧୦ ମାତ୍ର ।

## ଅଞ୍ଜଳି

ସଚିତ୍ର ଅଭିନବ ଗମ୍ପା ପୁସ୍ତକ

ଈହାତେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ଅପବିତ୍ର ୧୦ ଜନ ସୁଲେଖକଙ୍କର ୧୫ଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗମ୍ପା ଏକତ୍ର ସମାବେଶ କରା ହେଉଛି, ଆଲୋଚନାସକ, ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରାଣ-କାଳିନୀ ସକଳ ବିଷୟରେ ଆଛି, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାଫ୍‌ଟୋନ ଛବି ଆଛି ।

ବନ୍ଧୁ ବାବୁ “ଦିଦିମିନି” ଓ ବ୍ରଜବଲ୍ଲଭ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଶାବଦେବ “ମାଳତୀ” ଗମ୍ପା ଅତି ଅପୂର୍ବ ।

ବୋର୍ଡ଼େ ବାଧା, ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଚିତ୍ର କଥାର, ମୂଲ୍ୟ ୥୦ ଆନା ।

শ্রীযুক্ত বকুবাহারী ধর-সম্পাদিত

## আর্য্য-কাহিনী (সচিত্র)

রাণী দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাই, কন্দোদেবী, হামিব, পৃথিবাজ প্রভৃতিব চিত্র ও চরিত্র লইয়া “আর্য্য-কাহিনী” লিখিত। ইহাতে লক্ষ্মীবাই, শিবাজী, রাণাপ্রতাপ, রণজিৎ ও মানসিংহের হাক্টোন ছবি আছে। স্ববন্দ্য বোর্ডে বাঁধাই ১০/০ আনা, কাগজেব কভাব ১০/০ আনা।

শ্রীযুক্ত বকুবাহারী বাবুর সচিত্র নাটকাবলী

## মৈথিলী (রাবণ-কাত্য-সীতা)

২য় সংস্করণ

(পৌরাণিক সচিত্র দৃশ্যকাব্য)

বেদবতীর উপাখ্যান, রাবণেব দিগ্বিজয়, মন্দোবীর গর্ভে সীতাৰ জন্ম কৃষিক্ষেত্রে জনক রাজার সীতা প্রাপ্তি প্রভৃতি আছে। ইহাখানি ছবি আছে। মূল্য ১০/০ আনা।

## উর্ধ্বশী-উদ্ভাস

২য় সংস্করণ

(পৌরাণিক ধর্ম্মমূলক সচিত্র নাটক)

দণ্ডীপর্ষাবলম্বনে লিখিত, পাঠে হৃদয়ে প্রীতি অনুভব করিবেন। সূতদ্বার নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মপালন, ভীমের প্রতিজ্ঞা বক্ষা বড়ই মর্শ্বস্পর্শীয়। ইহাখানি হাক্টোন ছবি আছে। স্বন্দর বোর্ডে বাঁধা, মূল্য ১০/০ আনা।

## বক্রবাহন (পার্থ-পরাজয়)

সচিত্র পৌরাণিক নাটক

পিতাপুত্রে যুদ্ধ, যুদ্ধে অর্জুনের মৃত্যু—যুদ্ধের স্বন্দর চিত্র অ চিত্রাঙ্গদা বিলাপ, উলুপীর উত্তেজনা অপূর্ব। মূল্য ১০/০ আনা।

গ্রন্থকার—২২.ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর লেন,

অথবা

আমার নিকটে পাওয়া যায়

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১. কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা।

# সমালোচনা

( সাবসংগ্রহ )

( স্থানান্তরিতঃ সকল অন্তিমতঃ দেওয়া হইল না )

দেশপুঙ্খ্য সুরেন্দ্রনাথের “বেঙ্গলা” পত্র বলেন :—

“Kaki-ma”...is a story of one aspect of Bengali domestic life told with a good deal of ingenuity delineating the triumph of virtue over vice. Babu Banku Behary Dhur, the young author knows the art of telling stories with grace and has acquitted himself well in the task. ❀ ❀ ❀

The Bengalee, 22nd September, 1907.

স্বনামখ্যাত শিশিরকুমার ঘোষের “অমৃতলাভ পত্রিকা” বলেন :—

“Kaki-ma” A domestic novel by Babu Banku Behary Dhur, a young author of promise and reputation. The story is a powerful one depicting virtue and vice in true colours. ‘Kaki-ma’ is a novel which ought to find favour in the eyes of lovers of fiction.

The Anurita Bazar Patrika, 8th October 1907.

সুবিখ্যাত “হিন্দুপেট্রিয়ার্ট সম্পাদক বলেন :—

“Kaki-ma”...Written by Babu Banku Behary Dhur, \* has been effectively told in a happy and charming style which does credit to the author. The language is chaste and easy the plan natural and the characters have been very well drawn up and developed. ❀ ❀ ❀

The Hindu Patriot 4th October 1907.

শিরালদহ কোর্টের প্রতিভাশালী পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট

বলেন :—

One of the most unvarnished pictures of Hindu domestic life is presented in “Kaki-ma” ❀ ❀ ❀

The characters of “Gobinda,” “Kamala,” “Saratchandra” are ideal and deserve special mention. Other characters also are drawn from life and do great credit to the descriptive power of the author who evidently has the special gift of holding the mirror up to our domestic life. ❀ ❀ ❀

Sd Chandu Das Ghose, M A , B L

## সুবিখ্যাত “ইণ্ডিয়ান মিরর” সম্পাদক বলেন :—

“Kakirna”...is a domestic story written somewhat after “Swarnalata,” It covers however a wider ground “Swarnalata” is a painful suffering which a young man underwent with his wife and child in co sequence of being made to live apart from his hen-pecked elder brother, “Kakirna” shows not only the evils of fraternal friction but also the advantages of the joint family system. The author has successfully shown that the moral law governs the world which it would be dangerous for one to disregard. ✖ ✖ ✖  
Indian Mirror, Saturday 28th June, 1912

## “বঙ্গভূমি” সম্পাদক বলেন :—

✖ ✖ ✖ “কাকী মা” ঐশ্বর্য, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা বন্ধুত্ব, সন্তান ও মনুষ্যত্বের নিখুঁত দর্পণ, ✖ ✖ পাড়তে পড়িতে শিখায় শিখায় রক্ত ছুটিবে তাবাব হৃদয়ের পবতে পবতে আনন্দশ্রোত প্রবাহিত হইবে।

বঙ্গভূমি ১৪ই জুলাই ১৩১৪।

## “সন্ময়” সম্পাদক বলেন :—

সমালোচ্য “কাকী মা” গ্রন্থ একখানি সামাজিক চিত্র। এই চিত্রটি সমস্রের চক্ষে ধরিলে উপকারিত হইবে। ✖ ✖ সমাজে “ভাই ভাই ঠাঁট ঠাঁট” এই ঘৃণিত নীতির কি দোষ তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ✖ ✖ ✖ একপ গ্রন্থ সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করে।

সন্ময় ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

## “বসুমতী” সম্পাদক বলেন :—

“কাকী-মা”—✖ ✖ ✖ স্বর্ণশতা শ্রেণীর উপন্যাস—বঙ্গসাহিত্যে যত অধিক প্রচারিত হয়, সমাজের ততই মঙ্গল। আমরা এ পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকাবের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

বসুমতী, ১২শে পৌষ, ১৩১৪।

## “হিতবাদী” সম্পাদক বলেন :—

✖ ✖ “কাকী মা”—গল্পটি ভাল, ✖ ✖ ছাপা ও কাগজ ভাল।

হিতবাদী, ২৪শে মাঘ, ১৩১৪।

## “আশা” সম্পাদক বলেন :—

“কাকী-মা”—তারকনাথের স্বর্ণলতার পর এরূপ গার্হস্থ্য জীবনের উপদেশ পূর্ণ পুস্তক এ দেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। ✖ ✖ ইহা পাঠে মহিলাগণের বিশেষ উপকার হইবে।

আশা, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র, সংখ্যা, ১৩১৪।

## হাওড়া জেলার মুখ পত্র “হাওড়া-হিতৈষী” বলেন :—

সমাজের বর্তমান বিশৃঙ্খল সময়ে “কাকী-মা” অনেক উপকার সাধিবে। আমবা শুনিযাছি, একটি ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারে গ্রন্থবর্ণিত কপ ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে এই পুস্তকখানি পড়িয়া ভাইয়েদের চক্ষু ফুটে, তাহারা বিরোধ মিটাইয়া দেন এবং পবম্পর পৃথক হইবার বাসনা ত্যাগ করেন। এই ঘটনাই “কাকী-ম” প্রণেতার শক্তি ও যোগ্যতা এবং তাহার গ্রন্থের সার্বভৌমতা প্রমাণ করিতে ছ।

হাওড়া হিতৈষী, ৪ঠা মাঘ, ১৩১৫।

## ডিটেক্টিভ ও পুস্তকালয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে বলেন :—

“এই গ্রন্থখানি সর্বত্র অদ্বৈতীয় আসন পাইবাব যোগ্য। এখানি হিন্দুগণেরই সুপাঠ্য। উৎসাহিত হইয়া, বাস্তবতঃ হিন্দু সংসারে শুদ্ধান্তঃপূর্ববাসিনী ‘মা লক্ষ্মী’-দিশেব হাতে যে এই বখানি অতঃপাশে ও সুন্দর হইবে, তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। বর্ণনা কৌশলে গ্রন্থকাবের সমাজপ্রীতি ও আন্তরিকতাও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বয়ংসংসারেব পুস্তক চিত্র প্রকটনে লেখকের বেশ হাত আছে।

সুবর্ণ-বর্ণিক সমাজের একমাত্র মুখপত্র “সুবর্ণ-বর্ণিক”

সম্পাদক বলেন :—

“গৌরী দান” ✽ ✽ ✽ জীযুক্ত বঙ্কুবাহারী ধব প্রণীত। গ্রন্থকার সামাজিক চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। ✽ ✽ ✽ আমবা দৃঢ়তার সহিত বলিতে প্রস্তুত যে, তাহাব প্রকাশ ও উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়, হিন্দু পরিবারের আদর্শ, হিন্দুর বর্তব্য, হিন্দু মুসলমানের পবম্পর প্রীতিবর্দ্ধন প্রভৃতি বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছবি ছবি গ্রন্থকাবের ভাবুকতা ও সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমবা পবম প্রীতি হইয়াছি। ✽ ✽ ✽

সুবর্ণ বর্ণিক—৬ই ফাল্গুন, ১৩১৭।

## চুঁচুড়াব মুখপত্র “মহামায়া” সম্পাদক বলেন :—

“গৌরী দান” ✽ ✽ ✽ জীযুক্ত বঙ্কুবাহারী ধব প্রণীত—দেশের ও দেশের প্রকৃত অবস্থার একখানি সুন্দর আলোচনা, পবিস্বর্গমাণ সংসারচক্রের স্বাভাবিক সজীব প্রতিমূর্ত্তি, ইদানীন্তন হিন্দু সমাজেব নিখুঁত ফটো। ✽ ✽ ✽ নিভা দৃষ্ট সহজ পরিচিত ক্ষুদ্র সংসাবেব ঘটনার মধ্যে গ্রন্থকার পাঠকের জন্য এক পুরাতন অতীতের মধুর স্বপ্ন-জালে জড়িত সাধেব নিকুঞ্জ প্রেমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ✽ ✽ ✽ গৌরী-দানে নারীব নারীত্ব, বধূত্ব মাতৃত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রের একত্র সমাবেশে ✽ ✽ ✽ লেখক তাহার সুন্দর দৃষ্টি ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন।” ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

মহামায়া—২২শে চৈত্র, ১৩১৭।



ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক বলেন :

"PISHIMA" is a domestic novel from the pen of Babu Banku Behary Dhur, who has already achieved some distinction in the story telling line. As usual with the author, he has dealt with some social problems in the course of the story. One of these is the rather ticklish question of widow marriage. \* \* \*

"Pishima" after whom the novel is named is presented as an admirable exemplar of the Hindu widow, whose selflessness and benevolent spirit endear her to all with whom she comes in contact. Nani Gopal is a splendid specimen of the educated youth of Bengal and Satrie *alias* Kirtibash is philanthropy personified. The Court scene is exceedingly touching, \* \* \*. What strikes the reader most in perusing the book is the dramatic quickness with which the scenes of action change.

The chapters \* \* are so skilfully arranged as to keep the reader always on the alert. The style is simple and pleasant and calculated to keep up the interest of the reader from beginning to end.

Indian Mirror—8th Jan'y. 1913

সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু

মহাশয় বলেন :—

I have gone through \* \* "Pishima" with very great interest. It is a literary Bioscope through which one may look at a panorama of domestic life in present day Bengal. The films are large in number and varied in character and connected intimately as they are with one another. \* \* \*.

The production is well suited for exhibition on the public stage.

Sd. Baikuntha Nath Bose.

সুবর্ণবর্ণিক সম্পাদক বলেন :—

\* \* আজকাল উপত্যাসের ছড়াছড়ি হইলেও খাঁটি জীপাঠা উপত্যাস নাই বলিলেও হয়। বঙ্গুবাসু উপত্যাসগুলি অসঙ্খ্যে মাতুলশিশু গুললক্ষী দিগের করকমলে অর্পণ করা যাইতে পারে। "পিশীমা"র আদর বহু বহু গৃহে হওয়া উচিত।

সুবর্ণবর্ণিক, ২৩শে চৈত্র ১৩১২ সাল।









